মেঘ-মেদুর

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

জ্যোতিপ্রকাশালয়

২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রকাশ করেছেন ঃ
শ্রীশেফালিকা ঘোষ
ভারত বুক এজেন্সী
২০৬ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

মহালয়া—১৩৫৮

মূল্য তিন টাকা আট আনা

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
শ্রীপ্রভাত কর্ম্মকার
প্রচ্ছদপট মুদ্রণকারী
মোহন প্রেস
আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট কলিকাতা
মুদ্রণ করেছেন
শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

শ্রীমতী তৃপ্তি দেবী

স্নেহাস্পদাসু—

বর্ত্তমান বাংলার সমাজ-জীবনের বিশেষ একটি স্তর অবলম্বনে এই কাহিনী রচনা করেছেন দরদী কথা-যাদুকর ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়। মানুষের অন্তর্গূঢ় বেদনার বাষ্পাকুল শ্বাস তাঁর ভাষায় কী অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করেছে—পাঠক-সাধারণ পড়লেই বুঝবেন।

দুঃখের বিষয়, এই বইখানি ছাপাবার সময় অনিবার্য্য কারণে লেখক কয়েকদিন অনুপস্থিত ছিলেন, প্রেসের তাগিদে সেই অবসরে এর ৭ম এবং ৮ম ফর্ম্মা ছাপা হয়ে যায়; ঐ কয়েকটি পাতায় এমন কতকগুলি মারাত্মক ভুল হয়েছে যা পড়ে পাঠকবর্গ অর্থ না বুঝে অনর্থও বুঝতে পারেন—যথা, 'গোষ্ঠিযোযিকা' হয়েছে গোষ্টযোনিকা, 'ছান্দসী' হয়ে গেছে দ্বাদশী এবং 'কন্যা' হয়ে পড়েছে কাটু ইত্যাদি। কাগজ-সংকট না থাকলে ঐ ফর্ম্মা দুটি বদল করে দেওয়া যেতে পারতো, কিন্তু বর্ত্তমানে তা সম্ভব হোল না। দ্বিতীয় সংস্করণে এই ভুল সংশোধিত হবে। এই অনিচ্ছাকৃত এবং অনিবার্য্য ত্রুটির জন্য পাঠক সাধারণের কাছে বারম্বার মার্জ্জনা চাইছি।

বিনীত

জ্যোতিপ্রকাশালয়

চরৈবেতি !

চল, অগ্রসর হও—আর্য্যঋষির এই অনুশাসন—আদেশ এবং উপদেশ, সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ—চরৈবেতি ! এগিয়ে চল ! পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত ভারত যেদিন বন্দীকারা থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশতলে এসে দাঁড়ালো—সেদিন শুনেছিলাম এই কথা, চরৈবেতি ! এগিয়ে চলবো—বলবো, 'আগে চল আগে চল ভাই—" আরো কত কি ! কিন্তু কি হবে ওসব কথা ভেবে ? রাজনীতি, সমাজনীতি নিয়ে কারবার আর করে না চিন্ময় ! কারাগার থেকে মুক্তি পাবার পর ও এখন অর্থনীতির দিকে ঝুঁকেছে, অর্থাৎ কিছু রোজগার করতে চায়। বুড়ি মা এখনো বেঁচে ; অতিকষ্টে তিনি এই কয়েকটা বছর কাটিয়েছেন সমান্য কয়েক বিঘা ধান-জমির উপর নির্ভর করে ; আশায় আশায় বেঁচে আছেন। ছেলে বাড়ী ফিরতেই বললেন—বিয়ে কর, বৌ এনে দে একটা, সেবাদাসী হোক—এতোকাল তো দেশের স্বাধীনতার জন্য তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম—স্বাধীন হোল দেশ,আর আমায় কষ্ট দিস কেন বাবা—যে কদিন আছি, একটু সুখ ভোগ করি—ইত্যাদি অনেক কথাই বললেন মা। কিন্তু বৌ আনবার আগে কিছু টাকা রোজগার করা দরকার। কি করবে চিন্ময় ? বাঙালী-পাঁঠার দোকান—কিংবা রাজ-বন্দী-রসগোল্লা, অথবা—নাঃ, কিছু ঠিক করতে পারলো না। মার পায়ে প্রণাম ঠুকে চলে এল কলকাতায়, চাকুরির সন্ধানে—ওটাই বাঙালীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন !

লেখাপড়ায় বি-এ, শরীরে সবল আর মনে যে-কোনও কাজের যোগ্য—যদিও কোন কাজই তার জানা নেই। চেহারাটাও ভাল! কিন্তু চাকরী যোগাড় করা অত সোজা নয়; টাকা চাই, মুরুব্বি চাই—আরো কতকি চাই। চিন্ময় বন্ধুর মেসে দিন চার পাঁচ থেকে নানা স্থানে ঘুরে হায়রাণ হয়ে হাল ছেড়ে দিল—চাকরী যোটান যাবে না!

—একটা ট্যুশনি আছে, করবি? বন্ধুটি বলল!

—অগত্যা—মাইনে কত, ছাত্র কোন ক্লাসের?

—ছাত্র ক্লাশ টেনএ পড়ে—মাইনে থাকা, খাওয়া, হাতখরচ—দশটাকা।

—বেশ—চল, ঠিক করে দে!—চিন্ময় রাজি হয়ে গেল।

ঐ দিনই বিকালে মদনমিত্র লেনের এক বড় লোকের বাড়ীতে তাঁর ছোট ছেলেকে পড়াবার জন্য নিযুক্ত হোল চিন্ময়—কিন্তু মাসিক নগদ দশ টাকা রোজগার করতে সে বাড়ী থেকে বের হয়নি—অতএব ফন্দি আঁটতে লাগল—টাকা কি ভাবে রোজগার করা যায়!

সময় মাত্র দুপুর বেলা, যখন ছাত্রটি স্কুলে থাকে—দুবেলা তাকে পড়াতে তো হয়ই, অধিকন্তু বাড়ীর দু একটা কাজও করতে হয়! চিন্ময় পনর দিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলো—দুর ছাই! নাটক লিখবার চেষ্টা করেছিল চিন্ময় জেলে বসে; একখানা লিখেও ছিল। তার বাসার কাছাকাছি অনেক পুস্তক-প্রকাশকের দোকান—চিন্ময় দুপুর বেলা প্রায় প্রত্যেকের দোকানে ঘুরে নাটকখানা ছাপাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু সকলেই বললেন—কোন প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনীত না হলে নাটক ছেপে লাভ নেই—বিক্রী হবেনা—উপন্যাস হলে তাঁরা চেষ্টা করতেন।—উপন্যাসই একখানা লিখবে না কি চিন্ময়? কিন্তু সময় কোথায়—আর লিখলেই যে কেউ ছাপবে, তারও নিশ্চয়তা নেই - তবে?

নিদারুণ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে চিন্ময় গুদোর মোড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে,

করবে কি সে! এই দশ টাকা এলাউন্স আর খাওয়া থাকায় জীবন কাটানো অসম্ভব—চাকরীও যোগাড় করা যাবে না—তাহলে?

একখানা ভ্যান যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, চার পাঁচটি মেয়ে, সবাই বেশ সাজ পরা—দু তিনটে পুরুষও—ভ্যানটার গায়ে লেখা—'আলোছায়া' ওরা নিশ্চয়ই সিনেমা আর্টিস্ট। হঠাৎ চিণ্ময়ের মাথায় বুদ্ধি যোগাল, তার নাটকখানা নিয়ে সে একবার সিনেমা-ওয়ালাদের কাছে চেষ্টা করলে পারে— আরেকটা লাইন তো খোলা আছে।

চিন্ময় আর দেরী করলো না, পরবর্ত্তী ট্রামেই উঠে পড়লো টালিগঞ্জের দিকে যাবার জন্য। কিন্তু সে শুনেছে, সিনেমা কোম্পানীতে মাথা গলানো বড় সহজ ব্যাপার নয়—তবে বরাতে থাকলে রোখে কে! চিন্ময় সহজে পিছুবার লোক নয়। টালিগঞ্জে যাবার আগে সে ধর্ম্মতলায় নামল, এখানে অনেক সিনেমা কোম্পানীর অফিস আছে। চিন্ময় এক এক করে প্রায় প্রত্যেকটিতেই ঢুকলো—এতেই তার সময় গেল দিন আট নয়—তারপর গেল টালিগঞ্জে—সেখানেও দিন চার পাঁচ ঘুরলো সে—কিন্তু তার নাটক নেওয়া দূরে থাক, পড়ে দেখতেও চাইল না কেউ—নিরাশ হয়ে চিন্ময় ছাত্রটিকে ভাল করে পড়াতেই মনস্থ করলো শেষে;—এই সব কাজে যখন মাসখানেকের ওপর কেটে গেছে, তখন হঠাৎ একটি খবর পেল—রঞ্জাবতী চিত্রালয় একখানা নাটক খুঁজছে—চিন্ময় চেষ্টা করে দেখতে পারে।

উৎসাহ আর নাই চিণ্ময়ের, কিন্তু খবরটা যখন পাওয়া গেল, তখন একবার যাবে। এদের অফিসটা বহু দূরে—টালিগঞ্জের শেষ সীমায়। চিন্ময় দুপুর বেলা রওনা হয়ে গেল। খুঁজে বের করলো রঞ্জাবতী চিত্রালয়ের অফিস—তারপর ঢুকলো।

টেবিলের ধারধারে জন পাঁচেক নারী-পুরুষ—আর একটু দূরে

অন্য একখানা চেয়ারে একটি মেয়ে—বছর উনিশ কুড়ি হবে বয়স। দেখতে চমৎকার!

চিন্ময়কে দেখে টেবিলের লোকগুলি সবাই তাকাল। চিন্ময় নমস্কার জানিয়ে বলল—শুনলাম আপনারা সিনেমার জন্য বই খুঁজছেন—আমার একখানা নাটক লেখা আছে—যদি দয়া করে শোনেন···

—আপনি কি নতুন লেখক?—একজন প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হাঁ—লেখক নতুন হলেও আমি দীর্ঘদিন সাধনা করেছি!

—বসুন—শুনবো আমরা—অন্য একজন বললেন।

চিন্ময় উৎসাহিত হোল। তবু যাহোক এঁরা শুনতে চাইলেন—সে বসল একখানা চেয়ারে। আষাঢ়ের শেষ ভাগ—দিন খুব বড়—বেলা এখন তিনটে—ঘণ্টাদুই পড়ে শোনালে নাটকখানা শেষ হবে।

চা এবং সিগারেট ধরিয়ে ওঁরা শুনতে লাগলেন। চিন্ময় পড়ে চলেছে; হঠাৎ সেই তফাতে-বসা মেয়েটি বলল—আমায় তাহলে আপনারা নিতে পারবেন না?

—অত কনডিশ্যান করে আর্টিস্ট নেওয়া সম্ভব নয়—জবাব হোল।

—আচ্ছা, নমস্কার! বলে মেয়েটি উঠে গেল। আর এঁরা মেয়ে পুরুষ সকলেই একযোগে হেসে উঠলেন। কি এমন কনডিশ্যান যাতে এঁরা রাজি হতে পারলেন না? চিন্ময় ভাবলো একটু, তারপর আবার পড়তে আরম্ভ করলো। পড়া শেষ হতে প্রায় পাঁচটা বাজলো—মাঝে বহু বাধা, কেউ হাসলেন, কেউবা কাশলেন, কেউ উঠে গেলেন, মানে, ভালভাবে কেউই শুনলেন না।

পড়া শেষ হলে মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর কাটুবাবু, (ইনিই সম্ভবতঃ ডাইরেকটর) বললেন,—ভালই হয়েছে—চমৎকার!

উৎসাহে চিন্ময় চাইল ওঁর মুখপানে। কাটুবাবু এবার গলা ঝেড়ে

বললেন,—কিন্তু কি জানেন, এ সব জিনিস আমাদের দেশের লোক বুঝবে না, তারা চায় আনন্দের মধ্যে খানিকক্ষণ সময় কাটাতে। এ আপনার সাহিত্য হয়েছে।

—সাহিত্যই তো মানুষকে আনন্দ দান করে—চিন্ময় বলল।

—হ্যাঁ—কিন্তু এতটা উঁচু আইডিয়া তাঁদের মাথায় ঢোকানো যাবে না!

—আপনি হয়তো দেশের শ্রোতাদের উপর অবিচার করছেন—চিন্ময় আস্তে আস্তে বলল—ভাল জিনিষ পেলে তাঁরা নিশ্চয় গ্রহণ করবেন।

—দেখুন, আমরা সে রিস্ক্ নিতে পারি নে। পয়সার জন্য কারবার করছি—লোকসান দিতে তো নয়—আপনার এ জিনিষ আরো পঞ্চাশ বছর পরে চলতে পারে—

—ভাল! তাহলে অপেক্ষা করবো আরো পঞ্চাশ বছর,—বলে নমস্কার জানিয়ে উঠলো সে। মানুষের সম্বন্ধে এদের কতখানি অশ্রদ্ধা আর নিজেদের বিজ্ঞতা সম্বন্ধে এদের কতখানি অহঙ্কার, ভাবতে ভাবতে ঘরের বাইরে এসে দেখলো, বৃষ্টি পড়ছে; কিন্তু খুব জোরে নয়, চিন্ময় ভিজেই বেরিয়ে পড়লো; ওখানে দাঁড়াতে তার আর ইচ্ছে হোল না—হাসির হুল্লোড় ভেসে আসছে, শুনতে পেল—হয়তো তাকেই বিদ্রূপ করছে ওরা।

বড় রাস্তায় পড়তেই বৃষ্টিটা অত্যন্ত জোরে এসে পড়লো। এখনো অনেকখানি গেলে তবে ট্রামলাইন—দ্রুত হাঁটতে লাগল চিন্ময় ভিজে ভিজে—অকস্মাৎ কে যেন ডাকলো,—শুনছেন? ও মশাই শুনুন।

চিন্ময় তাকিয়ে দেখলো, রাস্তার পাশে প্রকাণ্ড কৃষ্ণচূড়া গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটি—ভিজে গেছে সর্ব্বাঙ্গ—স্যাণ্ডেলের কাদা ছিটকে শাড়ীটাও নোংরা করে দিয়েছে। করুণ ক্লান্ত মুখ—কিন্তু হাসছে মেয়েটা। চিন্ময় এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—ওরা নিল আপনার বই ?

—না—আপনি এই দু'ঘণ্টা কোথায় ছিলেন ?

—কা[illegible]ছিলাম—এখানে অনেকগুলো কোম্পানী আছে—প্রায় সব বাড়ীই ঘুরলাম। রোজ তো আসতে পারি না—পয়সা খরচ হয়।

—[illegible]ন কোথায় ?—চিন্ময় শুধোলো।

—মানিকতলায়।

—চলুন—আমিও থাকি ওপাড়ায়।

—থামুন, বৃষ্টিটা একটু কমুক। আপনার নাটক যে ওরা নেবে না, তা আমি তখুনি জানতাম—মেয়ে অর্থাৎ লেখিকা হলে কথা ছিল, আপনি পুরুষ !

হাসতে লাগলো মেয়েটা। চিন্ময় একটু বিরক্ত হয়ে বলল,—আপনি জানতেন তো বললেন না কেন ? এতক্ষণ সময় নষ্ট করতাম না আমি।

—অন্যায় অভিযোগ করছেন আপনি। আপনার সঙ্গে আলাপ নাই, পরিচয় নাই—আমি কেমন করে বলবো সে কথা ?

—ও হ্যাঁ—আচ্ছা, আপনি কি করে জানলেন, ওঁরা নেবেন না ? ওঁরা কি কারো বই নিয়েছেন ?

—তা জানি না, তবে এই সব হঠাৎ-গজা কোম্পানীর দল খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়—আর্টিষ্ট চাই, মেয়ে এবং পুরুষ ; লেখক চাই, শক্তিশালী এবং নামকরা ; গল্প চাই, নতুন এবং সস্তা ! হা হা !

চিন্ময়ও হাসলো একটু। বৃষ্টি অত্যন্ত জোরে পড়ছে ; গাছতলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হাত এড়ানো যায় না ; চিন্ময় বলল,

—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার চাইতে চলুন, হাঁটতে হাঁটতে ভিজি !

—মন্দ কথা নয়, কিন্তু শাড়ীখানা কাদায় নষ্ট হয়ে যাবে—আর জানেন তো, শাড়ী আজকাল বড় দুর্লভ।

—ও তো ই হয়ে গেছে—চলুন—এভাবে ভেজা যায় না আর।

চিন্ময় মেয়েটির শাড়ী ধরে টান দিল। হাসিমুখে সেও নেমে পড়লো রাস্তায়। পাশাপাশি চললো দুজনে। চিন্ময় বলল—এ বড় মন্দ লাগছে না, কি বলেন ?

—হাঁ, যদি বৃষ্টিতে ভিজে অসুখ না করে—হাসলো মেয়েটি।

—সিনেমায় নামবার সখ কেন আপনার ?—চিন্ময় শুধুলো।

—সখ নয়, প্রয়োজন ! আর কোন চাকরী করবার যোগ্যতা নেই, ঝির কাজও জানিনে—চেহারাটা মন্দ নয়, যদি ওঁরা দয়া করেন—এই ভেবে চেষ্টা করছিলাম !

—ওঁরা তো দয়া করতে প্রস্তুত ছিলেন—যদি আপনি ওঁদের প্রস্তাবে রাজি হোন অর্থাৎ কোন কনডিশ্যান না দেন তো কাজ পাবেন।

—সে-ভাবে কাজ নেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু—থাক ওকথা—হাসলো মেয়েটি—বললো—রেশনের দোকানে কাজ একটা পাবার আশা আছে—কিন্তু মেয়ে হয়ে জন্মানোই অপরাধ।

চিন্ময় ওর মুখ পানে চাইল, কোনো জবাব দিল না কিছুক্ষণ। সামনে খানিকটা কাদা জমে গেছে। চটি জোড়া খুলে হাতে নিল মেয়েটি—হঠাৎ একখানা মোটরগাড়ী সবেগে চলে গেল এবং দুজনের সারা গায়ে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। মেয়েটি বলল,—চমৎকার—এই জন্যেই তো বড়লোক হতে হয়।

দেখা গেল, কাদাটা পার হয়েই মোটরখানা দাঁড়িয়ে পড়েছে এবং ওদের ডাকছে। দুজনেই হেঁটে এসে দেখলো, গাড়ীতে বসে সেই রত্নাবতী চিত্রালয়ের বাবু দুজন। মেয়েটিকে ওরা বলল সস্নেহে,—ভিজে কাকভেজা হয়ে গেছেন যে দূর্ব্বা দেবি !

—হাঁ, তারপর আপনাদের দেওয়া কাদায় কাক ময়ূরপুচ্ছ পরেছে।

—ও স্যরি !—আসুন, আপনাকে পৌছে দিই—উঠুন গাড়ীতে।

—ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ! কিন্তু থাক, মানিকতলা অনেক দূর, আপনাদের অনেক পেট্রল খরচ হয়ে যাবে—এই তো ট্রামডিপো, আমরা ট্রামেই চলে যাব—

—আমি শ্যামবাজারেই যাচ্ছি; আসুন, আপনাকে নামিয়ে দেব!

—ও, যাচ্ছেন! তাহলে চলুন—বলে খোলা দরজা দিয়ে উঠে পড়লো দূর্ব্বা—গাড়ী ছেড়ে দিল। চিন্ময়কে এখন একা পথটা অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু উপায় কি! চিন্ময় তো সুন্দরী তরুণী নয়! কিন্তু আশ্চর্য্য, গাড়ীখানা এককদম দুকদম গিয়েই থেমে [illegible] ড্রাইভারের হাতে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দূর্ব্বা নেমে পড়ল, গট্‌গট্ [illegible] আসছে [illegible] দিকে!

— কি ব্যাপার?—চিন্ময় সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলো!

—বিপদের বন্ধুকে ছেড়ে যেতে চাইনে আমি!

—অর্থাৎ?

—আমি ভেবেছিলাম, ওঁরা আপনাকেও তুলে নেবেন গাড়ীতে। কিন্তু আপনি তো [illegible]র সুন্দরী মেয়ে নন্—হাসলো দূর্ব্বা।

—তা হোক, আপনি চলে গেলেই পারতেন!

—না—চলুন, আমরা হেঁটে গিয়ে ট্রামে উঠি।

দূর্ব্বা এবার হাত ধরলো চিন্ময়ের। দুজনে চলতে লাগলো। গাড়ীখানা এখনো অপেক্ষা করছে। ওরা কাছাকাছি এসে পড়তে গাড়ীর একজন ডাক দিল—আসুন, দুজনেই আসুন।

—থাকি, ধন্যবাদ—আমরা ট্রামেই বেশ যেতে পারবো—বলে দূর্ব্বা টান দিল চিন্ময়ের হাতে। গট্‌গট্ করে এগিয়ে চললো ওরা। চিন্ময় নিরুপায়ের মত ওঁর সঙ্গে চলেছে। টালিগঞ্জ ট্রামডিপো দেখা যাচ্ছে; কিন্তু মোটরগাড়ীর আরোহী তখনও ডাকছিল—মিছে কেন কষ্ট পাবেন—আসুন, দুজনকেই পৌছে দিচ্ছি!

দূর্ব্বা কোন জবাব দিল না—সটান এসে ট্রামে উঠলো। বসলো একেবারে সামনের সীটে। পাশেই বসালো চিন্ময়কে—তারপর রুমাল দিয়ে মুখচোখ মুছতে মুছতে বললো—মানুষ না জানোয়ার !

ব্যাপারটা রহস্যময় হলেও চিন্ময় বুঝতে পারলো—দূর্ব্বা খুব অপমান বোধ করেছে যে-কোন কারণে হোক। সে নিঃশব্দে বসলো—ট্রাম ছেড়ে দিল। দীর্ঘ পথ, বৃষ্টি চলছে। দূর্ব্বা বলল,—আপনার নাটকখানা কি নিয়ে লেখা—সামাজিক না পৌরাণিক ?

—সামাজিক।

—ও—কিন্তু সমাজ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানলাভ আপনি করেন নি তো !

—কেন ? চিন্ময় বিস্মিত হয়ে উঠলো।

—দেখেই বোঝা যাচ্ছে ! আপনি পৌরাণিক নাটক লেখেন না কেন ? সীতা-সাবিত্রী—এমন কি অহল্যা পাষাণীর কথা নিয়ে ?

—তাতে কি লাভ ? কে অভিনয় করবে ?

—এ দেশে ওর দাম এখনো আছে। আপনি একখানা লিখুন, অভিনয় আমি করিয়ে দেব—

হাসি পেল চিন্ময়ের। নিজেই যে কাজের যোগাড়ে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে নিরাশ হয়ে পড়েছে, সে কি সাহায্য করবে চিন্ময়কে ! শুধু নারীর সম্মান রাখবার জন্য বলল—আছে নাকি ও লাইনে কেউ আপনার ?

—না—নেই কেউ ! থাকলে কি আর এতো ঘুরতে হোত ! তবে আমি মেয়ে এবং সুন্দরী—ও আমি যোগাড় করে নেব।

—যোগাড় করতে পারছেন না তো ?

নিজের সম্মান বজায় রেখে চেষ্টা করতে চাই, তাই এখনো পারছিনা।

—এ লাইনে সম্মান বজায় রাখা খুবই কঠিন।

—হোক কঠিন—আমি সেটা করবো !

চিন্ময় আর কিছু বললো না। নিতান্ত অপরিচিতা এই নারী—কে এ কি এর পরিচয়, কিছুই তার জানা নেই, জানবার দরকারও কিছু নেই চিন্ময়ের, তবু যেন মনটা কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে উঠছে। দৈহিক সৌন্দর্য্যে মেয়েটি সত্যিই অনুপমা, রংটাও চমৎকার—ঠিক দূর্ব্বারই মত। কিন্তু সত্যি কি ওর নাম দূর্ব্বা !

—দূর্ব্বা কি সত্যি নাম আপনার ? নাকি সিনেমার জন্য নেওয়া নাম ?

—সত্যি নাম, কেন ? আমার নাম শ্রীমতী দূর্ব্বাদল দেবী ! এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে আপনার ?

—না—আশ্চর্য্য নয়, নামটা নতুন লাগছে !

—ও হ্যাঁ—নতুন—আমিও নতুন কিনা !

—তার মানে ?

—মানে—মেয়ে হয়ে জন্মানো আমার ঠিক হয় নি—পুরুষ হয়ে জন্মালে আমার নাম হোত কি জানেন ?

—কি ?

—দূর্ব্বাসা।

—আপনি দূর্ব্বাসার মত বদরাগী নিশ্চয় ?

—দূর্ব্বাসা মোটে বদরাগী ছিলেন না—তিনি ক্রোধ রিপুর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন—ঋষি কখনো রাগী হয় ? আপনি কিচ্ছু জানেন না।

—সত্যি জানিনে ! কিন্তু আপনি তো যথেষ্ট জানেন দেখছি ! কোথায় পড়েছেন এসব ?

—পড়িনি—শুনেছি আমার ঠাকুরদার কাছে। তিনি পঞ্চতীর্থ ; পণ্ডিত, তাই খেতে পাননা—বুড়িয়ে বাহাত্তুরে হয়ে গেছেন !

—তাঁর চরণ দর্শনের সৌভাগ্য হবে আমার ?

—ঠাট্টা করছেন ? চরণ দর্শন কি কথা মশাই ?

—সত্যি ঠাট্টা করিনি ! অমন একজন পণ্ডিত লোকের দর্শন আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি।

—সত্যি হলে চলুন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে—যাবেন ?

—যাব—আর কে আছেন বাড়ীতে ?

—আর কেউ না—তিনি এবং আমি—একাই সব, ঝি, রাঁধুনী এবং গৃহকর্ত্রী—চলুন, দেখবেন, আপনাকে গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে চা খাওয়াবো।

—সে আবার কি রকম চা !

—ঠাকুরদা খান—ঐ একটা মাত্র নেশা তাঁর, আর তামাক অবশ্য আছে, যদি আমি সেজে দিই !

—আপনি কি স্কুল কলেজে পড়েন নি ?

—বাড়ীতেই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুলকলেজে যাব আমি কোন দুঃখে ! ঠাকুরদা মূল জার্ম্মান ভাষা থেকে আমাকে গ্যেটের ফাউষ্ট পড়ান।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললো চিন্ময়, একটু পরে বলল,—এতবড় পণ্ডিত খেতে পান না কেন ?

—কারণ পণ্ডিত আর কেউ খোঁজে না—খোঁজে পল্লবগ্রাহী, যারা এখানে ওখানে সেখানে দু'একথামচা বিদ্যে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যোগাড় করে আর ডায়াসে বসে বক্তৃতা করতে পারে।

কথাটা নিদারুণ সত্যি ; চিন্ময় চুপ করে রইল। গাড়ী এসপ্লেনেডে এলে ট্রাম বদল করে ওরা অন্য ট্রামে উঠলো। বৃষ্টি থেমে গেছে কিন্তু ঠনঠনে জলে ভর্ত্তি—ট্রাম আর এগোল না, অগত্যা হাঁটু অবধি জল ভেঙে দুজনে মানিকতলার একটা গলিতে এসে পৌঁছাল। রাস্তায় লোক হাসছে

জীর্ণ একখানি একতালা বাড়ীর দরজা ঠেলে ঢুকলো দূর্ব্বা ; চিন্ময়কে বললো—আসুন ভেতরে—এইটা আমার রাজপ্রাসাদ—দেখুন ভাল করে। ঠাকুর্দা দেহ রাখলে আমি এটা প্রত্নতত্ত্ববিদদের হাতে ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম।

এই রঙ্গরহস্যের মধ্যে কোথায় যেন বেদনার ইঙ্গিত রয়েছে—যেন বিষের কাঁটা ! চিন্ময় করুণ হেসে ঢুকলো ভেতরে। অন্ধকারে দূর্ব্বা ওকে নিয়ে এল একটা ঘরে—বলল—একটা নতুন বন্ধু পেলাম দাদু !

সেকালের তৈরী অতিজীর্ণ একটা পালঙ্কে বসে আছেন এক বৃদ্ধ !

—এস দিদি, এসো !—আহ্বান জানালেন চিন্ময়কে।

চিন্ময় তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করছে, অকস্মাৎ দূর্ব্বা উচ্চ হেসে বলল—দিদি নয় দাদা, একটা আনকোরা লেখক দাদু, তুমি আমায় ফাউষ্ট পড়াও শুনে প্রণাম করতে এলেন—চশমাটা লাগিয়ে দেখ।

চিন্ময় সেই আধো অন্ধকার ঘরেও দেখতে পেল, বৃদ্ধের চোখে যেন জ্যোতি জ্বলছে !

চিন্ময়ের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করলেন বৃদ্ধ। মাথা তুলে চিন্ময় দেখলো—জীর্ণ খাটখানার পাশে থাকে থাকে সাজানো পুস্তকরাশি—ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা তাকগুলো ভর্ত্তি বই, আর ওদিকে একটা চৌকিতে অনেকগুলো হাতেলেখা পুঁথি। একটা দেওয়ালে একখানি বড় ছবি টাঙানো—নীচে লেখা—"নমো শ্রীশ্রীগুরুদেবায়"

চিন্ময় দেখলো, জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষের ছবি। কি কথা সে এঁর সঙ্গে বলবে, ঠিক করতে পারছে না। উনিই প্রশ্ন করলেন—কি নামটি দাদু তোমার ?

—চিন্ময় মুখোপাধ্যায়—উত্তর দিল চিন্ময়।

—কি করা হয় ? বই লেখ ?

—না—বলে চিন্ময় যথাসাধ্য অল্প কথায় তার বাড়ীর এবং বর্ত্তমান

জীবন-সংগ্রামের পরিচয় দিল--কিন্তু ভিজে কাপড়ে রয়েছে ইতিমধ্যে দূর্ব্বা একখানা ধোয়া ধুতি এনে দিয়ে বলল,

—আমার কাপড় ছাড়তে দেরী হোল—নিন্, ছেড়ে ফেলুন।

—থাক্, আমি বাড়ী গিয়েই কাপড় ছাড়বো!

—তা কি হয়—গোলাপ ফুলের পাঁপড়ির চা না খাইয়ে আপনাকে ছাড়ছি না—তুমি বলো দাদু ও'কে কাপড় ছাড়তে!

—কাপড়খানা ছেড়ে ফেল ভাই, অসুখ করবে—তোমাদের শরীর তো আর আমার মত শক্ত নয়—পলকা।

—আপনার শরীর এখনো বেশ শক্ত আছে দাদু? চিন্ময় শুধুলো।

—আর কতদিন থাকবে! জীবন-যুদ্ধে বার বার হেরেছি। এখন আর যুদ্ধ নাই, সন্ধিও হয়নি · এটা মাঝের অবস্থা!

—আপনি হেরেছেন, শুনে বড্ড দুঃখ হচ্ছে দাদু।

—না ভাই—দুঃখ কি! পুরুষকারের হার হলে তখন বুঝতে পারা যায় আমার শক্তি কত ক্ষুদ্র—হারাই তো দরকার, কিন্তু থাক্, তোমরা ছেলেমানুষ, ওসব বুঝবার এখন সময় নয়—কাপড় ছাড়!

এই জ্ঞানবৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলতে ভয় করছে চিন্ময়। কিন্তু কেমন যেন একটা পিপাসাও জাগছে ও'র কাছে অনেক কিছু জানবার জন্য। আজ নয়—অন্য দিন ধীরে ধীরে প্রশ্ন করবে চিন্ময়—ভাবতে ভাবতে কাপড় জামা ছেড়ে ফেললো। খালি গায়ে কোঁচার খুঁট চড়িয়ে বসলো চিন্ময় আবার। নাটকের পাণ্ডুলিপিটা খবরের কাগজ দিয়ে মোড়া ছিল—তাই খুব বেশি ভেজেনি—বিশেষ ক্ষতি হবে না।

দূর্ব্বা দুটো কাচের গ্লাসে চা নিয়ে এল—আর একটা পাথরের বাটিতে পোয়াটাক মুড়ি, নারকোল কোরা, গোটাচার চিনেবাদামের বীচি—কাঁচা লঙ্কা টুকরো করে কেটে মিশিয়ে দিয়েছে মুড়ির সঙ্গে। দাদুকে শুধু

চা দিল আর চিন্ময়কে দিল চা-মুড়ি—বলল—বড় লোকের বাড়ীর রাজভোগ—

—রাজারাও এসব খাদ্য এরকম বাদলার দিনে পেলে ধন্য হবে—চিন্ময়ও হেসে বলল—মুড়িগুলি সাগ্রহে নিল হাতে ধরে।

বৃদ্ধ চায়ের গ্লাসটা নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিলেন—বললেন,—রাজার ভোগে থাকে প্রচুর উপকরণ আর প্রচুর অতৃপ্তি কিন্তু কাঙালের ভোগে থাকে স্বল্প উপাদান অথচ প্রচুর তৃপ্তি—কিন্তু এই সন্তোষ যৌবনধর্ম্মী নয় চিন্ময়—মনে রেখো।

—ঠিক তো বুঝতে পারলাম না দাদু ?

—বলছি যে, যৌবনে মানুষের স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া যোগীর লক্ষণ হতে পারে—কিন্তু যৌবনটা আদতে ভোগের কাল; সে ভোগ পার্থিব থেকে অপার্থিব হ'তে হ'তে এগিয়ে যাবে, নইলে ত্যাগ ব্যাপারটা আয়ত্তে আসে না।—চায়ে চুমুক দিলেন আবার।

—ত্যাগ কি করতেই হবে ?

—করতে বাধ্য হতে হয় যে দাদু ? সব থেকে প্রিয় বস্তু এই দেহ—কিন্তু তাকেও তো ধরে রাখা যায় না, ত্যাগ করতেই হয়।

—তাহলে ত্যাগকে আয়ত্ত করার কথা বলছিলেন কেন ? সে তো বাধ্য হয়েই করতে হবে—চেষ্টার কি দরকার ?

—ভোগটা শেষ হলে সন্তুষ্ট মনে সেটা করা যায়—আক্ষেপ থাকে না—তাই যৌবনের ধর্ম্ম পার্থিব ভোগটা পূর্ণভাবে পাবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা—ভিখারীর ভোগকেই রাজভোগ বলে মেনে নেওয়া এখন তোমাদের উচিৎ নয় দাদু।

—টাকা রোজগার করতে হবে বলছেন—চিন্ময় হাসলো।

—অতি অবশ্য করতে হবে, তবে সৎ উপায়ে; কারণ অসৎ উপায়ে

উপার্জন করলে পরে আত্মগ্লানি আসতে পারে, আইনেও শাস্তি হতে পারে – এইজন্য অসৎ উপায় বর্জনীয়।

চিন্ময় চা-মুড়ি ত শুনলো কথা কয়টা, অকস্মাৎ বলল,

—দূর্ব্বাকে কি আপনি সিনেমার অভিনেত্রী হয়ে উপার্জন করতে বলেন ?

—ওকে আমি শিক্ষা দিয়েছি সদুপায়ে অর্জন করতে – ডিপ্লোমা ওর নাই, কিন্তু বিদ্যা ওর আছে – তাছাড়া আছে সংযম—যা আমি সারা জীবন ওকে শেখাচ্ছি।

—মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে অবশ্য উনি যে-কোন সদুপায় অবলম্বন করতে পারতেন—কিন্তু মেয়েদের সিনেমায় যাওয়াটা……চিন্ময় আর বললো না।

—সেটা এই দেশের দুর্ভাগ্য। অন্য দেশে মানুষ নারীর সম্মান রাখতে জানে। তবে আমি সিনেমাতেই ওকে যেতে বলি নি—যেকোন সৎ উপায় অবলম্বন তাকে করতে হবে জীবিকার জন্য !

--বিয়ে দিয়ে সংসারী করে দিলে হয় না ?

—বিয়ে! বৃদ্ধ যেন চমকে উঠলেন—অশ্রুসজল চক্ষে তাকালেন শ্রীগুরুদেবের ছবিখানার দিকে—তারপর যোড় হাতে প্রণাম করলেন।

চিন্ময় বুঝতে পারছে না, বিয়ের নামে বৃদ্ধ কেন এতটা বিচলিত হলেন। একটু থেমে একটু ইতস্ততঃ করে সে শুধুলো,

—বিয়ে কি দেবেন না আপনি ওর ?

—বিয়ে ওর দিয়েছিলাম চিন্ময়, অষ্টম বর্ষে গৌরীদান করেছিলাম।—

দুটি চোখ জলে ভরে এল বৃদ্ধের কিন্তু তৎক্ষণাৎ সামলে বললেন,

—তুমি ভা[illegible] ভুল করেছিলাম – না, আমার গুরুদেবের আদেশ পা[illegible] বুঝিনি আমি—আর নিজেও ভেবেছিলাম, ওকে সৎপাত্রে

সম্প্রদান করে নিশ্চিন্ত মনে গুরুর চরণে শরণ নিতে পারবো কিন্তু সবই শ্রীগুরুর ইচ্ছা·········থেমে গেলেন।

এই অদ্ভুত গুরুভক্তি চিন্ময়ের ভাল লাগছে না। একজনের সর্ব্বনাশ হয়ে গেল আর উনি শ্রীগুরুর ইচ্ছা দেখছেন কেবল! বলল,

—গুরুদেব এরকম আদেশ করলেন কেন? আটবছরে বিয়ে আর চলতি নেই!

—জানি না, কেন তিনি আদেশ করলেন; তবে তিনি সাধারণ গুরু নন, সত্যাশ্রয়ী যোগী, ঐ যে—যোড়হাতে প্রণাম করলেন। বিরক্তিতে সারা অন্তর ভরে উঠছে চিন্ময়ের, তবু যথাসাধ্য সে-ভাব গোপন করে বলল,

—তাঁর আদেশ পালনের ফল তো দেখতে পাচ্ছেন·········

—না—ওঁদের কাজের ফল অত সহজে ধরা যায় না তো দাদু! জানিনা, কি মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে তাঁর মনে - তবে তা যে মঙ্গলময়, তা জানি!

—ফুৎ! চিন্ময় অব্যক্ত শব্দ করে আবার সামলে বলল,

—তিনি কোথায়?

—দেহ রেখেছেন!

এই অসংখ্য পুস্তকরাশি সমাবৃত অগাধ পাণ্ডিত্য পূর্ণ লোকটির উপর আর তিলমাত্র শ্রদ্ধা রইলনা চিন্ময়ের। এখনো ওঁর এই দারুণ গুরুভক্তি একান্ত অসহ্য—বলল,

—দূর্ব্বা তাহাল·········

—বিধবা। ওর মা-বাবা মারা যায় ওর তিন বছর বয়সে। একসঙ্গেই গেল এক চিতায়, সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। কিন্তু থাক—ওকে মানুষ করলাম; আট বছর বয়সে শ্রীগুরুদেব এসে আদেশ করলেন—বিয়ে দাও। সুপাত্র দেখে বাড়ী বন্ধক দিয়ে বহুটাকা খরচ করে ওর বিয়ে দিলাম—ভাবলাম, বন্ধন মুক্ত হলাম, কিন্তু [illegible] গাড়ী

আর ওকে যেতে হোল না, তিন মাসের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল—তারপর এই বারো বছর ওকে মানুষ করছি ; বাড়ী নিলেম হয়ে গেছে ; এখন আমার বাড়ীতে আমি ভাড়াটে—ভাড়া অবশ্য গ্রহণ করেন না আমার উত্তমর্ণ লোকটি—তবে তার কারণটা মর্ম্মান্তিক !

—কি ?—চিন্ময় সবেগে প্রশ্ন করলো।

—দূর্ব্বা দেখতে সুন্দরী—ওর দিকে তাঁর চোখ আছে !

—আর আপনাকে এই হীনতা সহ্য করে যেতে হচ্ছে ? চিন্ময়ের কণ্ঠে যেন অগ্নিজ্বালা !

—সবই গুরুর ইচ্ছা।

—গুরু না হাতী—রাগে চিন্ময়ের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল—বেঁচে থাকলে তাঁকে দেখ নিতাম কেমন গুরু !

—থামো দাদু—তিনি আমার ইষ্টদেব—বৃদ্ধ করুণ কণ্ঠে বললেন। চিন্ময় থেমে গেল—তৎক্ষণাৎ সামলে বললো—আপনার গুরুভক্তিকে প্রণাম জানাচ্ছি কিন্তু এই অন্ধ ভক্তি আমি সমর্থন করিনে।

—তোমরা যৌবনধর্ম্মী ; তোমরা তো এই কথাই বলবে দাদু, জানি ! তবে আমি জানি—আমার গুরুদেবের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হবেই !

চিন্ময় আর ওঁকে আঘাত করতে চাইল না—বেরুবে। ঠিক সেই সময় দূর্ব্বা ওঘর থেকে এসে বলল,

—চালে ডালে চড়িয়ে দিলাম দাদু—খেতে পারবে না ?

—খুব পারবো দিদি—বৃদ্ধ সহাস্যে জবাব দিলেন।

—আপনিও আসুন না—ভাগ নেবেন !

—না—আমি যাচ্ছি আজ—

—আপত্তি [illegible]সের ? কম পড়বেনা, আজই রেশন এনেছি সকালে।

—[illegible]—দুঃখের ভাগ যদি নিতে পারি তো সুখের ভাগও নিতে চাইব।

—দুঃখের ভাগ—কেন? ওটা তো সহজে কেউ নিতে চায় না।

—তারা সুখের ভাগ নেবারও অধিকারী নয়।—আমি আজ চললাম দাদু।—কাল কোনসময় এসে ক্যাপড়খানা দিয়ে আমারগুলো নিয়ে যাব। ওগুলো শুকোক আজ,—বলেই চিণ্ময় বেরিয়ে পড়লো। দরজার কাছ পর্য্যন্ত এসে দূর্ব্বা বলল,

—হঠাৎ কিছু কাজ করাকে বলে হঠকারিতা।

—জানি—হঠাৎ কিছু আমি করছি না—বাসায় যাচ্ছ।

চিণ্ময় জলকাদার মধ্যে খালিপায়েই ফিরলো মদন মিত্র লেনে। কিন্তু সারা মনটা জুড়ে ও কে, ও কি?

চিণ্ময়ের আজ মাইনে পাবার দিন। মাসের পয়লা তারিখে সকালেই ওকে টাকা দশটা ফেলে দেন ছাত্রের অভিভাবক। গতকাল জলকাদায় চলার জন্য ছেঁড়া জুতোটা একেবারেই ছিঁড়ে গেছে—টাকা-কয়টা পেয়েই চিণ্ময় ভাবলো, জুতো একজোড়া কেনা দরকার। কিন্তু দাম যা বেড়েছে, দশ টাকায় চলনসই একজোড়া জুতোও পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ; তাছাড়া সবকটা টাকাই সে খরচ করতে পারে না—এখানে সেখানে যেতে ট্রাম-বাসভাড়া লাগে—তার জন্য অন্ততঃ দুতিন টাকা হাতে রাখা দরকার। কিন্তু জুতো একজোড়া চাই-ই। যতটা সম্ভব কম দামী জুতোই কিনবে ভেবে চিণ্ময় বেরিয়ে পড়লো দুপুরবেলা।

গায়ের পাঞ্জাবীখানা দূর্ব্বাদের ওখানে শুকুতে দেওয়া আছে—অতএব খালিগায়েই চলে এল। দরজায় ধাক্কা দিতেই খুলে গেল খিলটা, ভাঙা তাই। চিণ্ময় ভেতরে ঢুকে ডাকলো,—দূর্ব্বা দেবি!

—আসুন!…দূর্ব্বারই কণ্ঠস্বর।

চিণ্ময় ঘরের ভেতর চলে এল। দূর্ব্বা একখানা অতি জীর্ণ শাড়ী শেলাই করছিল। শেলাই করে ওটা পরা চলবে, মনে হয় না।

—কি ব্যাপার—একেবারে খালিগায়ে, দুপুরবেলা, আষাঢ়ের রোদে?

—কারণ, জামা ঐ একখানিই, ওটাই পরে বেরুতে হবে আর দুপুরটাই মাত্র সময়, ছাতা বহুকাল নেই।

দূর্ব্বার তিনটে প্রশ্নের জবাব যথাক্রমে দিয়ে গেল চিণ্ময়।

দূর্ব্বা ওর মুখের পানে তাকিয়ে একটু হাসলো, শুধু বলল,—বসুন

—দাদু কোথায়?

—খেয়ে একটু শুয়েছেন···সকাল থেকে সংগ্রাম করছিলেন—ক্লান্ত আছেন।

—সংগ্রাম করছিলেন! মানে ঝগড়া?

—আরে না মশাই—দাদু আমার ঝগড়া করতে পারলে তো বেঁচে যেতাম। দাদু আমার সর্ব্বংসহা মাতা ধরিত্রী—সংগ্রাম করছিলেন মানে, সাধন সংগ্রাম।

—মানে, পূজো আচ্চা করছিলেন?

—উঁহু! ওসব উনি করেন না—তবে কি যে করেন, তাও আমি ঠিক বলতে পারবো না; আপনি দাদুকেই শুধুবেন।—তা এখন যাবেন কোথায়?

—জুতো কিনতে—কাল জলকাদায় জুতোটা গেছে একেবারে।

—জুতো আমারও দরকার। হাতে মাত্র ছটা টাকা আছে। ওতে তো জুতো হবে বলে মনে হচ্ছে না—চটি হতে পারে।

—হ্যাঁ, চটিতে ছটাকাও লাগবে না, কিন্তু কাল তো চটিই ছিল আপনার পায়ে, ভালই তো ছিল দেখলাম।

—আমার নয়, পাশের বাড়ীর পারুলের—চেয়ে পরে গিয়েছিলাম!

হাসলো দূর্ব্বা কথাটা বলতে বলতে। তারপর আবার বলল, —পারুল অবশ্যি চটিজোড়া দিয়েই ফেলতে চায়, কিন্তু নেওয়া ঠিক হবে না ;- ও-ও খুব বড় লোকের মেয়ে নয়।

—উনি বড় লোক হলে আপনি নিতেন ওঁর জুতো ?

—না—বড় লোক হলে আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাব কেন ? আমার কোন বড়লোক, মানে ধনীকন্যা বন্ধু নেই। আমার হীন অবস্থার জন্য ধনীমানুষ কেউ সহানুভূতি জানাবে, এ একেবারে অসহ্য।

চিণ্ময়ের মনে হোলো, বলে যে যিনি এই বাড়ী নীলাম করে নিয়েছেন, তিনি শুধু সহানুভূতি জানাচ্ছেন না, আরো অনেক বেশী অপমান করছেন দূর্ব্বার অন্তরাত্মার, কিন্তু কথাটা অপ্রিয়—অনর্থক ওকে দুঃখ দিতে চাইছে না চিণ্ময়, কিন্তু দূর্ব্বাই বলল—বড়লোকের সংশ্রবে আসতে চাইলে তো অভাব ছিল না আমার—এই বাড়ীর যে আজ মালিক, সে তো আমায় রাণী করে দিতে পারে—হাসলো দূর্ব্বা।

—হুঁ।—কিন্তু।···

—ঐ জন্যেই চাকরী যোগাড়ের চেষ্টা, যদি পেতাম তো দাদুকে নিয়ে উঠে যেতাম অন্য কোথাও—কিন্তু যাক—চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে চটি একজোড়া কিনে ফেলি। বাইরে বেরুতে বড্ড অসুবিধে বোধকরি নাহলে।

—দাদু ঘুমুচ্ছেন—ঘর ছেড়ে যাবেন কি করে ?

—চোররা জানে মশায়, কোন বাড়ীতে ঢুকলে কিছু পাওয়া যাবে। তাছাড়া দাদু ঘুমান না—চোখ বুজে পড়ে থাকেন, হয়তো ধ্যান করেন—আমি ওঁকে বলেই বেরুবো।

দূর্ব্বা ওঘর থেকে অন্য ঘরে গেল। ইতিমধ্যে চিণ্ময় নিজের কাপড়-খানা পরে জামা গায়ে দিল—তার পা খালি। দূর্ব্বা বের হয়ে এল খালি পায়ে। চিণ্ময় বলল—সেই চটিজোড়া পরলেন না কেন ?

—সেগুলো যার তাকে ফিরে দিয়েছি পরের জিনিষ নষ্ট হয়ে গেল, লজ্জার কথা।

—খালি পায়েই যাবেন ?

—উপায় কি! চলুন—দুজনেই তো খালি পায়ে আছি। আপনার সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স জাগবার কোন কারণ নেই।

—নিশ্চয় না। দীনতায় আমি আপনার থেকেও বড়।

—ব্যাটাছেলের মুখে একথা মানায় না। মুটেগিরি করেও রোজ্‌গার করতে পারবেন। আর আমাদের ভগবান মেরেছে—বিশেষ এদেশে; যেখানে যাই, দেহটার দিকেই সকলের লোভ। এইটা লাভ করতে পারলেই যেন তাদের চরিতার্থতা জন্মায়—চলুন।

দুজনে পথে বেরুলো। কলকাতার বড় রাস্তা; দুপাশেই জুতা জামা-কাপড়ের অসংখ্য দোকান। দুপুরবেলা, তাই দোকানে খদ্দেরও কম—যে কোনো জুতোর দোকানে ওরা ঢুকতে পারে। কিন্তু দুজনেই চায়—জিনিষটা সস্তা কোথায় পাওয়া যাবে তাই দেখতে। এই সঙ্কোচ কেউ কাউকে বলতে চায় না—অথচ দুজনের মধ্যেই রয়েছে।

অনেকখানা চলে এল ওরা—ফুটপাত বেশ গরম লাগছে, যদিও একদিকে ছায়া পড়েছে বড় বড় বাড়ীগুলোর, আর ঐ ফুটপাত দিয়েই তারা হাঁটছিল। কারও মুখে কোন কথা নেই। চিন্ময় ভাবছিল—সে নিতান্ত দরিদ্র, না হলে ভাল একজোড়া লেডিজ স্যু আজ কিনে দিতে পারতে দূর্ব্বাকে। কিন্তু দূর্ব্বা হয়তো নিতে চাইতো না—তার থেকে এই ভাল হয়েছে—চিন্ময়ের টাকা নেই। দূর্ব্বা ভাবছিল, ছয়টা টাকার মধ্যে চার টাকার বেশী সে খরচ করতে পারে না—হাতে অন্ততঃ দুটো টাকা থাকা দরকার—অতএব অতি সস্তা দোকানেই যেতে হবে। মানিকতলা থেকে ওরা কলেজ স্ট্রীট মার্কেট অবধি চলে এল, অন্ততঃ শ'খানেক জুতার দোকান পার

হয়ে এল এতখানা রাস্তায় - কিন্তু ওসব ফ্যান আর ইলেকট্রিক আলো-ওয়ালা দোকান, অভিজাত পাদুকালয় —অনভিজাত দূর্ব্বা-চিণ্ময়ের ওখানে ঢুকতে ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু আর কতদূর হাঁটা যায়? দূর্ব্বা বলল,

—নিন্, এবার যে-কোন একটা দোকানে ঢুকে পড়ুন—নাকি দোকানই দেখবেন ?

—কলেজষ্ট্রিটে সুবিধে হবে না—বেন্টিক ষ্ট্রিট দিয়ে গেলে জুতো বেশ সুবিধে পাওয়া যায়—যাবেন ?

—যেতেও তো খরচ আছে চার পাঁচ আনা—আর গিয়ে হয়তো দেখবেন, বিশেষ সুবিধে হবে না—এখানেই কিনে ফেলা যাক - বলে দূর্ব্বা আর অপেক্ষা না করে পাশের দোকানটায় উঠলো গিয়ে। বড় দোকান। মেয়ে খদ্দের দেখে উঠে বসল সব বিক্রয়কারিগণ – আসুন—,আসুন — কি দেব ?

—স্যাণ্ডেল—কম দামী—দূর্ব্বা বলল।

—আপনার পায়ের ?

—হাঁ, আমার এবং ওঁরও·········দাম যেন বেশী না হয়।

—ভাল জিনিষ দিচ্ছি—বলে দোকানী জুতো বার করতে আরম্ভ করলে জোড়ার পর জোড়া—আটদশ জোড়া জুতো শুধু দূর্ব্বার জন্যই বেরিয়ে এল। কিন্তু মূল্য সাত টাকার কম নয় কারো।

না— জুতো কেনার আশা ছেড়েই দিল দূর্ব্বা। উঠে বলল,

—পারবো না আমরা কিনতে !

—কেন—কেন, কি হোল ?

—বড্ড দাম আপনাদের জুতোর।

উঠে বার হয়ে আসবার পূর্ব্বেই ঢুকলো একজন ভদ্রলোক, গায়ে পাতলা আদ্দির পাঞ্জাবী—পায়ে ঝকঝকে জুতো। বললো,

—কি খবর! এখানে কি তোমার?

—জুতো কিনতে এসেছিলাম—বেরিয়ে আসছে দূর্ব্বা—আসুন দাদা, বলে চিন্ময়কে আহ্বান করলো সে। কিন্তু লোকটি বলল,

—কেন জুতো—কিনে নাও;

—না—বড্ড দাম এখানে—আমার হাতে অত টাকা নেই!

—যা কম পড়বে, আমি দিচ্ছি,

—আপনি কেন দেবেন?—দূর্ব্বার কণ্ঠ রুক্ষ শোনাচ্ছে!

—তাতে কি! আসছে মাসে আমায় ফেরৎ দিও।

—না—আসছে মাসেও আমার টাকা বেশী হবার আশা নেই।

—তা হলে তার পরের মাসে।

—তার পরের মাসেও না—আসুন চিন্ময়দা!

দূর্ব্বা সটান নেমে এল ফুটপাতে। গটগট করে অনেকটা এগিয়ে গেছে দূর্ব্বা—চিণ্ময় তাড়াতড়ি হেঁটে এসে বলল,—ব্যাপার কি?—কে উনি?

—বাড়ী-ওয়ালা!—গরু মেরে উনি জুতো দান করতে চান।

—গরু তো এখনো মরে নি!

—না—খোয়াড়ে আছে মনে করেছেন—জানেন না যে গরুর শিং আছে, গুঁতোতে জানে—থাক জুতো কেনা। চলুন, ঐ রেঁস্তোরায় গিয়ে চা খাব।—দূর্ব্বা এগিয়ে এসে ঢুকে পড়লো রেঁস্তোরায়।

—অনেকগুলো পয়সা খরচ হয়ে যাবে কিন্তু—চিণ্ময় পাশে বসে বলল,

—হোক—ঐ লোকটা দেখুক যে, আমার রেঁস্তোরায় যাবার সঙ্গী আছে।

চিন্ময় কিছু বুঝতে পারলো না কথাটার অর্থ। কিন্তু দূর্ব্বার চোখ মুখ কেমন যেন রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে। ভেতরে যে ও অত্যন্ত উত্তেজিত,

হয়েছে, তা বেশ বোঝা যায়। কিছু আর প্রশ্ন করতেও ভয় করছে ওর। দোকানের লোক এসে বলল—কি দেব?

—দু'খানা চপ—দুকাপ চা—বলল দূর্ব্বা।

অর্থাৎ টাকা খানেক—কিন্তু কেন! বিস্ময়ের অগাধ সমুদ্রে পড়েও চিণ্ময় কিন্তু শুধুতে পারলোনা—মাত্র ছ'টাকা সম্বল নিয়ে কেন দূর্ব্বা এতখানি বড়মানুষী করছে? অনুভব করতে লাগলো, দূর্ব্বার সারা অন্তর জুড়ে একটা আশ্চর্য্য রহস্য আছে—কি সেই রহস্য? হয়তো চিণ্ময় কোনদিন জানতেও পারে।

নায়িকার নাম মধুমালা—অথবা মেঘমালা, কোনটা হবে ঠিক করতে পারছে না ওরা। চারজন যুবক আর একটি উনিশ বছরের মেয়ে একখানা টেবিল ঘিরে বসে আছে। মেয়েটি নিঃশ্চুপ, যুবকরাই কথা বলছিল। এই চারজনেই সিনেমা কোম্পানী গড়ে তুলেছে—প্রত্যেকের ভাগে ত্রিশ হাজার টাকা পড়ছে—তিনজনের নব্বই হাজার, কিন্তু চতুর্থ জন ডিরেকটর—এডিটার ইত্যাদি একাধারে: সে টাকা দেবে না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করবে এবং তার কাজের মূল্য ধরা হবে ত্রিশহাজার টাকা। অর্থাৎ ওদের মূলধন দাঁড়ালো একলক্ষ বিশ হাজার।

নায়িকা করবার জন্য এই মেয়েটিকে ওরা সংগ্রহ করেছে। ভদ্রঘরের মেয়ে—লেখাপড়াও শিখেছে খানিকটা এবং বিবাহিতা, কিন্তু ওর অর্থের প্রয়োজন, তাই এই পথে আসতে হোল। সংসার-জীবনে ওর নাম মায়া—কিন্তু সিনেমাতে নামলে নাম নাকি বদলে নিতে হয়—এটা দেশাচার, অতএব ওকে মধুমালা কিম্বা মেঘমালা হতে হবে। চারজন পুরুষের মধ্যে দুজনের ভোট হোল 'মেঘমালা'তে অপর একজন 'মধুমালা' নামে ভোট দিল

কিন্তু ডিরেক্টর বলল, ও'মালা' কথাটাই বাদ যাক—নাম থাক উর্ব্বশী—কিম্বা উষসী—অথবা উজ্জ্বলা…

—'উ' কারটার ওপর এতো ঝোঁক কেন তোমার? বলল একজন।

—তোমাদেরই বা 'ম'কারের উপর এতো ঝোঁক কেন?

—'ম'কার পরম বস্তু জানো তো, পঞ্চ মকার সাধনা….

—এখানে 'ম'কার চলবে না—এখানে ব্রহ্মসাধনা হবে—ডিরেক্টর ধমকে দিল যেন। তারপর বলল—বেশ, উকার যাক—ক কার বা ব-কার আসুক—নাম থাক কমল কিম্বা বকুল—কি বল?

—বড্ড পুরাণো নাম—ঠিক যেন মানাচ্ছে না।

—নাম সম্বন্ধে কে যেন বিশেষজ্ঞ আছে, তাকে শুধোলে হয় না?

—হ্যাঁ—তিনি আবার শো পাঁচেক দাবী করে বসুন—ডিরেক্টর বলল।

মেয়েটি—যাকে নিয়ে এতকথা, এতটা সময় চুপ করে বসে শুনছে আর সামনের চায়ের কাপটায় ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে।

—তোমার কি মত মায়া? কোন নামটা পছন্দ তোমার? বরুণ বলল,

—আপনাদের যা খুসি দিন—আমার আবার পছন্দ কি? বলে মায়া একটু হাসলো—ক্ষীণ হাসি। ও যেন সম্পুর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে এদের হাতে। ও যেন বোঁটা-ছেড়া পদ্ম ফুল—সংসারের শীতল পঙ্ক থেকে ওকে ছিঁড়ে আনা হয়েছে—এখন এরা তাকে পূজোতে লাগাতে পারে কিম্বা ফুলদানীতে রাখতে পারে, অথবা নর্দ্দমায় ফেলেও দিতে পারে। কিন্তু নর্দ্দমায় ফেলে দেবার জন্যই কি ওকে এত যত্ন করে আনা হয়েছে? না—ওকে এরা ফুলদানীতেই রাখবে।

বরুণের পাশে মিহির বলল—নতুন একটা নাম দিতে হবে,—বেশ, আমি প্রস্তাব করি, যে বই আমরা নেব—তার নায়িকার নামটাই ওকে দেওয়া হবে আর সেই নামেই ওকে 'বুম' করা হবে—

—বই কি আপনারা এখনো ঠিক করেন নি?—মেয়েটি শুধোলো।

—ঠিকই আছে একরকম—আমাদের ডিরেক্টর সাহেবের বইখানাই নেওয়া যেতে পারে – তবে—হাসলো বরুণ।

—তবে কি?

—গল্পটা আমাদের সকলের মনঃপূত হয়নি—তা, একটু বদল সদল করে ঐটাই নেওয়া হবে।

—তাতে নায়িকার কি নাম আছে?

—বিহ্বলা—ডিরেক্টর সগর্বে বলল এবার।

—বেশ, তা হলে ঐ নামটাই দেবেন আমায়; আর কি দেবেন, সে কথাটাও ঠিক করে আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট করে ফেলুন!

মেয়েটা বেশ চালাক আছে, দেখা যাচ্ছে। কনট্রাক্ট আগে করে তবে ও এগুতে চায়—অর্থাৎ মরবার পূর্বে যেন জেনে নিতে চায়, তাকে ফাঁসীতে না ইলেকট্রিক চেয়ারে, নাকি জহ্লাদের কুঠারে মরতে হবে এবং তার শ্রাদ্ধটা কতখানা ঘটা করে হবে। কিন্তু কনট্রাক্ট অত সহজে ওরা করে না, বিশেষত নতুন কারো সঙ্গে। মায়ার কথাটা শুনে মিহির হাসলো একটু; বলল,

—আপনি আমাদের বিশ্বাস করছেন না, কেমন?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়—আমার প্রয়োজন। যে জন্যে বেরিয়েছি, বুঝতেই তো পারছেন – টাকার দরকার।

—টাকা এ লাইনে যা পাওয়া যায়, অন্য কোন লাইনেই তা যায় না—এ হচ্ছে রয়েল বিজনেস···তবে আমাদের দিকটাও একটু দেখতে হবে।

—কি দেখবো আপনাদের দিক আমি?—মায়া যেন বোকার মত চাইল।

—মানে, আপনাকে দিয়ে কাজ ঠিকমত হবে কিনা, সেটাও তো আমাদের দেখা দরকার—ফ্লোরে গিয়ে যদি আপনি নার্ভাস হয়ে পড়েন, কিম্বা অভিনয় যদি আপনার অচল হয়, অথবা—

—হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনারা সে-সব দেখে নেবেন। তবে ওগুলো কবে দেখবেন? বইও তো আপনাদের ঠিক হয়নি দেখছি, অথচ আমি আসছি আর যাচ্ছি; এমন করে কদিন আমি ট্রামখরচ করে টালিগঞ্জে আসবো, বলুন?

—আচ্ছা, আপনাকে এবার আমরা খবর দিয়ে আনিয়ে নেব।

—না—ডিরেক্টর বলল—আপনি এই রবিবার, না, শনিবার সন্ধ্যায় আসুন—ঐদিন ফাইনেল হয়ে যাবে - কেমন, অসুবিধা নেই তো?

—আমি কাজ খুঁজতে এসেছি; সুবিধে অসুবিধে ভাবলে চলবে কেন? আজ বুধবার—আমি শনিবারই পাঁচটা নাগাদ আসবো। কিন্তু ঐ দিন যেন যা-হোক ব্যবস্থা করে ফেলেন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়—বলল চারজনেই।

মায়া নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

মায়া চলে যাওয়ার পর ওদের কথার দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হোল। বরুণই বেশি ধনী লোকের ছেলে; দু-এক লাখ ওড়ালেও ওর কিছু ক্ষতি হবে না—কিন্তু অন্য দুজন ধনী হলেও ধনেশ্বর নয়। আর ডিরেকটর ছিল নিতান্ত গরিবের ছেলে—আটদশ বছর আগেও সে ষ্টুডিওর বাইরে শুয়ে রাত কাটিয়েছে। কিন্তু বরাতে যখন যার থাকে তখন আঙ্গুল ফুলে হিমালয় হয়ে যায়—যাক—ডিরেক্টর বলল—এটাকে আমি খুব সুবিধা বুঝছি নে।

—কেন? মিহির প্রশ্ন করলো—তোমার বুঝি সেই মেয়েটার দিকে লোভ?

—মানে, সে এর থেকে হাজারগুণে ভালো, বয়সে, রূপে এবং·····

—এবং—?

—অভিনয়েও!

—অভিনয় না দেখে সেটা বুঝলি কেমন করে?

—ও আর দেখতে হয় না—চোখের জ্যোতি দেখেই বোঝা যায়। বইখানা যদি সত্যি ভাল করতে হয় তাহলে ওকেই আমাদের নায়িকা করা উচিৎ।

—কিন্তু ওরকম কনডিশ্যন! ওরে বাপ···ওতে কে রাজী হতে যাবে!

—ভদ্রঘরের যে-কোন মেয়ের কনডিশ্যন ঐ রকমই হওয়া উচিৎ। তোমরা তাকে কয়েকটা টাকা দিয়ে আর 'বুম' করবার লোভ দেখিয়ে যদি যা-ইচ্ছে তাই করিয়ে নিতে চাও, তো সবাই তাতে রাজি না হতে পারে!

—তারা এ পথে না এলেই পারে?

—সে এপথে এল না—এবং তোমরাও ভাল নায়িকা পেলে না।

বরুণ এতক্ষণ কথা বলেনি—সিল্কের পাঞ্জাবীর সোনার বোতামের মাথায় হীরের ঝলকানি দেখছিল বসে বসে, আর ওদের কথা শুনছিল। এতক্ষণে বলল,

—কি যেন নাম মেয়েটার—দূর্ব্বা? না?

—হ্যাঁ—ঠিকানাও লেখা আছে, মাণিকতলা—সাত নং সম্বুদ্ধ লেন।

—চল না, একবার দেখে আসি; ওর কনডিশ্যানেই না হয় রাজি হওয়া যাবে।

—না—সে হয় না—নরেন, অন্যতম ভাগীদার সজোরে ঘোষণা করলো।

—আরে ভাবছিস কেন? আগে একবার নামুক, তারপর কনডিশ্যন তার কোথায় থাকে, দেখা যাবে—গোড়ার দিকে ওরকম থাকে অনেকের।

—গোড়ায় আমরাই দিয়েছিলাম ওকে কতকগুলো সর্ত্ত, ও তার বদলে নিজের সর্ত্তগুলো দিয়েছে। সর্ত মাত্র তিনটি। প্রথম, দিনের বেলা ছাড়া ও কাজ করবে না; দ্বিতীয়, ষ্টুডিও ছেড়ে ও কোন জায়গায় কারো সঙ্গে যাবে না এবং সন্ধ্যা ছটায় বাড়ী চলে যাবে। তৃতীয়—ও এমন কোন

অভিনয়ে পার্ট নেবে না যাতে দৈহিকভাবে কোন পুরুষকে ওর স্পর্শ করতে হয় বা অভদ্রোচিত বেশবাস করতে হয়—এই তিনটি সর্ত্ত।

—তা, ও তিনটিই আমরা পালন করতে পারবো। অবশ্য দুদিন পরে তার ওসব সর্ত মিনিংলেস হয়ে পড়বে—জানা কথা।

সবাই হাসলো ; অতঃপর বরুণের প্রস্তাবমত তিনজন বেরুলো। বরুণ, মিহির এবং ডিরেক্টার কাটু বাবু। ওর পূরোনাম খুব কম লোকেই জানে, কাটুবাবু নামেই সে সর্ব্বত্র পরিচিত। নরেন রইল অফিস আগলে। একটু পরেই বরুণের মস্ত গাড়ীখানা ওদের নিয়ে চলতে লাগলো মাণিকতলা অভিমুখে। পথে চলতে চলতে বরুণ বলল—সেদিন সেই ছোঁড়াটার সঙ্গে ও হাঁটছিল—হয়তো কোন সম্পর্ক আছে।

—না!—মিহির বলল—মেয়েটা কদিনই এসেছে, ছোঁড়াটা এল মাত্র সেইদিন

—আগে আগে হয়তো ওকে এস্কর্ট করে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতো।

—আরে না। দেখলে না, ও একজন লেখক।

—নামটি বেশ—দূর্ব্বা—বরুণ বলল।

—উচ্চারণ করা বড্ড কঠিন কিন্তু—কাটু সাহেব বলল।

—দুর্গা বলতে যদি অসুবিধা না হয়, দূর্ব্বা বলতে হবে কেন?

—নাম একটু ছোট আর সহজ হওয়া দরকার এ লাইনে।

—বদলে দিলেই হবে। তবে নামটা ওকে মানিয়েছে বেশ।

বরুণের প্রশংসাটা শুনে মিহির এবং কাটু তাকালো ওর পানে। গাড়ী চালাচ্ছিল বরুণ স্বয়ং—সোজা সামনে দৃষ্টি রেখেই চালাচ্ছিল, হঠাৎ গড়ের মাঠের সবুজ সুন্দর রূপের পানে একবার চেয়ে বলল—দূর্ব্বা সত্যি অপূর্ব্ব বস্তু!

—কোন দূর্ব্বা? ঘাস, নাকি ঐ মেয়েটা?

—দুটোই !—বরুণ হাসলো একটু—ওকেই নায়িকা করো। মেনে নাও ওর কনভিক্শন—আপাততঃ মেনে নাও, তারপর ওকে এই দূর্ব্বাঘাসের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে, যাতে আর দেবপূজা হবে না।

—হঠাৎ এ রকম কথার মানে ?—ডিরেক্টর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো।

—মানে—ওর অহঙ্কারকে গুঁড়ো করে দিতে হবে।

—ও কখন অহঙ্কার দেখালো ?

—দেখিয়েছে সেদিন—ওকে লিফ্‌ট দিতে চাইলাম, গাড়ীতে উঠলো—তারপর ঐ লেখকটা, ঐ ভিখিরীটাকে আমি গাড়ীতে নিলামনা বলে গাড়ীর ব্রেকে লাথি মেরে গাড়ী থামিয়ে নেমে চলে গেল, আমায় বলে গেল 'অভদ্র ইতর—মেয়ে বলে ওকে তুলেছি, পুরুষ হলে ওকে তুলতাম না !'

—কথাটা কিন্তু সত্যি—কাটু বলল হেসে।

—হ্যাঁ, সত্যি ! সেইটাই ওকে দেখিয়ে দেব—ও মেয়ে এবং সুন্দরী, তাই ওকেই তুলব—পাঁক তুলবার জন্য আমি পুকুরে নামি না—তুলতে চাই পদ্ম।

সবাই হেসে উঠলো—গাড়ী সবেগে চলছে।

চটি কেনা হয়নি দূর্ব্বার, কিন্তু চিন্ময় একজোড়া রেইন স্যু কিনেছে ; কারণ, দরকার হলে দূর্ব্বার তবু বন্ধু আছে চটী ধার করে পরবার, চিন্ময়ের তাও নেই ; আর জুতো না পরে কোথাও গেলে গলাধাক্কা না হোক নিজের গরজটা বড্ড বেশি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তার সঙ্গে দীনতাও—রেইনস্যুতে দীনতা অবশ্য ঢাকা পড়ে না, তবে বর্ষাকাল—রেইনস্যুর একটা কৈফিয়ৎ আছে। যাই হোক—সাড়ে চার টাকার জুতোজোড়া কিনেছে চিন্ময়। দূর্ব্বা হেসে বলেছিল,

—প্রার্থনা করছি, জুতো পরে বেরুবার সময় যেন বৃষ্টি হয়!

—না দেবি—অমন অকল্যাণ কামনা করোনা—একসেট মাত্র ধুতি পাঞ্জাবী, ছাতা নেই, ভিজে গেলে আর বেরুনই হবে না।

চরম দারিদ্র্য চিণ্ময়ের, বুঝতে কিছুই দেরী লাগেনা—দূর্ব্বা সহানুভূতিশীলা হয়ে উঠলো। ফেরার পথে ঠনঠনের মা কালীকে প্রণাম করতে থামলো দূর্ব্বা, তার আগেই ঐ কথাকটা! হঠাৎ দূর্ব্বা বলল প্রণাম করে উঠে,

—শুনুন, আপনার আছে বুড়ি মা, আর আমার আছে বুড়ো দাদু, দুজনেই আমরা প্রায় সমান ধনী—দুজনেই বেকার—তফাৎ শুধু আপনি পুরুষ আর আমি নারী, কিন্তু দুজনের জীবনেই যুদ্ধ লেগেছে।

—দুজনে একত্র হয়ে যুদ্ধ করলে কেমন হয়? চিণ্ময় জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো। দূর্ব্বা কপট রাগ করে বলল,

—পুরুষ হলেও আপনি দেখছি খুব হীন জাতীয় পুরুষ। একত্র হবার বাসনাটা আপনার মাথায় সর্ব্বাগ্রে গজাল কেন. বলুন তো? আপনার কাছে এটা আমি আশা করিনি·········

চিণ্ময় গোড়ায় ভড়কে গিয়েছিল, কিন্তু ওর বুদ্ধিটা খুব ঘোলা নয়; বলল—একত্র অর্থে কো-অপারেশন বলছি দূর্ব্বা—কোলাবরেশন—বা ঐ রকম একটা কিছু বাংলা কথা বলতে চাই·········

—এইটুকু বাংলাভাষা নিয়ে আপনি বই লিখতে সাহস করেন!—ছিঃ! শুনুন, আমি বলছি, আমাদের দুজনের জীবনেই যুদ্ধ লেগেছে, আর যুদ্ধটা একই ব্যাপার নিয়ে, অর্থাৎ অন্নবস্ত্রের অভাব, অতএব আমরা পরস্পরকে সাহায্য করলে অর্থাৎ মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হলে হয়তো আমরা কিছুদিন টিকে যেতে পারি—পরিণামে জয়লাভও হতে পারে!

—ঠিক বলেছ; মিত্রতা বন্ধন। ঐ শব্দটা কিছুতেই মনে আসছিল না আমার—

—তার কারণ, আপনি বেশী সময় ইংরাজি ভাষায় ভাবেন। যাক—তাহলে আসুন, এযুগে যা কেউ করে না, তাই আমরা করবো।

—কি?—চিণ্ময় বিস্মিত হচ্ছে, কিন্তু ও এগিয়ে এল—বলো, আমি রাজি।

—আমরা জীবনের পথে চলতে পরস্পরকে সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করবো—দিব্যি করতে হবে এই মা-কালীর সামনে।

—শুধু জীবনের পথে কেন—মরণের পথেও—বলে হাত জোড় করল চিণ্ময়।

—থামুন—আবার ধমক দিল দূর্ব্বা—আপনার সঙ্গে আমার এমন কিছু সম্বন্ধ নাই, যাতে জীবন-মরণ, জন্মজন্মান্তর বেঁধে ফেলতে হবে। যতটুকু প্রয়োজন, তাই করতে চাইছি; ওর বেশি একচুল না—

—বেশ, তাই হোক—জীবনের পথে চলতে আমরা পরস্পরকে সর্ব্বান্তকরণে সাহায্য করবো—চিন্ময় বলল, কিন্তু দূর্ব্বার ধমকের-সুরে-বলা কথাগুলো ওর মনে গুঞ্জরণ করছে। আশ্চর্য্য এই নারী, প্রতি মুহূর্ত্তে যে স্মরণ করে তার আত্মমর্য্যাদা, অপরকেও স্মরণ করিয়ে দেয় প্রতি কথায়। দূর্ব্বাও ঠিক ঐ কথাগুলি উচ্চারণ করে প্রণাম করলো দুজনে—উঠে দূর্ব্বা বলল,

—মনে রাখবেন, আমি ছেলেমানুষী করছিনে। অনন্ত জগতের সৃজয়িত্রী ঐ মহাজননীর অস্তিত্বে আমি পূর্ণ বিশ্বাস করি—

—আমি একটুও করি নে—বলে চিণ্ময় হেসে দিল।

—করেন না!—চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠলো দূর্ব্বার, বলল,

—তাহলে আপনি ও প্রতিজ্ঞা আমার সঙ্গে করলেন কেন? আমায় খুসী করবার জন্য যদি ও কথা বলে থাকেন তো এখনি প্রত্যাহার করুন।

—না—আমার কথাকে আমি সত্যের মর্য্যাদা দিতে পারি; তার জন্য ঐ চার-হাতওয়ালা পাথরটাকে বিশ্বাস করা অনাবশ্যক।

—আপনার সঙ্গে তো আমার মিত্রতা হতে পারে না চিন্ময়বাবু !

দূর্ব্বার মুখ যেন মুহূর্ত্তে করুণ হয়ে উঠলো—যেন কি এক দুর্লভ বস্তু তার খোয়া গিয়েছে। অসহায় আর্ত্ত সে মুখ দেখে অতি বিস্ময়ে চিণ্ময় প্রশ্ন করলো—মিত্রতা হতে পারবে না কেন ?

—কারণ, আমি মহাধনীকন্যা, আমি রাজরাজেশ্বরী বিশ্বজননীর মেয়ে, আর, আপনি পথের ভিখারী ; আপনার কেউ নেই—আপনি দীনাতিদীন শুধু নন—আপনি অভাগা। আপনার কথার সত্যতায় আর বিশ্বাস করা যায় না চিণ্ময়বাবু—প্রত্যাহার করুন। নইলে সত্য রাখতে গিয়ে আপনাকে বিস্তর দুঃখ সইতে হবে। আর হয়তো আপনি তা রক্ষা করতে পারবেন না।

—কেন ?

—কারণ কার বলে আপনি সত্য রক্ষা করবেন ? আপনার আধ্যাত্মিক কোন বল নেই, বীর্য্য নেই—যা আছে, সেটা শারীরিক তমোগুণ মাত্র—ও দিয়ে দেশ জয় করা যায়, সম্রাট হওয়া যায়, মন্দির-মসজিদ ভেঙে চুরমার করে দেওয়া যায়, কিন্তু যে-বক্ষশোণিত থেকে জীবনরূপী স্তন্য নিসৃত হয়, তা পান করা যায় না ; যে-কোলে শুয়ে সব ভুলে যাওয়া যায় সে-কোলে পৌঁছান যায় না, যে-মন্ত্র জীবের মুখে সবার আগে জাগে, সেই মা নাম উচ্চারণের অধিকার হয় না—সত্যরক্ষা দূরে থাক, মিথ্যাকে রক্ষা করতেও পারবেন না আপনি—প্রত্যাহার করুন কথা আপনার।

চিণ্ময় প্রথমে বুঝতে পারেনি, দূর্ব্বা কতখানা নিষ্ঠার সঙ্গে ঐ কথা-কয়টা উচ্চারণ করেছিল, কিন্তু তার ভুল ভাঙলো। দূর্ব্বার চোখে মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে একটা ভাব—যার অর্থ হতে পারে চিরদিনের মত সম্পর্ক মুছে দেওয়া। কিন্তু চিণ্ময় সইতে পারবে না। ভাগ্যক্রমে যে অসাধারণ মেয়েটির সঙ্গে ওর আলাপ হয়ে গেছে, তাকে ছেড়ে ও রিক্ত

তে চায় না। তাড়াতাড়ি বলল,—বেশ, আমি বিশ্বাস করছি—সিরিয়সলি বলছি.....

—থামুন চিণ্ময় বাবু—একটা তুচ্ছ মেয়েকে খুসী করবার জন্য এবং তার সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখবার জন্য মিথ্যে বলবেন না। ওঁকে বিশ্বাস করবো বললে করা যায় না—উনি অনুভূতি-লভ্যা। কিন্তু যাক সে কথা—আপনার কথা, আপনি যতদিন রক্ষা করবেন, ততদিন আমিও রক্ষা করবো, আপনি সত্য ভঙ্গ করলে আমারও আর কোনও দায়ীত্ব থাকবে না—এই কথা।

—বেশ, এ্যামেণ্ড করা গেল তাহ'লে—চিণ্ময় হাসবার চেষ্টা করছে, কিন্তু দূর্বা তার উজ্জ্বল চোখ দুটোর দৃষ্টি হেনে বলল,—এ্যামেণ্ড নয়, আপনি ঐ টুকুখানিই বলেছেন, মনে রাখবেন।

—আমি 'জীবনে' কথাটা বলেছিলাম।

—আপনি যেদিন এ সত্য ভাঙবেন, সেদিন আমার কাছে আর জীবিত থাকবেন না, হয় জানোয়ার না হয় মৃত বলে মনে করবো—আসুন।

ও চিণ্ময়ের হাত ধরে টান দিয়ে নিয়ে চললো এগিয়ে একেবারে সিনেমায়। তারপর টাকা দিয়ে টিকিট করে ভেতরে ঢুকলো চিণ্ময়কে নিয়ে। দুপুরের শো, চিণ্ময় হতভম্ভ হয়ে খানিক বসে থেকে শুধুলো,—রেষ্টোরায় আর এখানে তো টাকাতিনেক খরচ হয়ে গেল।

—যাকগে—আমাদের নতুন বন্ধুত্ব একটু সম্মানিত হোক। এখন থেকে তোমায় আর 'আপনি' বলছি না আমি।

—কি বলবে, মিতা?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারি—তবে 'তুমি' বলবো—সেইটাই জানাচ্ছি।

—আমি তো আগেই সেটা বলতে আরম্ভ করে দিয়েছি।

—অন্যায় করেছিলে, এখন বলার অধিকার হোল তোমার।

—তোমার স্থায়-অন্যায় বিচারের ছুরিখানা যে-রকম ধারালো দূর্বা, কে জানে হয়তো এই মিত্রতাবন্ধন অবিলম্বে কেটে যাবে।

—যখন যায়, যাবে—ভাববে, অযোগ্যের সঙ্গে মিত্রতা করেছিলে।

—যোগ্যতায় আমিই ছোট।—চিন্ময় বলল।

—ছোট বড়র কথা তো হচ্ছে না এখানে—মিত্র বলে মেনে নিলে আর ছোট বড় রইল কোথায় ? তোমার ছোটত্ব আমার বড়ত্ব দিয়ে আমি পূরণ করবো, আমার বড়ত্ব তোমার ছোটত্ব দিয়ে তুমি খাটো করবে, দেখো, দুজনেই সমান হয়ে যাব—আমি মেয়ে, তুমি পুরুষ, কিন্তু আমরা দুজনেই মানুষ ; মনুষ্যত্বের সাধনায় কেউ যেন ছোট না হই।

এরকম অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে কথা বলা অত্যন্ত বিপজ্জনক ভেবে চিন্ময় আর কিছু বলতে সাহস করল না। হিন্দি একখানা বই চলছে পর্দায়—হাসি-হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে দর্শকগণ, আর এক কোণায় নিতান্ত কমদামী সীটে বসে দূর্বা আর চিন্ময়ের মিত্রতাবন্ধন দীর্ঘস্থায়ী হোক বলে ওরা প্রার্থনা জানাল।

পুরুষের মনের পঙ্কিল কামনা হয়তো এই কয়েক মুহূর্তের জন্য চিন্ময়কে ত্যাগ করেছে—অতিশয় সহজ কণ্ঠে সে বলল বেরুবার সময়,

—তোমার আমার তহবিলটাও তাহলে একত্র করে নেওয়া উচিৎ, নাও।

—অতি অবশ্য উচিৎ—বলে চিন্ময়ের প্রসারিত হাত থেকে টাকাকয়টা নিয়ে নিজের ব্যাগটায় ভরে ফেললো দূর্বা, তারপর শুধোলো—সিগারেট ক' প্যাকেট লাগে তোমার রোজ ? এসো, কিনে দিই।

পয়সা কোথায় ?

—ও, কিন্তু সিগারেট খাচ্ছিলে যে সিনেমায় ?

—নতুন বন্ধুত্বের সম্বর্দ্ধনা করছিলুম—হাসলো চিন্ময়।

—মানে, আমায় দেখাবার জন্য আজই মাত্র এক প্যাকেট কিনেছ? এ রকম আর করো না, বুঝলে! তুমি যে কত গরীব তা আমি বুঝে ফেলেছি।

—হুঁ!—চিন্ময় চুপকরে চেয়ে রয়েছে।

—এসো, আজ বন্ধুত্বকে সম্বর্দ্ধনাই জানানো হোক—বলে এক প্যাকেট ক্যাপস্টেন আর একটা দেশালাই কিনে দূর্ব্বা ওর পকেট ভরে দিল—বলল, —চল, এবার বাড়ী যেতে হবে।

—একেবারে ক্যাপস্টেন! কাঁচি হলেও চলতো।

—না—দূর্ব্বা ধমক দিল—যখন ভোগ করবে, ভাল করে করবে—যতটা তোমার সামর্থ্য—কাল তো আবার বিড়িই টানতে হবে।

পথ চলতে লাগলো দুজনে। খানিকটা এসে চিন্ময় বলল—আমার সম্বন্ধে কিছুই তোমার জানা নেই দূর্ব্বা, আমি চোর না ডাকাত, না লম্পট, না সাধু, কিছু না জেনেই মিত্র করে বসলে?

—তোমার সব দেখে-শুনে-জেনে, ভেবে-চিন্তে ক্যালকুলেশ্যন করে মিত্রতা করতে হবে? তুমি তাই করো বুঝি? না চিণ্ময় দা, তোমার মনটা সত্যি বড্ড ছোট—আধ মিনিট থেমে রইল দূর্ব্বা, তারপর বলল—তোমার মাথায় একটা ছোট ঝরণা আছে, খুব ছোট, যা দিয়ে নাটক লেখার কালি জোটে, আমি ওটাকে বড় করে নেব—মহাকাব্য লিখতে পারবে—লিখতে পারবে উদারহৃদয় দধীচির চরিত্র, দাতাশ্রেষ্ঠ কর্ণের চরিত্র, সর্ব্বস্বত্যাগী ভীষ্মের চরিত্র; আরো বড় চরিত্র আঁকবে তখন—করুণাবতার বুদ্ধ, প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ, কৃপাবতার রামকৃষ্ণকে······

বাড়ীর দরজায় এসে পড়েছে ওরা, কিন্তু দূর্ব্বা তখনো বলছে—পয়সার জন্য সিনেমার গল্প লিখতে হয়, লেখ—কিন্তু সেই গল্পবস্তুটাও যেন খাঁটি হয়, বাজারের দুপয়সার বিস্কুট না হয়ে মুড়ি-চিড়ে-ছোলাভাজা হয়······হোক সে গল্প সস্তা, স্বাস্থ্য তাতে খারাপ হবার আশঙ্কা কম।······

উত্তর কলিকাতা টালিগঞ্জ থেকে মোটরে হলেও অনেকখানা সময় যায় পৌছাতে। বরুণের গাড়ী এসে পৌছাল সাড়ে ছটার সময়। দূর্ব্বা তখন সন্ধ্যা দীপ জেলে শাঁখবাজানর আয়োজন করছে। এ সময় কে এল বুঝতে না পেরে ও ভাঙ্গা জানালাটা দিয়ে বাইরে তাকালো—মোটরখানা দেখা যাচ্ছে। নতুন ঝকঝকে গাড়ী—দূর্ব্বা বুঝতে পারল কোন সিনেমা কোম্পানীর লোক নিশ্চয়। কিন্তু যে কাপড় ওর অঙ্গে তা নিয়ে কোনো ভদ্রলোকের কাছে বেরোনো চলে না—আসছি, বলে তাড়াতাড়ি ভাল শাড়ীখানা পরতে গিয়ে দেখে, এখনো শুকোয় নি। আর একখানা শাড়ী অবশ্য আছে। কিন্তু সেটা বড্ড বেশী ভাল, অর্থাৎ দামী কাপড়। ঘরের মধ্যে অত দামী কাপড় কেউ নিশ্চয় পরে থাকে না—ওরা বুঝবে যে দূর্ব্বা সেজে এল। দূরছাই!—দূর্ব্বা ঐ ছেঁড়া কাপড়খানাতেই বাইরের দরজায় এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বলল—আসুন। ভেতরে আসুন সব।

ঠাকুর দা যে-ঘরখানায় থাকেন তার ঠিক উলটা দিকের ঘরটা এক দিন বসবার ঘর ছিল। দীনতা যেন আজ ওঘরে মূর্ত্তি ধরে বিরাজ করছে কিন্তু তবুও সেকালের কয়েকখানা চেয়ার আর একটা টেবিল আছে ওখানে—জিনিষগুলো এককালে মূল্যবান ছিল, দেখলেই বোঝা যায়; দীর্ঘদিনের অযত্নে ওরা ধূলিমলিন হয়ে আছে। আঁচল দিয়ে তিনখানা চেয়ার আর টেবিলটা ঝেড়ে দূর্ব্বা বলল,—বসুন! অকস্মাৎ গরীবের বাড়ী পদধূলি কেন, জানতে পারি?

—আপনার সর্ত মেনে নিতেই রাজি আমরা—বরুণ বলল—অন্য আর কোন কারণ নয়—আপনার স্বচ্ছন্দ কথা আর সাবলীল ভাব আমাদের নায়িকার পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত। আর যখন ব্যবসা করতেই বসেছি, তখন জিনিষটা যাতে ভাল হয়, তাই করতে হবে।

—অনেক ধন্যবাদ—কিন্তু—দূর্ব্বা থামলো একটু, তারপর বলল, বেশ সহজ সুরেই—আমার আরেকটা সর্ত বেড়েছে, অনুমতি করেন তো বলি—সে সর্তটিও মেনে নিলে আমার দিক থেকে আপত্তি হবে না আর।

—বেশ, বলুন, কি আপনার সর্ত—বরুণই কথা বলছে।

—আপনাদের বই এখনো ঠিক হয় নি—কেমন ?

—না—তবে কাটুবাবুর বইটাই আমরা নেব, একরকম ঠিক আছে।

—বেশ। কাটুবাবুর বইএর সামান্য অংশ আমায় সেদিন শুনিয়েছিলেন, ওর ভালমন্দ আমি কিছু বলতে চাইনে, তবে আমার নূতন সর্ত হচ্ছে, আমার একটি আত্মীয় আছেন, যাকে সেদিন আপনারা দেখেছেন।

—ও, সেই লেখকটি, যার সঙ্গে বৃষ্টির মধ্যে আপনি হাঁটছিলেন ?

—হ্যাঁ—আমার সর্ত হচ্ছে, তিনি আমায় নিয়ে যাবেন এবং নিয়ে আসবেন—মানে, সব সময়ই তিনি আমার সঙ্গে থাকবেন—কাজেই তাঁকেও একটা কাজে, যেমন ধরুন ডাইলগ বা সিনারিও লেখার জন্য নিযুক্ত করতে হবে।

—আপনি আমাদের এতোটা অবিশ্বাস করছেন কেন, বলুন তো ?

—বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না, আমাদের প্রয়োজন, তাঁর এবং আমার।

—ওঁর বইটা আমরা ভাল করে সেদিন শুনিনি—ডিরেক্টর বলল।

—ইচ্ছে করেন তো শুনিয়ে দিতে পারি – ।

—তিনি কোথায় ?

—তিনি টুইসনী করেন—সেখানেই আছেন।

—আচ্ছা, আপনার এ সর্তও আমরা মেনে নিলাম—আর আপনার লেখক বন্ধুটিকেও—সম্পর্কে কে হন আপনার ? দাদা—না আর কেউ ?

—সেটাতো জানবার কোন প্রয়োজন নেই আপনাদের।

—ওহো, মাফ চাইছি—বলে বরুণ চুপ করে গেল। মুখের ওপর এমন জবাব ও দেবে, আশা করেনি বরুণ। সোনার বোতামের মাথায় হীরেগুলো ঝকমক করছে। কিন্তু মুখখানা অত্যন্ত মলিন। বড়লোকের ছেলে, দেখতেও সুন্দর, লেখাপড়াও মন্দ জানে না, তারপর ঐ নাকি হিরোর পার্ট করবে—তাকে এমন জবাব দিতে পারে কোন মেয়ে, ও জানতো না। কিন্তু ওর অহঙ্কার ভাঙতে হবে—ভাঙতেই হবে। বরুণের ঠোঁট দাঁতের চাপে লাল হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা দেখলো সে মুখ। মৃদু হেসে বলল,

—যতটুকু আপনাদের সঙ্গে আমার প্রয়োজন, তার বেশি অনুগ্রহ করে কেউ এগুবেন না—এই অনুরোধ জানাচ্ছি—একটু থেমে বলল, এ লাইনটা সম্বন্ধে বিস্তর বদনাম শোনা সত্ত্বেও আমি যোগ দিতে চাইছি—প্রয়োজনের তাগিদে নিশ্চয়। কিন্তু আরো কিছু আছে ওর সঙ্গে!

—কি? বরুণ মুখ তুলে বলল এতক্ষণে—নাচগান অভিনয়ের দিকে আপনার স্বাভাবিক আকর্ষণ?

—তাছাড়াও অন্য কারণ রয়েছে—কিন্তু সেটা আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক, এমন কি আধ্যাত্মিক বলতে পারেন! প্রলোভনের মধ্যে আমি পরম পদে যেতে চাই! কথাটা সিনেমা-জগতের পক্ষে একটু দুরূহ হোল—নয় কি?—হাসছে দূর্ব্বা! কি চমৎকার হাসি ওর! বরুণ নির্নিমেষ চোখে চেয়ে দেখলো ওকে। এতো গরীবের ঘরে এ রকম মেয়ে কেমন করে জন্মায়! কিন্তু না জন্মালে বরুণের দল মেয়ে পাবে কোথায়? ভগবানের অসীম করুণা। ভগবান! কথাটা মনে হতেই বরুণ হাসলো।

—আপনার বন্ধুটির বইখানা আমরা আর একবার দেখতে পারি—ওটাকে কাটছাঁট করে নেওয়া যেতে পারে—বইটা কি আপনার কাছে আছে?

— না—বলেন তো কাল ওঁকে নিয়ে আমি যেতে পারি বা আপনারাও অনুগ্রহ করে আসতে পারেন এখানে—যেটা আপনাদের সুবিধা হয়।

— গল্পটা ভালই লেগেছিল আমার—কাটুবাবু বলল এবার—তবে সিনেমার গল্পের টেকনিক আলাদা। যাই হোক, কাল তা হলে আপনি আসুন ওঁকে নিয়ে! কখন আসতে পারবেন?

—আপনাদের সুবিধামত সময় দিন—দুপুর বেলা হলে আমাদের ভাল হয়—সন্ধ্যার আগেই আমারা ফিরে আসবো।

—বেশ—বেলা একটা থেকে চারটা পর্য্যন্ত হলেই হয়ে যাবে। আমরাও ওখানে এসে জুটবো সবাই।

—বেশ—বলে দূর্ব্বা বলল—আপনারা দয়া করে একটু বসলে আমি সন্ধ্যাপ্রদীপটা জেলে আপনাদের একটু চা খাওয়াতে পারি।

—বেশ—ভালই তো—যান, আপনি সেরে আসুন, আমরা বসছি।

দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল। এতক্ষণে ঘরখানার দিকে ওদের নজর পড়লো। ধূলিমলিন ইলেকট্রিক বাল্বটার ভেতর দিয়ে যে লালচে আলো আসছে, তাতেই বড় ঘরখানা দেখা যায়—যেন রহস্যময় রাজপুরী—পরিত্যক্ত, প্রত্নতত্ত্বের গবেষণার বস্তু। তিনটে আলমারী ওদিককার ময়লা দেওয়ালে; বইএ ঠাসা একেবারে—একটা বেতের ইজিচেয়ার, মাঝের বেত ছিঁড়ে গেছে। হাঙ্গরমুখ হাতলওয়ালা একখানা বড় চেয়ার, মিশ কালো—হয়তো আবলুষ কাঠের। চমৎকার কারুকার্য্য তাতে। একটা প্রকাণ্ড সাপের মাথায় হুঁকো,-হুঁকোটা বাঁধানো—সাপটা অত্যন্ত ময়লা হয়ে গেছে। ব্রোঞ্জের কয়েকটা মূর্ত্তি, নটরাজ, ধ্যানী বুদ্ধ, নীলতারা ইত্যাদি। এ সব দেখে বেশ বোঝা যায়, একদিন এই ঘর সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ ছিল। পেতলের একখানা পুষ্পপাত্র রয়েছে একধারে—তার গায়ের কারুকার্য্য দেখে যেকোন মানুষ মুগ্ধ হবে। কাটুবাবু সেইটা তুলে আলোর কাছে

ধরে ভাল করে দেখতে লাগল। জিনিষটা অত্যন্ত প্রাচীন, দুতিন জায়গায় টোল খেয়েছে, ময়লা হয়ে রয়েছে, তবু ওর সৌন্দর্য্য যেন অপরিম্লান। কাটুবাবু ডিরেক্টার এবং এডিটার হিসাবে নামকরা লোক। রসবোধ তার আছে। জিনিষটা দেখতে দেখতে প্রশংসার সুরে বলে উঠল,

—এটাকে কাজে লাগাতে হবে আমাদের—এর জন্যে একটা সিচুয়েশুন তৈরী করতে হবে ড্রামাতে—চমৎকার জিনিষটা।

—ঐ বড় চেয়ারখানাও চমৎকার—ঐ হাঙ্গরমুখো হাতলওয়ালাটা।

—ওটা রাজাবাদশার চেয়ার—এখানা সাধারণ পূজায় লাগানো যেতে পারে।

—কিন্তু পূজার কোন দৃশ্য তো তোমার নাটকে নেই!—বরুণ হেসে বললো।

—আমার নয়, ঐ ছোকরার নাটকটাই নিতে হবে। নাটকের গোড়াতেই একটা পূজার দৃশ্য আছে, আমি শুনেছি। নতুন লেখক, টাকাকড়ি বিশেষ কিছু চাইবে না।

—সে অবশ্য সত্যি কথা—তবে ওর সঙ্গে আবার আত্মীয়তা যে দুর্ব্বার।

—তা হোক,—কাটুবাবু দৃঢ়কণ্ঠে বলল—আমার নাটক, আমার ডাইরেকশুন, আমারই এডিটিং—এগুলো আমার ভাল লাগছে না।

—ব্যাপার কি, হঠাৎ "আমি" এবং "আমার" ওপর এতখানা বীতরাগ? বরুণের প্রশ্নটা সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে গিয়ে কাটুবাবু বলল,

—থামো, কে একজন এলেন—সটান ঘরে ঢুকে গেলেন যে?

—তা হলে সেই লেখক বন্ধুটিই হবে।

—না—সে রোগা, লম্বা। এ লোকটা মোটাসোটা আর বয়সও বেশী।

—হবে কেউ ওদেরই—বলে বরুণ কথাটা কাটিয়ে দিতে চাইছে। হঠাৎ গলার আওয়াজ ভেসে এল ওঘর থেকে। আগন্তুক বলছে,

—আমি তোমায় স্নেহ করি বলেই জুতোর টাকা দেবার কথা বলেছিলাম ; ওভাবে দোকানীর সামনে আমার অপমান নাই করতে

—ওভাবে আপনিই বা কেন যেখানে সেখানে যার তার কাছে আমায় টাকা দিতে চান ? আমরা গরীব হতে পারি, ভিক্ষা করি নে এখনো—যখন করবো, তখন ভিখিরির যা প্রাপ্য, একমুঠি চাল বা একটা পয়সা দেবেন, যদি যাই আপনার দরজায়।

—তুমি আমার ওপর অনর্থক রেগে আছ দূর্ব্বা,

—আপনার ওপর রাগ করবার আগে যেন আমার মরণ হয়।

—ওকি কথা ?

—হ্যাঁ ; কে আপনি যে আপনার ওপর রাগ করতে যাব ? বাড়ীটা নীলাম করেছেন—ভাড়ায় থাকি—পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী আছে, যদি দিতে না পারি, চলে যাব অন্যত্র, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কোন কারণ আমার নেই। সরুন রাস্তা থেকে। ওঘরে আমার বন্ধুরা রয়েছেন—দূর্ব্বা একটা থালায় বসিয়ে চা আর চিড়ে ভাজা নিয়ে এল ; কিন্তু পিছনে এল সেই লোকটিও। বেশ নধর কান্তি গড়ন, গোঁফজোড়া পাকান—বয়স আন্দাজ ছত্রিশ হবে—একটু বেঁটে মত—তবে মুখশ্রী ভালই। সকলকে নমস্কার জানিয়ে ঘরে ঢুকে অন্য একখানা চেয়ার নিয়েই রুমাল দিয়ে ঝেড়ে বসল। বলল—চা আমাকেও এক কাপ দাও—চাইছি।

— বসুন—এনে দিচ্ছি। বলেই দূর্ব্বা ওদের চা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

—আপনারা কি সিনেমার লোক ? কি কোম্পানি আপনাদের ?

—আমরা লিমিটেড কোম্পানি করেছি – নাম এখনো ঠিক হয়নি, মানে পাকাপাকি ঠিক করিনি।

—ও—কি বই হচ্ছে ?

—পরে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখতে পাবেন,—এখন ওসব কিছু বলতে চাইনে আমরা—বরুণকে থামিয়ে দিয়ে এবার কাটুবাবু বলল।

—দূর্ব্বাকে বুঝি নায়িকা করবেন ?

—দেখা যাক—কোনটায় তিনি ঠিকমত মানান।

—ও তো নায়িকা হবার যোগ্যই মেয়ে ।

—হতে পারে—কিন্তু আমরা কারো মত নিয়ে তো কিছু করি না।

—ও হ্যাঁ—নিশ্চয়, নিশ্চয়—সিনেমায় নামলে মেয়েরা কি ভদ্র থাকে ?

লোকটার অকারণ এ সব প্রশ্ন বরুণকে অতিষ্ঠ করে তুলছে, কিন্তু কাটুবাবু স্থির হয়েই জবাব দিল—ভদ্র থাকা বা অভদ্র হওয়া তার নিজের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু আপনি এ সব কেন জানতে চাইছেন ?. কি অধিকার আপনার ?

—অধিকার আছে বৈকি, সেটা আপনারাই বা জানতে চাইছেন কোন্ অধিকারে ?

—আমাদের জানবার কোনও দরকার নেই, আপনার কথার জবাবও দিতে চাই না আমরা—কে ভদ্র থাকে, কে অভদ্র হয়, এ কি প্রশ্ন নাকি ভদ্রলোকের—আশ্চর্য্য !—কথাগুলো বরুণ বলল এবার সরোষে। ওদিকে আর একবাটি চা আর চিড়ে নিয়ে দূর্ব্বা এসে পৌঁছেছে দরজায়—বরুণ থেমে যেতেই সে শুধুলো,

—ভদ্র অভদ্রের কি প্রশ্ন ?

—এই ইনি বলছিলেন—যাক—বলে কাটুবাবু থামিয়ে দিল।

অতঃপর ঘরের আকাশটা কেমন যেন থমথমে, কেউ আর বিশেষ কোন কথা বললো না—চা খাওয়া হলে বরুণ সর্ব্বাগ্রে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—তা হলে কাল বেলা একটার সময় আসছেন আপনারা—আমরা তৈরী থাকবো নাটকটা শুনতে—পছন্দ হলে ওটাই নেওয়া হবে—আচ্ছা, আসি।

—নমস্কার আপনার সব সর্তই মেনে নিলাম আমরা। ঐ লেখক বন্ধুটিকে নিয়ে আপনি নিশ্চয় আসবেন কাল - বলে কাটুবাবুও নমস্কার জানালো এবং ওরা বাইরে এল। দূর্ব্বাও এল একটু সদর দরজা পর্য্যন্ত। ওরা গাড়ীতে ওঠবায় আগে বরুণ বলল—লোকটা কত টাকা পাবে আপনার কাছে ?

—অনেক টাকা, শপাঁচেকেরও বেশী—

—কালই কনট্রাক্ট করে আমি টাকা দিয়ে দেব আপনাকে, ওর টাকাগুলো ফেলে দেবেন, নমস্কার।

—ধন্যবাদ, নমস্কার !—দূর্ব্বা বাড়ীর ভেতর ঢুকলো।

বাড়ীওয়ালা বাবুটি তখনো বসে চা খাচ্ছে, দূর্ব্বা একচোখ দেখে নিয়ে চলে গেল ভেতরে। তার ক মিনিট পরে সেও ভেতরে ঢুকে দাদুর কাছে বসল গিয়ে ; বলল,—কাজটা কি ভাল হচ্ছে দাদু ?

—কি কাজ ?—দাদু সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

—এই দূর্ব্বা যাবে সিনেমায় অভিনয় করতে ?

—আমি তো তার স্বাধীনতায় কখনো হাত দিইনি, গোবিন্দ ! আত্মমর্য্যাদা বজায় রেখে জীবনের পথে চলবার শিক্ষা তাকে দিয়েছি ; এবার সে বড় হয়েছে—তার যেমন ইচ্ছে, করবে—আমি বলিনি, বাধাও দেব না।

—আপনার বংশধর—আপনার নাতনী—আপনার এতকালের বংশগৌরব !

—কাল সব-কিছুকে ধ্বংস করে গোবিন্দ—মর্য্যাদার কোন অর্থ আজ আমার কাছে নেই। আর আমি জানি, আ ম কত ক্ষতি ওর করেছি।

—ওর আপনি বিয়ে দিন—পাত্রের অভাব হবেনা। বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ—অসবর্ণও চলছে আজকাল—আমার কথা শুনুন দাদু—আপনার ভালর জন্যই বলছি।

—কিন্তু ও যদি রাজি না হয় ?

—ওকে রাজি করান আপনি।

—না গোবিন্দ, আমি ওর স্বাধীনতায় কোনদিন হস্তক্ষেপ করিনি, আজও করবো না। সিনেমায় যোগ দেবে, দিক—এ যুগ সিনেমার যুগ—কঠোর কলি যুগ এসেছে আজ। একে বাধা দিতে যাওয়া মুর্খামী। সতীত্বতো তুচ্ছ কথা, মনুষ্যত্বকেও আজ মানুষ মানছে না।

—সিনেমায় ঢুকলে অমন সুন্দর মেয়েটা খারাপ হয়ে যাবে—

—খারাপ যে হবার সে এমনিই হয় গোবিন্দ, সিনেমায় না গেলেও হয়। কিন্তু থাক সে কথা—তোমার টাকাটা এ-মাসেও দিতে পারছি না।

—থাক-থাক, টাকার কথাতো বলছি না আমি। ওকে আপনি সিনেমা থেকে ফেরান—আমি ওকে বিয়ে করে ঘরে তুলতে চাইছি।

দাদু প্রায় তিন চার মিনিট কোন কথাই বলতে পারলেন না—কি যেন চিন্তা করতে লাগলেন। গোবিন্দর মুখ আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে এবার। গোবিন্দ ভাবছে, তার প্রার্থনা বিশেষরকম আনন্দের সাড়া তুলেছে বৃদ্ধের বুকে—এ ছাড়া উপায় কি আর! কেউ কোথাও যার নেই, সে আর করবে কি? অনেক ভেবে চিন্তেই প্রস্তাবটা আজ করেছে গোবিন্দ।

গোবিন্দর কিছু পরিচয় আবশ্যক। বছর পঞ্চাশ আগে ওর ঠাকুরদা কলকাতার কোন অজ্ঞাত পল্লীতে চিড়ে-মুড়ির দোকান করতো, তার সঙ্গে নিষিদ্ধ নেশা ভাঙও। জাতে ওরা কি, তা ভাল জানা নেই। তবে দেখা যেত, কোনও উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে গঙ্গা স্নান করে ফিরতে দেখলে গোবিন্দর ঠাকুরদ্দা ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করতো, আর সাহেব দেখলেই বলতো, —গুড মর্ণি হুজুর, মেজাজ ঠিক হ্যায়? মানিকতলা অঞ্চলে খানিকটা জমি কিনে কয়েকখানা বাড়ী তৈরী করে গোবিন্দর বাবাকে উত্তরাধিকারী রেখে সে স্বর্গে যায়। অতঃপর গোবিন্দর বাবা নিজকে কায়স্থ বলে পরিচয় দিয়ে জাতে উঠে এল—এবং চালের আড়ৎ আর লোহার কারবার

খুললো। সে-ই টাকা ধার দিয়েছিল দাদুকে। ভালরকম ধনসম্পত্তি এবং গোবিন্দর মতন সুপুত্রকে রেখে সেও দেহরক্ষা করেছে বছর পাঁচেক হোল। এখন গোবিন্দই মালিক। লেখা পড়া গোবিন্দ মন্দ করেনি, তখনকার দিনের থার্ড ক্লাস পর্য্যন্ত পড়েছিল, তবে প্রতি ক্লাসে দুতিন বছর থেকে পাকা হওয়ার দরুণ থার্ড ক্লাসেই বয়স কুড়ি পার হয়ে গেল। বাবা ওকে স্কুল ছাড়িয়ে বিয়ে দিল, এবং কাজে ঢুকিয়ে নিল। গোবিন্দর সেই পত্নী পরপর তিনটি কন্যা প্রসব করার পর চতুর্থবার প্রসব করতে গিয়ে গতাসু হয়েছে বছর তিন হোল। গোবিন্দর বড় মেয়ের বয়স পনর—সেই সংসার দেখে। বিয়ের সম্বন্ধ অনেক যায়গা থেকেই এসেছে, কিন্তু গোবিন্দ গা করেনি—কিন্তু এখন আর চলছে না।

পনর বছরের মেয়ে, বিয়ে দিলেই শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে এবং সংসার দেখবার লোক থাকবে না—গোবিন্দর দ্বিতীয় বিবাহেচ্ছার এটা কিন্তু কারণ নয়; সত্যি কারণটা হচ্ছে, দূর্ব্বাকে যেভাবে আয়ত্ত করতে পারলে গোবিন্দর আশা পূর্ণ হোত, সেভাবে তাকে পাবার কোনও সম্ভাবনা না দেখে আজ মরিয়া হয়ে বিবাহের প্রস্তাব করে বসলো গোবিন্দ। প্রস্তাব সে করতে পারলো, দূর্ব্বা সিনেমায় অভিনয় করতে যাচ্ছে শুনে—অন্যথায় এ প্রস্তাব করার সামর্থ্য হোত না তার। কারণ গোবিন্দর ঠাকুরদার আমলের মুড়ি-চিড়ের দোকান থেকে এ পর্য্যন্ত সব ইতিহাস এই বৃদ্ধ জানেন—গোবিন্দর বিদ্যা, চরিত্র ইত্যাদি কিছুই অজানা নেই তাঁর।

চোখ বুঁজে তিনি ভাবছিলেন—সেই চিড়েমুড়ির দোকানদারের নাতি আজ পঞ্চতীর্থোপাধিধারী বিপ্রদাস চৌধুরীর একমাত্র নাতনীকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করছে! সবই ভাগ্যের পরিহাস। কিন্তু ভাগ্যটাকে উনি শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছা বলেই মেনে নিয়েছেন। নইলে এই দুঃসহ দুঃখ সইবার শক্তি তাঁর অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত। কিন্তু ভাবতে লাগলেন,

তাঁর জীবনের মেয়াদ আর বেশী দিন নাই—শ্রীগুরুদেব যে-কোনো মুহূর্ত্তে ডাক দিতে পারেন। ত্রিশটে মাত্র টাকা বৃত্তি পান তিনি সরকার থেকে, যুদ্ধ-পূর্ব্বে ওতে ভালই চলে যেত—এখন অর্দ্ধাশনও হয়না। তিনি দেহ রাখলে, সে বৃত্তিও বন্ধ হয়ে যাবে—এবং এই বিশ্বসংসারে এমন কোনও জীবিত মানুষ নেই যে দূর্ব্বাকে দেখবে। গোবিন্দর প্রস্তাবটা কি গ্রহণ করা উচিৎ নয় তাঁর—কিন্তু তিনি যন্ত্র, শ্রীগুরুদেব যন্ত্রী—দূর্ব্বা সম্বন্ধে আর কিছু করতে তিনি যেন নিষেধই করছেন বৃদ্ধকে। ধীরে চোখ খুলে বললেন,

—বিধবা-বিবাহ আমি অসমর্থন করিনে গোবিন্দ, আর বর্ত্তমান জাতিতত্ত্বেও আমি শ্রদ্ধাবান নই—কারণ এ জাতিতত্ত্ব গুণগত নয়—সমাজগত। কিন্তু, একটু থেমে বললেন—মেয়েটা নামে দূর্ব্বা হলেও কাজে দুর্ব্বল নয়……

—সিনেমা লাইনে গেলে মেয়েটা মাটি হয়ে যাবে, তার থেকে আমায় দিন, আমি যত্নে রাখবো—সাহস পেয়ে আরও কয়েকটা কথা বলল গোবিন্দ—ওখানে কি ভদ্দরলোকের মেয়ে যায়—ছিঃ!

—থামো গোবিন্দ, ভদ্র অভদ্র বা ভালমন্দর তফাৎ আমরা করতে জানিনা, কিসে কার ভাল হবে, কারও জানা নেই—ক্ষুধিত ব্যাধ যে পশুটিকে হত্যা করে, তার মাংসে সে পরিবার প্রতিপালন করে, কিন্তু পশুটির হয় মৃত্যু ; পশুর দিক থেকে বিচার করলে সেই হত্যা অসমর্থনীয়।

গোবিন্দ ভড়কে গেল। বৃদ্ধের কাছে কঠোর দর্শনশাস্ত্র সে শুনতে আসেনি—এসেছে নিজের কাজ হাসিল করতে। বলল,

—দেখুন—আপনি আর কদিন! তারপর মেয়েটার কি গতি হবে, ভেবে দেখেছেন? আর আপনার যখন বিধবা বিবাহে বা অসবর্ণ বিবাহে আপত্তি নেই, তখন আর তো কিছু বাধা দেখিনে! আপনার এই বাড়ী আর আমার আরও তিনখানা বাড়ী আমি ওর নামে লিখে দিচ্ছি—যার আয় মাসে অন্ততঃ হাজার টাকা হবে। আর জানেন তো, কলকাতা সহরে

কোথায় কে কাকে বিয়ে করল, ক'বার করলো, কেউ খোঁজ রাখে না— আপনি অনুমতি দিন, আমি আয়োজন করি।

—অনুমতি আমার দেবার আর অধিকার নেই গোবিন্দ, ওর আট বছর বয়সে সে অধিকার আমার ছিল। এখন ও সাবালিকা—অনুমতি যদি দিতে হয়, সেই দেবে। কিন্তু তোমাকে একটা প্রশ্ন আছে আমার।

—বলুন।

—এতদিন তুমি যে-চোখে ওকে দেখে এসেছ, আমি জানি—তোমার মত চরিত্রের মানুষের পক্ষে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়—কিন্তু আজ যে প্রস্তাব তুমি করলে, সেটা অন্য রকম। এর হেতু কি গোবিন্দ? বিয়ে যদি তুমি করতে চাও, তোমাদের সমাজে পাত্রীর অভাব নেই···।

গোবিন্দ একটুখানি চুপ করে রইল—জবাবটা দিতে ওকে ভাবতে হচ্ছে—আজন্ম সত্যসন্ধ এই বৃদ্ধের কাছে যা-তা বলা চলে না। ভেবে বলল—ওকে সত্যিই আমি ভালবাসি···

—হাঃ হাঃ হাঃ! হেসে উঠলেন বৃদ্ধ—এ ভালবাসা সৃষ্টিধর্ম্মী গোবিন্দ—বদ্ধজীবের বন্ধন দৃঢ় হবার রজ্জু—যাক—তোমায় আর একটা প্রশ্ন করছি, কিছু মনে করো না—দূর্ব্বা শুধু সুন্দরী নয়, তার মনের গতিও দুর্ব্বার—তাকে তুমি সইতে পারবে? সামলাতে পারবে?

—বিয়ে হলেই মেয়েরা বৌ হয়ে ঘরে ঢোকে, তারপর সংসার আর ছেলেমেয়ে নিয়ে সব ভুলে যায় ওসব আপনি ভাববেন না।

—দূর্ব্বা সম্বন্ধে কথাটা সত্যি নয় গোবিন্দ! দেহের ক্ষুধার চাইতে তার মনের ক্ষুধা অনেক বেশী—সে তুমি মেটাতে পারবে না।

—দেখুন, পেটে ভাত আর পরনে কাপড় মানুষের আগে দরকার—গোবিন্দ যেন কিছুটা উত্তেজিত হয়েই বলে চলল—ওসব খিদেটিদের কথা পরে—গয়নাগাঁঠি, শাড়ীকাপড়, তেল-চিরুণী-সাবান পেলে যে-কোন

মেয়ে দু'দিনে বশ হয়ে যায়—তখন বিস্তে থাকে শিকেয় তোলা। কত বি-এ, এম-এ পাশ দেখলাম—হ্যাঃ!

—বি-এ, এম-এ পাশই দেখেছ গোবিন্দ, বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ দেখনি—যে মেঘ থেকে বর্ষার ধারা নামে, আবার বজ্রও পাত হয়—যাক—তোমার প্রস্তাব আমি দূর্ব্বার কাছে পৌঁছে দেব—জবাব সেই দেবে।

—বেশ, তাই করবেন, আমি এসে জেনে যাব—বলে উঠবে গোবিন্দ, কিন্তু আরেকটা প্রশ্ন না করে সে যেতে পারে না। উঠতে উঠতে বলল, —সেদিন একটা ছোক্‌রাকে দেখলাম ওর সঙ্গে দোকানে; কে সে? আপনার আত্মীয় কেউ তো নেই······

—হবে কেউ—বাইরে যখন বেরোয় তখন বন্ধু তো জুটতে পারে!

—ঐ ছেলেটাই হয়তো সিনেমায় যাবার মতলব দিয়েছে ওর মাথায়! ওসব ছোকরার সঙ্গে মিশতে দিচ্ছেন কেন ওকে? ওতে কি চরিত্র ভাল থাকে?

—আমি ওর স্বাধীনতায় কখনো হস্তক্ষেপ করিনে গোবিন্দ, একথা তোমায় আগেই বলেছি। আর তোমার এই কথাটার মধ্যে ওকে বন্দী করবার যে অভিলাষ রয়েছে, সেটা ওকে ভালবাসার লক্ষণ নয়, ওকে নির্য্যাতন করবারই বুদ্ধি—তবু আমি বলেছি, তোমার প্রস্তাব আমি তাঁর কাছে পৌঁছে দেব—

—আচ্ছা, সে রাজী হলে আমি নিজেই তখন দেখে নেব।

—আচ্ছা! বলে হাসলেন বৃদ্ধ করুণ। গোবিন্দ প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।

বরুণ বসে বসে চিন্তা করছে প্রকাণ্ড একখানা সোফায়। ওর প্রাসাদ ইন্দ্রালয় বললে অত্যুক্তি হয় না। অনেক পুরুষ ধরে ওরা ধনী, তাই প্রাচীন পরিবারের ঐতিহ্য ওদের বাড়ীতে কম নেই। কিন্তু গত সন্ধ্যায়

দূর্ব্বাদের বাড়ীর জিনিষগুলো দেখে ও বুঝতে পেরেছে—দূর্ব্বার জন্ম এমন একটা পরিবারে, যার সংস্কৃতি সুপ্রাচীন এবং ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্ম—সত্য, সনাতন ধর্ম্ম। ইংরাজ আসার পর ইউরোপীয় সভ্যতার খর প্রবাহে ওদের নিজস্ব স্বত্বা ভেসে যায় নি, সে যেমন দৃঢ়মূলে ছিল, আজও তেমনি আছে; এমন কি, এত দুঃখ দৈন্যের মধ্যেও আছে।

ওদের বাড়ীতে আর কে আছে, জানে না বরুণ। হয়তো দূর্ব্বার মা বাপ, ছোটভাই—কিম্বা ছোটবোন, কিন্তু কাউকেই তো দেখতে পাওয়া গেল না। জিজ্ঞাসা করলেই হোত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে কোথায় যেন বেধেছিল ওদের। আজ বরুণ প্রশ্ন করে জেনে নেবে।

কিন্তু কেন? দূর্ব্বা আসছে অভিনেত্রী হতে। আর্টের সম্মানের সঙ্গে আর্টিষ্টের সম্মান জড়িত 'বাগার্থমিব সম্পৃক্ত'; দূর্ব্বা ভাল অভিনয় করতে পারলে প্রচুর সম্মান পাবে নিশ্চয় কিন্তু দূর্ব্বা যেন স্বতই সম্মানিতা—ঐ আশ্চর্য্য মেয়েটাকে দেখলেই কেমন যেন মাথা নুয়ে আসে। ও যেন আর্টিষ্টের প্রাপ্য সম্মানের বহু ঊর্দ্ধে; যে রসময়ী প্রকৃতি থেকে সমস্ত কলার উদ্ভব, ও যেন স্বয়ং সেই কলালক্ষ্মী! কিন্তু না। বরুণ অনর্থক ওর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে। গরীবের মেয়ে, সিনেমার অধিনেত্রী হবে, ওর আবার মর্য্যাদা কি?—ওর দৈহিক মর্য্যাদার দাম হাজার কয়েক টাকা—বরুণ তা দিতে পারবে নিশ্চয়।

কিন্তু কোথায় যেন গোল লাগছে বরুণের। হাজার কয়েক টাকা দিয়েই কি ওকে কেনা যেতে পারবে—যে অতি তুচ্ছ কারণে বরুণের মত ধনীপুত্রকে মুখের ওপর বলে যেতে পারে—'অভদ্র, ইতর!' আচ্ছা! বরুণের চোখ অকস্মাৎ জ্বলে উঠলো—ঐ কাথাটা, মাত্র ঐ কথাটার জন্যই বরুণ এতোখানি করছে; ওকে পথের ধূলোয় ফেলে না দেওয়া পর্য্যন্ত বরুণের নিদ্রা নেই, শান্তি নেই; পরমার্থ নেই।

অন্যায় এমন বেশি কি আর করেছিল বরুণ? ষ্টিয়ারিং থেকে বাঁ হাতখানা তুলে ওকে একটু কাছে টেনে নেবার জন্য ওর পিঠে হাত দিয়েছিল—সতীর বাচ্চা একেবারে! তিরিক্ষে মেজাজ দেখিয়ে নেমে পড়লো। আচ্ছা!

লনের সুন্দর রাস্তায় একটা প্যারাম্বুলেটারে চড়ে বছর দুই-এর একটা মেয়ে বেড়াচ্ছে—বাজাচ্ছে কি যেন একটা লাল মত। পিছনে আয়া ঠেলছে গাড়ীখানা। ফুল দেখে খুকী চেঁচিয়ে উঠলো ফু······ফু······ফু····ল্ মা—মা—ফু······ল্ ল্।

বরুণের দৃষ্টি পড়লো মেয়েটার দিকে। এক ফোঁটা শিশির যেন দূর্ব্বা ঘাষের সবুজ পাতায় ঝলমল করছে—গাড়ীটার রং সবুজ, তাই দূর্ব্বার কথাটা মনে পড়লো বরুণের। নইলে আর কি কারণ থাকতে পারে 'দূর্ব্বা' শব্দটা মনে আসবার! কিন্তু বরুণ সাইকোলজী পড়েছে, মনের নিভৃত কন্দর ও দেখতে জানে—দূর্ব্বা শব্দটা গাড়ীর বর্ণের জন্য নয় এখানে, দূর্ব্বা নামধেয়া তরুণীটির জন্যই মনে পড়ল। কিন্তু ঐ মেয়েটা আরো অনেক কথা মনে করিয়ে দিল বরুণকে। আত্মার আত্মজা ও বরুণের; বরুণের মুখের গড়ন থেকে গায়ের রংটা পর্য্যন্ত ও কেড়ে নিয়েছে—না, ওকে দিতে হয়েছে—ওর অধিকার স্বতসিদ্ধ, তাই দিতে হয়েছে—কিন্তু বরুণ এখন 'ভিলিয়ান'—ও সব পুণ্য কথা ভাববার ওর সময় নেই—মেয়েটার দিক থেকে চোখ ফেরালো বরুণ।

বা—বা—বা—বা—বা ঃ—···ডাকছে খুকী—আয়াটা হাসছে। কানে যেন বিষ ঢালছে বরুণের। নির্জনে একটু চিন্তাও এরা করতে দেবে না!

—ওকে ঐ দিকে নিয়ে যাও, ফাঁকা হাওয়ায়, বুঝলে!

বরুণ আদেশ করলো আয়াকে। কিন্তু গাড়ী ঠেলতেই খুকী কাঁদলে, —না—মা—না—বাবা!

একি বিষ না অমৃত! নাকি বিষামৃত একসঙ্গে! মনে পড়লো, "বাঁশরী রব তুয়া অমিয় গরলরে, হৃদয় বিদারয়ি হৃদয় হরলরে।" উহুঁ, বরুণ দুর্ব্বল হবে না। চেয়ে দেখলো, ক্রন্দনাতুর মেয়েটাকে গাড়ীসমেত ঠেলে আয়া দূরে চলে গেল—অনেকটা দূরে। যাক্, কিন্তু ওর মা আছে এই বাড়ীতেই, দোতালায়। কোন সময় আবার এসে না পড়ে। কিন্তু তাকে বরুণ খুব বেশী খাতির করে না, ভয় তো করেই না। ভয় করে ঐ একফোঁটা মেয়েটাকে; সেই যেন বরুণকে শাসন করে মাঝে মাঝে; কালো, কাজলটানা চোখজোড়া তুলে গর্জন করে বলে,

—বাব্বা!

বরুণের সব আইডিয়া তালগোল পাকিয়ে যায়। ভারী মুস্কিল! ও যেন বরুণকে শাসন করতেই এসেছে। ওকে কিছু বলবার নেই; ঘর সংসার নোংরা করবে, জুতো জামা কাপড় উচ্ছন্ন দেবে, বরুণের চুল ধরে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে, হুকুম করবে,

—বাঁশী দাও, নয় লজেন্স, নয়ত খেলনা।

তৎক্ষণাৎ তামিল করতে হবে বরুণকে। সব কাজ ভণ্ডুল করে দেয় ও। সাধে কি আর মুণি-ঋষিরা বনে চলে যেতেন! ঐ একফোঁটা একটা বাচ্চার ভয়ে!

কিন্তু বরুণ বনে যাচ্ছে না, সিনেমার আপিসে যাবে; দেরী আছে। এই তো সকাল সাতটা—বেলা দুটোর সময় এনগেজমেণ্ট। অনেক দেরী, অনেক! আষাঢ় মাসের লম্বা দিন, বাপ্! দু—টো। এখনো সাত ঘণ্টা। তারপর আসবে দূর্ব্বা—তন্বীশ্যামাশিখরীদশনা! বিরাট 'লনটা' বর্ষার বারিপাতে সবুজ হয়ে উঠেছে—মৃত্তিকা-জননীর গর্ভস্থ শষ্পাঙ্কুর তরুণী হয়ে উঠলো—তন্বীশ্যামা···পান্নার মত প্রাণমোহন। খুকীটা গাড়ী থেকে নেমে ঘাসে ঘাসে হামা দিয়ে বেড়াচ্ছে—বরুণের জীবনাঙ্কুর···কয়েকটা বর্ষার

পরেই ও-ও তরুণী হয়ে উঠবে—অমনি অপরূপ লাবণ্য-ঢলঢল……দূর ছাই! কি সব ভাবছে বরুণ। আজ ওসব পূণ্য কথা নয়। সৎচিন্তা শিকেয় তোলা থাক ঃ বরুণ বিরক্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাড়ীখানা সামনেই রাখা হয়েছে ধুয়ে মুছে। বরুণ উঠেই চালিয়ে দিল। গেটের বাইরে বেরিয়ে যাবার আগেই ডাক—বাব্বা!

ওঃ! জ্বালাতন করে মারলো দেখছি! কিন্তু বরুণ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটা হয়তো কাঁদবে। বরুণের কোলে বসে কচি হাত দিয়ে ষ্টিয়ারিং ঘোরায় সে—ঐ খেলাটা খেলতে পেলনা বলে কাঁদবে হয়তো। কাঁদুক! অত দেখতে গেলে চলেনা বরুণের!

কিন্তু আশ্চর্য্য! ও এই পৃথিবীতে আসবার আগে বরুণ কত কি করেছে,—কারুর কাছে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয়নি তাকে! ওর মার কাছেও না। পৃথিবীর কিছুকে গ্রাহ্য করতো না বরুণ। অর্থ আর স্বাস্থ্য থাকলে ভোগ না করা পাপ, এই তার ধারণা ছিল। অকস্মাৎ কোত্থেকে ঐ শিশিরবিন্দুটা এসে ওর অহঙ্কারের হিমাচলকে ভাসিয়ে ডুবিয়ে বিপর্য্যস্ত করে দিচ্ছে! অতটুকু একটা মাংসপিণ্ড, এতো তার শক্তি! বরুণ বাড়ী ফিরলে ও যদি ঘুমিয়ে থাকে, তবেই রক্ষে, জেগে থাকলে গলা জড়িয়ে ধরে লম্বা টানা চোখদুটো তুলে বলবে,—বাব্বা! কোথ্ ছিল্!—

বরুণ অসহায় হয়ে যায় ওর কাছে! বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বরুণ—বাপঠাকুরদার মর্য্যাদা ভাঙিয়ে সে অভিজাত হয়েই আছে, এবং থাকবে আরো অনেকদিন—কারণ অর্থসম্পদ তার অফুরন্ত! কিন্তু ঐ শিশিরবিন্দুটাকে তেমনি অভিজাত ঘরে তুলে দিতে হবে—যেখানে কচুপাতায় নয়—দূর্ব্বাদলে সে প্রদীপ্ত থাকতে পারবে—কিম্বা—

চমকে ওঠলো বরুণ! দূর্ব্বাদলে কেন? পদ্মদলে বললেই তো ভাল হয়। নিজের মনেই কথাটা সংশোধন করছে। কিন্তু ঐ মেয়েটার মা যদি

হোত!—আঃ, ছিঃ, কি সব ভাবছে বরুণ! কোন এক সিনেমা-অভিনেত্রীকে তার ঘরের লক্ষ্মী করবার কথা কেন মনে ওঠে তার?—কিন্তু দূর্ব্বা কি শুধু অভিনেত্রী—না—বরুণ আশ্বস্ত হোল। খুব অন্যায় অযোগ্য কথা সে ভাবেনি। বরুণের গৃহাধিষ্ঠাত্রী হবার মত সব যোগ্যতাই আছে দূর্ব্বার—বরুণেরই নাই, তার প্রবল প্রতিবন্ধক ঐ শিশিরকণাকে যে প্রসব করেছে সে!—

'এত তাড়াতাড়ি বিয়ে না করলেই পারতো বরুণ, কিন্তু সেকালের গিন্নীদের সঙ্গে কি পারবার যো আছে? মা শুনলেন না—মেয়ে পছন্দ হয়েছে, অতএব বিয়ে করতে হবে বরুণকে। না করলে গৃহে অশান্তি, বাইরে বদনাম এবং মেয়েটাও হাতছাড়া হয়ে যায়। মার পছন্দটা ভালই। বরুণের জন্য অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে ঠিক করেছিলেন তিনি—অভিজাত্য, সুশিক্ষিতা, নৃত্যগীতকুশলা এবং চঞ্চলা চপলা হাস্যলাস্যময়ী সুবর্ণা। ঘর আলোকরা বৌ এসেছে বরুণের বছর তিনেক আগে। রূপের দীপ্তিতে মার্ব্বেলের মেঝে ঝলমলিয়ে উঠলো—বরুণ চেয়ে দেখলো—মূর্ত্তিমতী কামনা! বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখটি পর্য্যন্ত পালিশ করা—পায়ের জুতোর জরীতে খনির সোনা লুটিয়ে পড়ছে। পিয়ানোর সামনে বসে গান ধরলো—

মম মর্ম্মমুকুরে দূর হতে সখা পড়েছে তোমার ছায়া,
প্রণয়লোকে প্রেম-আলোকে গড়েছে স্বপন-কায়া……

মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল বরুণ। তারপর কয়েকমাস প্রায় গৃহবন্দী ছিল সে—নববধূর অঞ্চলবন্দী বললেই ভাল হয়। অকস্মাৎ একদিন বধূ বিরক্তমুখে প্রকাশ করলো—সন্তান আসবে! বিরক্তির কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে বরুণ জানতে পারলো, এতো শীগ্রি ও চায়নি সন্তান—অনাহুতই আসছে সে। যে আশ্রয়ে সে এসেছে, সেখানে স্নেহস্তন্যেরও কার্পণ্য হবে,

বুঝতে দেরী হোল না বরুণের। আধুনিকা, প্রগতিবাদিনী, পরানুকরণে অভ্যস্থা সুবর্ণাকে কিছুই বলতে পারলো না বরুণ—শুধু গর্ভস্থ সন্তানটির জন্য মমতায় তার অন্তর আকুল হয়ে উঠলো। সুবর্ণা সেই দিনই জানিয়ে দিল—মাইদুধ দিতে পারে এমন মেয়ের যেন এখন থেকে চেষ্টা করা হয়—কারণ, যৌবনকে সে নষ্ট করতে চায় না! শুনে বরুণ সুদীর্ঘ একটা নিশ্বাস ফেলে ভেবেছিল—ঘরের বৌ আর পরের মেয়েতে তফাৎটা বড় সূক্ষ্ম আজকার দিনে।—কিন্তু যাক্ সে কথা।

বরুণের মনের গঠন বড় বিচিত্র; চরিত্রও তাই কিছু বিচিত্র ধরণের। লেখাপড়া সে ভালই শিখেছে। ইংরাজী সাহিত্য তার আয়ত্তে—আর বাংলাও ভাল জানে, তা ছাড়া কিছু বিজ্ঞানও সে পড়েছে। প্রথম যৌবনে পড়ার দিকেই ছিল ঝোঁকটা, তারপর কোথায় কি যেন ভূমিকম্প হয়ে ফাটল ধরে গেল—বরুণের জীবনে জাগলো অপরিমিত ভোগস্পৃহা। সুবর্ণা যদি স্বচ্ছ স্নেহশীতলা স্রোতস্বিনী হোত, তা হলে হয়ত বরুণের জীবনতরণী ভালই চলে আসতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সুবর্ণা হোল চঞ্চলা গিরীনদী—তার গৈরিক স্রোতে বরুণ উদ্দাম হয়ে উঠলো আরো, এবং সুবর্ণার স্বর্ণনদী ছেড়ে সহস্র নদীর অনুসন্ধানে চলে এল—সিনেমার পথে আসার এইটাই হয়তো বড় কারণ কিন্তু ঠিক এই সময়েই এল ঐ একফোঁটা মেয়েটা—কী অজস্র শক্তি, কী অফুরন্ত দীপ্তি তার—যেন সৌরজ্যোতি। বরুণ চোখ বুজে উদ্দামগতিতে চলছে অন্ধকার পথে। চোখ খুললেই আলো চোখে পড়ে—খুকীর মুখখানা! কিন্তু বরুণ চোখ খুলবে না।

গাড়ীখানা নিয়ে গড়ের মাঠে কয়েকপাক ঘুরে বেশ খানিকটা পেট্রোল পুড়িয়ে বরুণ এসে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বাড়ীতে ফোন করে দিল,—বিশেষ কাজে সে আটকে গেছে। বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হবে—।

চিণ্ময়কে সকালেই পারুলের ছোটভাই খবর দিয়ে গেছে—সে যেন বারোটা-সাড়েবারোটার মধ্যে খাওয়া সেরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে দুর্ব্বার বাড়ী আসে। ব্যাপার কি, জানে না চিণ্ময়—কিন্তু দুর্ব্বার আদেশ অবহেলা করা অসম্ভব। বারোটার মধ্যে স্নান-খাওয়া শেষ করে সাড়ে বারোটার আগেই সে বেরিয়ে পড়ল।

গিয়ে দেখলো—দাদু একা বসে তামাক টানছেন, দুর্ব্বা কোথায় বেরিয়েছে—হয়তো পাশের বাড়ীতে। চিণ্ময়কে দেখে বললেন,

—এসো দাদা—দিদি বলে গেছে, কোথায় যেন বেরুবে তোমার সঙ্গে!

জবাব দেবার কিছু নাই। চিণ্ময় বসলো বিরাট পালঙ্কটার একধারে। দাদু কিছুক্ষণ তামাক টানলেন, তারপর আস্তে কাশলেন, বললেন,—সেদিন দিদি আমায় এসে বললো যে তার ভবিষ্যৎ জীবনের ভার নেবে এমন একজন বন্ধু সে পেয়েছে—আমি এবার যখন ইচ্ছে চোখ বুজতে পারি—থামলেন; চিণ্ময় চুপ করে রয়েছে—আবার কেশে বললেন,—তারপর তুমি আসনি; ব্যাপার কি ভাই? কি রকম বন্ধুত্ব তোমাদের?

—সে তো মাত্র পরশুর কথা দাদু—কাল আসতে পারিনি—বড্ড ঝামেলায় ছিলাম—একটা লোক তিনখানা দলিল নকল করিয়ে পাঁচটা টাকা দিল—সারাদিন ঐ-কাজ করেছি—উকিলের বাড়ী থাকি, বুঝছেন তো!

—ভাল কথা—রোজগার করবারই বয়স এখন ভাই তোমাদের—কিন্তু—আবার থেমে থাকলেন কিছুক্ষণ, তারপর বলতে লাগলেন, —দিদির স্বাধীনতা আমি খর্ব্ব করেছি ওর আট বছর বয়সে—আর কখনো করিনি—করবো না। শ্রীগুরুদেবের যেমন ইচ্ছে, তেমনই হবে দাদা, তবে তোমাদের বন্ধুত্বটা কি ধাঁচের, একটু বলতে আপত্তি আছে?

—না, কিছু না দাদু—চিণ্ময় উত্তর দিল—তারপর বললো, কি

প্রতিশ্রুতিতে ওরা আবদ্ধ হয়েছে ঠনঠনের কালীতলায়। সবটা বলে চিং বলল—গোড়ায় আমি ওটাকে সিরিয়াস ভাবিনি দাদু—কিন্তু পরে বুঝলাম, নামে দূর্ব্বা হলেও আপনার নাত্‌নি ব্যবহারে দুর্ব্বাসা—ওর কথার নড়চড় হয় না।

—তোমারও যেন না হয় দাদু—এবার কাজের কথাটা বলি, শোন।

চিণ্ময় অপেক্ষা করতে লাগলো। বৃদ্ধ আরো কয়েকটান তায়াক টেনে বললেন—গতকাল কারা সব এসেছিল, হয়তো সিনেমার লোক—কিন্তু আর একজন এসেছিল, গোবিন্দ, এই বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক।

—ও—ভাড়া চাইতে ?

—না, তোমাকে বলেছি, দূর্ব্বার দিকে ওর দৃষ্টি আছে ; সে সিনেমায় যোগ দেবে শুনে গোবিন্দ আমার কাছে দূর্ব্বাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব করলো !

—সে কি ! বয়স কত তার ? কি জাত ?

—জাতিতত্ত্ব আমি তো মানিনে দাদু—বর্ত্তমান জাতিতত্ত্বের কোনও অর্থ নেই। ভগবান বলেছেন—'চাতুর্বর্ণো ময়া সৃষ্ট গুণকর্ম্ম বিভাগশ—' আর অন্য শাস্ত্রও বলেন—'শুচা দ্রবতি ইতি শূদ্র'—অর্থাৎ যে ব্যক্তি শোক দুঃখে অভিভূত হয় সেই শূদ্র—এ অর্থে গোবিন্দ শূদ্রই—কিন্তু যাক সেকথা, বয়স একটু বেশী—ছত্রিশ আন্দাজ হবে—স্বাস্থ্যবান—দূর্ব্বাকে আমি বললাম তার কথা।

—শুনে সে কি বলল ?—বিস্ময় দমন করে প্রশ্ন করলো চিণ্ময়।

—বলল, স্বামী-সংসার করবার জন্য আমার জন্ম হয়নি দাদু—হলে যার হাতে আমায় দিয়েছিলে, সেই আরো কিছুকাল টিকে যেতে পারতো।

—ওর মত্‌ নেই তাহলে—চিণ্ময় অকূলে কূল পেয়ে দম ছাড়ছে।

—না—ওখানে মত্ হবে না, জানতাম। ওর মনের কোন্ খোরাকটা মেটাবে গোবিন্দ! কিন্তু তোমার কথাটাও ঐ সঙ্গে আমার মনে এসেছিল।

চুপ করে রইল চিণ্ময়, হয়তো একটু লজ্জা, একটু সঙ্কোচ,—বৃদ্ধ বলে চললেন,—কিন্তু আমি তো তোমায় কিছু বলতে পারি না ভাই; মেয়ে বিধবা না হলে হয়তো সে প্রস্তাব আমি করতাম।

—তোমায় কিছু আর করতে হবে না দাদু···যেদিন খুসী এরপর মহাসমাধি নিয়ে তোমার শ্রীগুরুদেবের পদসেবা করতে যেতে পার; বলে দূর্ব্বা এসে দাঁড়ালো ঘরে—হাতে একজোড়া জরী দেওয়া দামী জুতো।

—তোর বন্ধুকে কথাটা বলছিলাম দিদি···

—বলতে বাধা নেই, ভাবতে মানা করছি তোমায়। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমায় আর কিছু ভাবতে হবে না—বুঝলে? তামাকটা সেজে দেব আর একবার?

—থাক—দিদি—তোরা বেরুবি কখন?

—এই এক্ষুনি—জুতো আনতে দেরী হয়ে গেল। খালি পায়ে যাওয়া ঠিক নয়।

—কোথায় আনলে জুতো? পারুলের কাছে?—চিণ্ময় শুধোলো।

—পারুলকে বেচলে এমন জুতোর দাম উঠবে না, হুঁ! ওটা যে কি করে পরবো, তাই ভাবছি—ওর যুগ্যি শাড়ী ব্লাউজ তো চাই আবার।

—আমি টাকা এনেছি, রাস্তায় জুতো কিনে নেব—চিণ্ময় বলল।

—টাকা! তোমার মাইনে তো সেদিন খরচ হয়ে গেছে! এডভান্স নিলে?

—না—বলে চিণ্ময় টাকা পাওয়ার ইতিহাস জানালো। শুনতে শুনতে দূর্ব্বা সযত্নে জরী দেওয়া জুতোজোড়া কাগজ মুড়ে রেখে দিয়ে

—বাঁচালে! পরের জিনিষ নিতে হোল না। কাপড়খানা বদলে আ'।-বলেই ওঘরে গেল এবং ফিরে এল দশ মিনিটের মধ্যে। তারপর বেরুলো দুজনে রাস্তায়। দাদু বসে বসে 'শঙ্কর ভাষ্য' পড়তে লাগলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে চিণ্ময় বলল—পাণ্ডুলিপিটা কি জন্যে আনতে বললে?

—ওরা শুনবে—ওরা মানে সিনেমাওয়ালারা—সেই যে গো রঞ্জাবতী না গুঞ্জমালা কি যেন?

—রঞ্জাবতী! তারা তো শুনেছে সেদিন।

—সেদিন তারা জানতো না যে আমি তোমার কর্ণধার—হাসলো দূর্ব্বা। হাসি ওর একটা রোগবিশেষ। চিণ্ময় এই কদিন লক্ষ্য করছে, দূর্ব্বা যখন তখন হাসে অতি দুঃখেও। হাসিটা অবশ্য খুবই সুন্দর ওর, কিন্তু সরসময়ই ঐ সম্পদটা খরচ করা ঠিক নয়। শুধুলো,

—তুমি কি রঞ্জাবতী সিনেমা কোম্পানীতে যাবে নাকি?

—হ্যাঁ—তুমি যাবে আমার বডিগার্ড হয়ে।

—তোমারও বডিগার্ডের দরকার হয় দূর্ব্বা?

—হয়—কেন জানো? পৃথিবীর সব যায়গায় তো মানুষ নেই—গরু ছাগলও আছে, তারা পাছে মুড়িয়ে খেয়ে নেয়—হাসলো দূর্ব্বা আবার, তবু কিন্তু মরে না দূর্ব্বা, অপবিত্রও হয় না—আত্মা তার অবিনশ্বর, কিন্তু তখনকার মতন নেড়া হয়ে যায়।

—তোমার মানসিক শক্তি অসীম দূর্ব্বা।

—হ্যাঁ—আমার মন অজেয় চিণ্ময়দা, কিন্তু দেহটার জন্য রক্ষক দরকার।

—শুধু রক্ষক হয়ে আমায় চলতে হবে দূর্ব্বা? গোবিন্দ যে প্রস্তাব করতে পারে···

—থামো চিণ্ময়দা—আমি জানি, তুমি অতিশয় দুর্ব্বল পুরুষ—তবু

মাকেই আমার বন্ধু করলাম। কারণ জানো? তুমি দুর্ব্বল, কিন্তু তুমি মানুষ; পশুকে মানুষ করা যায় না—মানুষকে মহামানব করাও সম্ভব!

—তুমি আমায় মহামানব করতে চাও দূর্ব্বা?

—না—তোমায় শুধু দূর্ব্বার অকৃত্রিম বান্ধব করতে চাই—আকাশের মেঘের মত উদার, সজল, সুন্দর, দূর্ব্বা যার রসে সঞ্জীবিত হয়!

—মেঘে বিদ্যুৎ থাকে দূর্ব্বা—তার জ্বালা বড্ড বেশি!

—মেঘের ঔদার্য্য তাকে সহ্য করতে পারে—এসো, চটি কিনবো; দাওত টাকা গুলো।

চিণ্ময় নিশ্চুপ বসে বসে দেখলো দূর্ব্বার চটি কেনা—তারপর নিঃশব্দে গিয়ে ট্রামে উঠলো। গাড়ীতে ভিড়—দূর্ব্বা অবশ্য লেডিজ সীটে বসতে পেল, কিন্তু চিণ্ময়কে দাঁড়িয়ে থাকতে হোল সারা পথ। টালিগঞ্জ ট্রামডিপোতে নেমে দূর্ব্বা সর্ব্বপ্রথম যে কথাটি বলল, তা হচ্চে,

—পা ব্যথা করছে? ভয় নাই, শীগ্রি তোমায় মোটরে চড়াবো। হাসলো চিণ্ময় একটু—কিন্তু দূর্ব্বা ঐ কথার জের ধরে বলল আবার—বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?

—তোমাকে কোনখানে আমি আর অবিশ্বাস করিনে দূর্ব্বা—শুধু ভাবছি, কতদিন আমার এই বন্ধু-সৌভাগ্য থাকবে, কে জানে। হয়তো কালই এই মিত্রতাবন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে—হয়তো আজই যাবে।

—হয়তো কোনদিনই যাবে না—দূর্ব্বা বলল—আমার দৈহিক সংস্পর্শ-টুকু বাঁচিয়ে বন্ধুত্ব রাখা কি তোমার পক্ষে এতোই কঠিন হবে চিণ্ময়দা?

—জানিনা—চিণ্ময় গট্‌গট্ করে এগিয়ে চলল। দূর্ব্বা হেসে উঠলো।

—তোমার আধ্যাত্মিক শক্তি অতিশয় কম চিণ্ময়দা—তবে ভয় নেই, আমি শক্তি যুগিয়ে যাব…দূর্ব্বা ছুটে এসে সঙ্গ নিল ওর। বলল,

—মাসকয়েক আগে একটা মাসিকপত্রে একটা কবিতা পড়েছিলাম চিণ্ময়, শ্রীচিণ্ময় মুখোপাধ্যায়ের লেখা—গোড়াটা মনে আছে ; শুনবে ?

"আমার জীবন-পদ্মদল কি গলিয়া গলিয়া পড়িবে না মা ?
তোমার ও-দুটি চরণ পদ্মে, শিশিরের মত ঝরিবে না মা ?
তবে মিছে এই জীবনোৎসব,
মিছে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈভব,
মিছে হবে মোর আয়ুর অমৃতে এ-দেহপাত্র পূর্ণ করা,
সে-পাত্র যদি তোমার চরণে উজাড় করিয়া না হোল ধরা।"

চিণ্ময় ওর মুখের পানে তাকিয়ে আছে ; সেই প্রকাণ্ড শিরিষ গাছটা, জনবিরল পথ—সর্পিল— দূর্ব্বা সর্পিল বেণীটা দুলিয়ে বলে চলল,

"অনেক পুণ্য করি নাই ভয়ে, বোঝা যদি মাগো অনেক বাড়ে,
পাপের বোঝা তো ফেলিয়া এসেছি তব নামামৃত সিন্ধুপারে—"

—থাক দূর্ব্বা—কবিতা লেখা, আর জীবনের পথে চলা এক নয়।

—একই ! যে কবির কলমে এই কবিতা আসে, সে দুর্ব্বল, নিজেই সে স্বীকার করেছে—কিন্তু সে সবলতার ভণ্ডামী করে না—সে অকৃত্রিম, তাই সে দূর্ব্বার বন্ধু !

—আমি যে এ কবিতার লেখক, তা তুমি কি করে জানলে দূর্ব্বা ? অন্ত চিণ্ময় তো হতে পারে !

—পারে, তবে হয়নি। জানতে পারলাম আজই। যার কাছে জুতো চাইতে গিয়েছিলাম সে লেখিকা, মানে, 'লেখিকা' হবার সখ আছে তার। বড়লোকের মেয়ে, অনেক মাসিকপত্র কেনে। তোমার সঙ্গে বেরুবো শুনেই বলল—কোন্ চিণ্ময়, কবি চিণ্ময় ?

—হ্যাঁ—শুনে আরো কয়েকটা কবিতা দেখালো তোমার ! তারপর

তোমার সঙ্গে আলাপ করবার লোভে আমাকে অমন দামী জুতো জোড়া পরতে দিল—নইলে মেয়েরা সহজে কাউকে কিছু দিতে চায় না।

—মেয়ে হয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে একথা বলোনা দূর্ব্বা !

—কথাটা সত্যি—যদিও মেয়েরা স্বীকার করেনা ; আর জানো তো, আমি ঠিক মেয়ে নই—অর্দ্ধেকখানা, অর্থাৎ মনখানা আমার পুরুষের মত শক্ত—

—ঐ কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিনা দূর্ব্বা।

—যেহেতু শক্ত না হলেই তোমার সুবিধে হয়। কেমন? কিন্তু দু'দিনেই বুঝতে পারবে—বিশ্বাসও করবে। চলো, দেরী হয়ে যাচ্ছে ; দুটো হয়তো বাজলো।

রাস্তায় আর কোনও কথা হোল না ওদের। রঞ্জাবতী ফিল্মকোম্পানীর অফিসে ঢুকলো ওরা। অফিসটার চেহারা যেন একটু বদলেছে—অন্য আর কিছু না—টিপয়ে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা—আর ফার্ণ সাজানো। আর বরুণের প্যাঞ্জাবীর সোণার বোতামের মাথায় আজ হীরের বদলে মুক্তা রয়েছে। কাটুবাবু কোট প্যাণ্টেই থাকে বরাবর—অন্য দুজনও বেশ একটু দামী পোষাক পরিহিত—ঘরখানাও ঝাঁট দেওয়া। ঢুকতেই সাদর অভ্যর্থনা পেল ওরা—আসুন, আসুন—ঠিক দুটো। বাঃ !

—দেরী হলে ফাইন করতেন নাকি ?—দূর্ব্বা বললে বরুণকে।

—অতটা আস্পর্দ্ধা যদি পাই কখনো !

—আস্পর্দ্ধা কেন ? এও তো চাকরী একরকম, আপনারা হলেন মনিব।

—কিন্তু-মনিব সম্বন্ধটা আমরা পছন্দ করিনে এখানে—বরুণ বলল।

—পেয়ারাকে আম না বলে পেয়ারা বললেই ভাল হয় না কি ? হাসছে দূর্ব্বা।

—কিন্তু এ সব আর্টের ব্যাপার—চাকর মনিব সম্বন্ধ এখানে অচল। কাটুবাবু তার কাটাকাটা কথায় বললো—ওতে কলা-লক্ষ্মীর অপমান হয়—

—কলা-লক্ষ্মীর প্রতি নিষ্ঠা যেন আপনার অটুট থাকে—বলে দূর্ব্বা এবার আর হাসল না—গম্ভীর হয়েই বলল—কলালক্ষ্মীকে অপমান করতে বলছি নে, চাকরীকে চাকরী বলেই স্বীকার করলে আমার সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হবে—আর আমি তাই করতে চাই!

কেউ আর কোন কথা বলল না। দূর্ব্বা আর চিণ্ময় পাশাপাশি বসেছে সোফায়—বরুণ সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিল ওর দিকে—খান; চা কি খাবেন এখন?

—না—থ্যাঙ্কস্—বলল দূর্ব্বাই—ও পড়তে কি আরম্ভ করবে?

—আপনার সঙ্গে কথাটা আমরা আগে পাকা করে নিতে চাই।

—বেশ; আমার কনডিশ্যান হচ্ছে—কোনো পুরুষের সঙ্গে আঙ্গিক স্পর্শ বিশিষ্ট ভূমিকা আমি নেব না; সুরুচিবিরুদ্ধ বেশবাস পরবোনা; সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমি ডিউটি থেকে অব্যাহতি নেবো—দিন ছাড়া রাত্রে কাজ আমি করবো না—আমার সঙ্গে সব সময় আমার আত্মীয় চিণ্ময়দা অবস্থান করবে—আমি থাকবো তাঁর দৃষ্টির মধ্যে। ষ্টুডিওতে অভিনয় করানো বা রিহার্স্যাল দেওয়ানো ছাড়া আমাকে দিয়ে আর কোনো কাজ করাতে পারবেন না।

—বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের সময়?—কাটুবাবু হেসে শুধুল।

—আমার অভিভাবক সেখানেও থাকবে; বস্ত্রপরিবর্ত্তন আমি ম্যানেজ করে নেব!

—আমাদের এতখানা অবিশ্বাস কেন করছেন দূর্ব্বা দেবি?

—অবিশ্বাস নয়, যে-কোন কারণে হোক, আমি এই 'প্রিন্সিপ্‌ল্' নিয়েছি।

—বেশ, আমরা মেনেই নিলাম আপনার সর্ত্ত; তবে দেখবেন, কাজ করতে হলে এরকম বাঁধাধরার মধ্যে কতখানি অসুবিধা আপনাকেই পেতে হবে।—বরুণ বলল।

—অসুবিধার দিকটাও আমি ভেবে দেখেছি, তবু এই সর্ত্ত আমায় নিতে হচ্ছে।

বরুণ ছাড়া আর কেউ এ সর্ত্ত মানতে রাজী ছিল না ওদের মধ্যে ; কিন্তু বরুণ এখানে আসবার আগে রেস্তোঁরায় সকলকে ডেকে মিটিং করে ঠিক করে নিয়েছে, যে-কোন সর্ত্তে দূর্ব্বাকে নিতে হবে—বরুণই বেশী টাকার শেয়ার হোল্ডার, আর কার্য্যতঃ সেই ডাইরেক্টার—কাজেই আর কারো কিছু বলবার রইল না। কাটুবাবু টাকা না দিয়েই শেয়ার-হোল্ডার ; তাই বলল হেসে,

—কাজে নেমেই বুঝতে পারবেন,—সর্ত্ত রাখা যায় না। কি সর্ত্তে বন্দী হতে পারে ? বন্ধনে আর্ট কখনো খোলে না !

—ভুল করছেন—দূর্ব্বা কোমল হেসে বলল—প্রকৃতি থেকে বড় আর্টিষ্ট কেউ নেই, আর প্রকৃতি থেকে শৃঙ্খলা তো অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। শৃঙ্খলাহীন আর্ট আর্ট নয়, উদ্ভট ! এই বিশ্ব উদ্ভট নয়, কারণ এতে সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা রয়েছে।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়। আপনি কি আগে কোথাও অভিনয় করেছেন ?

—প্রকাশ্য কোথাও না—পাড়ার মেয়েদের নিয়ে অনেকবার অভিনয় করেছি !

—সিনেমায় অভিনয় করাটা একটু কঠিন !

—অভিনয় অভিনয়ই, অন্য কিছু নয় ; যে সেটা পারে, সে সর্ব্বত্রই পারবে। ভাল, আমার দ্বারা যদি না হয় তো আমায় বিদায় করে দেবেন—পরীক্ষার পূর্ব্বে আমি টাকাকড়ি কিছুই নিতে চাই না।

—না—না, তা কি হয় ? আর পারবেন না কেন ! সকলেই কি সিনেমা আর্টিষ্ট হয়ে জন্মায় !—হ্যাঁ, শুনুন, আমাদের এটা প্রথম প্রচেষ্টা,

এইজন্য আপনাকে কিছু কম নিতে হবে—নায়িকার ভূমিকার জন্য আমরা পাঁচহাজার ধরেছি—তবে পরবর্ত্তী ছবিতে দ্বিগুণ হবে—

—পরবর্ত্তীতে কি হবে, সে কথা এখন থাক—দূর্ব্বা বলল—বেশ, আমি আপনাদের এষ্টিমেটের বাইরে যেতে বলছি না।

—আজ আপনাকে হাজার টাকা এড্‌ভান্স করছি—কৈ হে, কনট্রাক্ট ফর্ম্ম বের কর—বরুণ আদেশ করলো এবং পকেট থেকে মোটা মণি-ব্যাগ বের করে একশ' টাকার দশখানা নোট গুণে টেবিলের উপর রাখলো। ওদিকে কাটুবাবু কনট্রাক্ট ফর্ম্মটা পূরণ করতে করতে শুধুলো,

—সিনেমা-জগতে কি নামে পরিচিতা হতে চান আপনি?

—দূর্ব্বা—আমার ঠাকুরদার দেওয়া নাম—

—বই-এর নায়িকার নাম অতসী, ঐ নামটা নিলেই ভাল হয়।

—অন্য বই-এর নায়িকার তো আলাদা নাম হবে—তখন অতসী নামে অসুবিধা হবে—তাছাড়া নাম আমি বদলাতে চাই নে।

—দরকার কি—বরুণ বলল—বরং আমাদের ফিল্ম কোম্পানীর নামটাই বদলে "দূর্ব্বাদল ফিল্ম প্রডাক্‌সন" করে ফেলা যাক।

—সে কি? আমার নামে কেন নাম রাখবেন আপনারা কোম্পানীর?

—আপনার নাম বলে নয়, নামটা সুন্দর বলে—বরুণ জবাব দিল।

—না, এতে আমার আপত্তি আছে। আমি ত কোম্পানীর কেউ নই যে, আমার নাম জড়িত থাকবে কোম্পানীর নামের সঙ্গে!

বরুণ একবার তাকালো ওর পানে, তারপর বলল,—ওরা দুজনে ষাট হাজার আর আমি ষাট হাজার দিয়ে এই কোম্পানী গড়েছি—আপনি ত্রিশ হাজার দিলে আপনাকে অন্যতম শেয়ারহোল্ডার করে নিতে পারি।

—ত্রিশ হাজার টাকা কোথায় পাব আমি?—দূর্ব্বা বিস্ময়ের হাসি হাসলো।

—তিনটে ছবিতে অভিনয় করলেই ত্রিশ হাজার হয়ে যাবে আপনার। অভিনয় ভাল হলে তো কথাই নেই—এখনই হিন্দির জন্য আলাদা কনট্রাক্ট এবং বেশী টাকা পাবেন—এই বই-ই আমরা হিন্দি করবো—তাতেও তো আপনাকে থাকতে হবে!

দূর্ব্বা একটুখানি ভাবলো। এতোটা কেন এরা করতে চায়? সাধারণ ভাবে ওকে সিনেমায় ঢুকিয়ে ওর রূপ-যৌবনটা ওরা চাইছে-, এ তথ্য তার জানা; কিন্তু শেয়ার হোল্ডায় করে নিতে চাওয়া যেন অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বলে মনে হোল তার—ভেতরে আরো কোনো বদ মতলব আছে নাকি? বলল,

—দেখুন—ওসব ঝুঁকি আমি নিতে চাইনে এখন। ভাল অভিনয় যদি করতে পারি তো তখন "দূর্ব্বাদল ফিল্ম কোং" খোলা যাবে। এ ছবিতে ঐ পাঁচ হাজার টাকাতেই আমি অভিনয় করবো—অতখানা বাড়াবাড়ি করা আমার পক্ষে ঠিক হবে না। একদিনেই বড়লোক নাইবা হলাম।

—বড়লোক তো হচ্ছেন না—ওতে আপনাকে কোম্পানীর জন্য প্রচুর খাটতে হবে, অথচ পারিশ্রমিক পাবেন না যতক্ষণ ছবির টাকা ঘরে না আসে।

—তাহলে আমার চলবে কি দিয়ে?

—তার জন্য একটা এলাউন্স ঠিক করা থাকবে—ধরুন মাসিক দু-তিনশ'—যে টাকাটা পরে বাদ দিয়ে নেওয়া হবে আপনার প্রাপ্য মুনাফা থেকে। আমি অনুরোধ করছি, আপনি রাজী হয়ে যান—এ প্রস্তাব অন্য কাউকে আমরা দিতাম না—তবে আমরা দেখে এসেছি আপনি

বনেদী ঘরের মেয়ে—সাধারণ অভিনেত্রী হিসাবে আপনাকে আমরা দাঁড় করাতে চাই না—শেয়ার হোল্ডার হিসাবে থাকলে, সাধারণ অভিনেত্রীর পর্য্যায়ে আপনি পড়বেন না—বরুণ থামলো।

দূর্ব্বা ভাবছে। এতখানা আশাতীত সৌভাগ্য কেন আসতে চাইছে তার জীবনে? সে এই সুযোগ গ্রহণ করবে কিনা—ঠিক করতে পারছে না। পরামর্শ করবার মত কেউ নাই—চিণ্ময় এ ব্যাপারে একেবারে অপদার্থ। চেয়ে দেখলো, বরুণের দামী সিগারেটগুলো সে একটার পর একটা শেষ করছে—বলল—আর খেও না, ঠোঁট জ্বালা করবে।

—আরো শুনুন—বরুণ বলল—শুধু অভিনেত্রী হলে আমরা পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি, কিন্তু শেয়ার-এ এলে ঐ অভিনয়ের জন্যই আমরা হয়তো দশ হাজার টাকা ধরবো আপনার পারিশ্রমিক, কারণ ও-টাকা তো আমাদের নগদ দিতে হবে না—অভিনয় হলে, ছবি ভাল চললে পাঁচ-দশহাজার কিছুই নয় এ লাইনে। আপনাকে নগদ দিতে হচ্ছে বারো মাসে মাত্র চব্বিশ শ, – কাটুও এই সর্ত্তে ডিরেকটার এবং শেয়ার-হোল্ডার—ও মাসে তিনশ' করে এলাউন্স নেবে। আপনি রাজী হয়ে যান—কেমন?

—ভাবছি!—শোন তো, একটু বাইরে এসো—বলে দূর্ব্বা চিণ্ময়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল বাইরে। বরুণ ইতিমধ্যে সঙ্গীদের পানে চেয়ে বলল—রাজী হবে। আর রাজী হলে অন্য কোন কোম্পানীতে যেতে পারবে না, এই সর্ত্ত করে নিতে হবে—বুঝলে?

—অতটা আস্কারা কেন দিচ্ছিস তুই ওকে?—নৃপেন শুধুলো।

—ওকে আমার চাই-ই; লক্ষ টাকার বিনিময়েও—বরুণের চোখ জ্বলছে।

—সেটা আর বেশী কি! অভিনেত্রী হিসাবে যোগদান করলেই হবে!

—না—ওকে আরো গভীরে আমি টানবো—আমি প্রমাণ করে দেব যে যে-কোনও মেয়ের প্রেম লাভের যোগ্যতা আছে আমার। টাকা আমি দেব—তোমরা শুধু মুখে সম্মতি দিও···

—ঐ লোকটাকেও পুষতে হবে আমাদের!

—হোক—আমিই পুষবো—ওটা নিতান্ত গোবেচারা মানুষ, ভয় নেই! আর, আমি কোনো রকম অভদ্রতা করতে চাইনে মেয়েটার সঙ্গে। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যকর প্রেমই আমার কাম্য।

—বেড়ে! অকস্মাৎ স্বাস্থ্যকর ভাষা বেরুচ্ছে বরুণ তোর মুখে, ব্যাপার কি? প্রেমটা যে তোর বুকে আগেই গজিয়ে গেছে, দেখছি!

—গেছে—যাক্ চুপ কর সব।

বাইরে আসতে আসতে চিণ্ময় যেন অতর্কিতে বলে ফেললো, —আমার খুব ভাল লাগছে না দূর্ব্বা—

—আমারও না; এ যেন একটা ফাঁদ! কি বল?

—হ্যাঁ—তাই তো মনে হচ্ছে! এতখানা প্রলোভন—না দূর্ব্বা, কাজ নেই!

বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ালো দুজনে। একটা মেহেদী ফুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে দূর্ব্বা বলল—মানুষ সর্ব্বত্র পশু, কিন্তু ঐ যে লোকটা, মুক্তোর বোতাম লাগানো—ওর মধ্যে একটা মানুষ যেন ঘুমিয়ে আছে!

—ঘুমিয়েই থাক—জাগাতে চেও না দূর্ব্বা, সে মানুষ বনমানুষ হতেও পারে।

— ভালই তো ! খাঁচায় পূরে রাখবে, অথবা জ্যু গার্ডেনে।

—জ্যু তৈরী করতে অনেক খরচ দূর্ব্বা—ও-সখ এখন থাক, বাড়ী চল দূর্ব্বা, এ বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

—ভয় নেই, তোমার দূর্ব্বা আব কারো হয়ে যাচ্ছে না ; চল, ওদের জবাব দিই—শেয়ারে আমি আসবো না—কি বল ?

—না—কে জানে কি ফাঁদ আছে ওর মধ্যে !

কথা কয়টা আস্তে বলে ওরা আস্তে ফিরে এল আবার ঘরে। দূর্ব্বা ধীরে ধীরে বসে বলল –দেখুন, শেয়ার-হোল্ডার হবার মত বড় সৌভাগ্য আমি আজই কামনা করছি নে। আপনাদের সহানুভূতির জন্য ধন্যবাদ ! আমি শুধু অভিনেত্রী হিসাবেই যোগ দিতে ইচ্ছা করি।

—শুধু অভিনেত্রী !—বরুণের কণ্ঠে কাকুতি যেন !

— হ্যাঁ – শুধুই অভিনেত্রী এবং আমার সব সর্ত্ত বজায় রেখে !

—বেশ,—তবে আপনাকে যে সুযোগ আমরা দিচ্ছিলাম, তা বড় কমই পাওয়া যায় – কাটুবাবু বলল কথাটা।

— ধন্যবাদ তার জন্য অশেষ—কিন্তু আমি নিতে পারলাম না।

—আচ্ছা, তাহলে কনট্রাক্টেই সই করুন। কাটু কাগজগুলো এগিয়ে দিল।

চিণ্ময়ের হাতে সেগুলো তুলে দিয়ে দূর্ব্বা তাকে পড়ে দেখতে বলল, এবং তারপর ওদের শুধুলো—গল্পের ব্যাপার কি করবেন ?

—আপনার বন্ধুর গল্পটা শোনা যাক এবার।

—না—ও বই আপনারা নিতে পারবেন না। ও থাক ; আপনাদের যেমন ইচ্ছে, গল্প নির্ব্বাচন করুন—আমার বন্ধুর বই-এর জন্য আমি অন্যত্র চেষ্টা করবো।

—আমাদের ওপর কি অসন্তুষ্ট হলেন দূর্ব্বা দেবি ? নৃপেন শুধুলো।

—আজ্ঞে না, অসন্তুষ্ট হব কেন ? গল্প নির্ব্বাচন আপনারা করবেন,

আমার কি বলবার থাকতে পারে! তবে আমার বন্ধুর গল্প যাতে ভাল ভাবে স্ক্রীন হয়, তা আমি নিশ্চয় দেখবো!

—এখানে ভাল ভাবে হবে বলে মনে হচ্ছে না আপনার?

—না—

—কারণ?—বরুণ শুধুলো।

—কারণ, ভাল গল্প বা ভাল ছবি করবার দিকে দৃষ্টি আপনাদের

—সেকি! এ রকম অভিযোগ কেন করছেন দূর্ব্বা দেবি? বরুণ ব্যগ্রভাবে বলল।

—কথাটা সত্যি, তাই বললাম!

—বেশ—ওঁর গল্প পরে স্ক্রিন করবো; আপাততঃ যে গল্পটা আমরা ঠিক করেছি, আমারই লেখা—কাটুবাবু বলল—তার দুর্ব্বল অংশগুলো আপনি ঠিক করে দিন—শ' পাঁচেক টাকা আপনাকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

চিণ্ময় জবাব না দিয়ে দূর্ব্বার মুখ পানে তাকাল। কাটুবাবু বলল, —আপনি বলুন, আপনাকেই জিজ্ঞেস করছি।

—আমার কিছুই আমি বলি না—সবই ও বলে—চিণ্ময় জবাব দিল।

—হ্যাঁ—আমিই বলছি—দূর্ব্বা বলল—আপনার গল্পই উনি ঠিক করে দেবেন আপনার সঙ্গে বসে—যতটা সম্ভব ভাল করতে উনি কসুর করবেন না—তবে ওঁর নাম কোথাও জড়াবেন না!

—কেন!—নামটাই তো সকলে জড়াতে চায়।

—অপরের গল্পে ওঁর নাম আমি পছন্দ করিনে—টাকার জন্যেই শুধু ওটুকু উনি করবেন—ওঁর গল্প আমি নিজে ডাইরেকশ্যন দিয়ে তুলবো!

—ডাইরেকশ্যন একটা আর্ট, টেকনিক্—সেটা শিখতে হয় দূর্ব্বা দেবি!

—অপরে যেটা শিখেছে, আমরাও সেটা শিখতে পারি—

—অবশ্য ! আচ্ছা, তাহলে এই কথাই পাকা—হ্যাঁ—আপনি আমাদের ভ্যানে যাতায়াত করবেন তো—নাকি 'কার' পাঠাতে হবে ?

—আমি ট্রামেই আসবো ওর সঙ্গে—ট্রামেই যাব।

—রাস্তায় বড় বিব্রত করে পাবলিক—বিশেষ মেয়ে আর্টিষ্টকে।

—তার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারবো।

—আমার 'কার' আপনাকে আনবে, পৌঁছেও দেবে—বরুণ বলল।

—ধন্যবাদ—দরকার হবে না আমার।

কনট্রাক্ট সই হয়ে গেল। বরুণ হাজার টাকার নোট তুলে দিল দূর্ব্বার হাতে। দূর্ব্বা সেগুলো না গুণেই তুলে দিল চিণ্ময়কে।

—রাখ—তাহলে আমরা যাই আজ !

—এক মিনিট—বরুণ বলল—আপনার খান কয়েক ফটো তুলে নেব কাগজে প্রকাশ করবার জন্য—বরুণ ক্যামেরা বের করলো—আসুন একটু বাইরে—বাগানে—বেয়ারা, চেয়ার নিয়ে আয় !

প্রথম একটু ইতস্ততঃ করলো দূর্ব্বা, তারপর সমস্ত দুর্ব্বলতা ঝেড়ে এগিয়ে গেল বাগানে। চিণ্ময়ও গেল সঙ্গে। তিন চার রকম 'পোজ' এ দূর্ব্বার কয়েকখানা ছবি তুলে নিয়ে বরুণ দূর্ব্বাকে ধন্যবাদ জানাল।

—আচ্ছা—নমস্কার !

—চা খেয়ে যাবেন না ?

—না—থাক ; অন্যদিন হবে—দূর্ব্বা আর চিণ্ময় বেরিয়ে পড়ল।

হাজার টাকার মালিকরা এসে রাস্তায় নামলো। ট্রামেই যাবে, কিন্তু ট্যাক্সি ওরা এখন করতে পারে ; কাছাকাছি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ড নেই, নইলে হয়তো করতো। কিন্তু ট্যাক্সির কথা ওরা এখন কেউ ভাবছে না—চরিত্রের

কথা ভাবছে। চিন্ময় বলল—তোমায় কোন্ চরিত্র অভিনয় করতে হবে? রঞ্জাবতী?

—না—রাণী রঞ্জাবতীর মেয়ে অতসীর চরিত্র—এতক্ষণ শুনলে কি তুমি?

—অন্যমনস্ক ছিলাম—বলল চিণ্ময়—রঞ্জাবতীর মেয়ে অতসী কেন? তার নাম হওয়া উচিত ঝঞ্জাবতী—কিম্বা গুঞ্জমালা···

-থামো, হাসিও না—তুমি আর একটু সিরিয়স অর্থাৎ গম্ভীর হও, বুঝলে? রাণী রঞ্জাবতীর মেয়ে আমি অতসী, আমার প্রেমে পড়লো বৈশালীর যুবরাজ মৈনাক···তারপর চললো নাটক ঘাতে-প্রতিঘাতে··· শেষে সহমরণ

—সহমরণ?

—হ্যাঁ—ভয় কি! তোমার দূর্ব্বা মরবে না, নাটকের অতসী মরবে—হাসলো দূর্ব্বা, মধুর।

এই রহস্যময়ী তরুণীর অগাধ হৃদয়-পারাবারে চিণ্ময় নিতান্তই তৃণখণ্ড! কি ওর ভাব এবং অনুভাব, চিণ্ময় তিল মাত্র বুঝতে পারল না। নীরবে হেঁটে চলছে রাস্তা দিয়ে—সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটার কাছে এল।

—এইখানে তোমায় কুড়িয়ে পেয়েছি বন্ধু—এই বৃক্ষরাজকে নমস্কার।

—এখানে কেন? আমার সঙ্গে তোমার প্রথম দেখা হয় ওদের অফিসে। নমস্কার সেই স্থানকেই করা উচিত!

—কবিতা লেখা তুমি ছেড়ে দিও চিণুদা—তুমি অতি মাত্রায় অরসিক আর অকবি। মাঝে মধ্যে যা লেখ, তা তোমার লেখা নয়, কোনো ভাড়াটে ভাব সেগুলো!

—সেকি, কেন?

—কারণ, এই নির্জন সর্পিল পথের পাশে তরুতলে তোমায় আমায় দেখা, এইটাই কাব্য···ওদের অফিসে তোমার চেহারা দেখা কাব্য নয়—দূর্ব্বা খুব গম্ভীর।

—কিন্তু ওটা সত্যি···চিণ্ময় সত্যবাদিতার ওপর জোর দিয়ে কথা বলছে।

—ওটা সত্যি হলেও কাব্য জগতে, রসের বিচারে এইটাই সত্যি চিণুদা! তোমার কবি-অন্তর এখনো মলিন—সত্য মাত্রই কাব্য নয়, যা সত্য অথচ মহান-সত্য, যা বাক্য এবং অর্থকে ছাড়িয়ে মনে আনে ব্যঞ্জনা—ধ্বনি—যার রেশ আপ্লুত করে তোলে অন্তরকে···চল।

দূর্ব্বার মুখপানে চেয়েছিল চিণ্ময়—ওর কথা বলার সুমিষ্ট ভঙ্গীটা দেখছিল না—ভাবছিল নিজের অন্তরের দৈন্য—নিজের কবি-হৃদয়ের অকবিত্ব। কিন্তু দূর্ব্বা আবার তাগাদা দিল ওকে চলবার জন্য। চিণ্ময় বড্ড অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছে।

—চলো চিণুদা, হঠাৎ কাব্যের বান ডেকে উঠলো যে তোমার!

—না দূর্ব্বা, বান নয়, একটা উৎসমুখ যেন খুলে যাচ্ছে—জলকল্লোল শুনছি!

—পকেটে হাজারটা টাকার নোট আছে; দেখো, জলে যেন ভিজে না যায়!

—অকস্মাৎ এটা কি ধরণের কাব্য-কথা হোল দূর্ব্বা? একেবারে টাকার কথা!

—টাকা আমার দরকার, কারণ আমি কাব্য লিখি না, বই কিনে পড়ি—চলো।

দূর্ব্বা এগিয়েই হাঁটতে লাগলো। চিণ্ময়. অকূল সমুদ্রে ভাসছে। দূর্ব্বা কেন এল ওর জীবনে? কী অভিপ্রায় বিধাতার? এই আশ্চর্য্য

রহস্যময়ী অথচ অনলংকৃতা তরুণীর প্রত্যেকটি চরণক্ষেপ চিন্ময়ের চোখে বিস্ময় জাগাচ্ছে! কী ও করবে চিন্ময়কে [illegible]? ওর দুর্ব্বার ভাবস্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া চিন্ময়ের আর গত্যন্তর নেই—ভাবতে ভাবতে চিন্ময় চলছে পিছনে। পথের ধারে ঘেঁটু ফুল ফুটেছে—দূর্ব্বা একটা ছিঁড়ে খোপায় নিয়ে বলল,

—জানো চিণুদা, আমাদের দেশের বিধবাদের সাজগোজ করতে নেই…

—জানি—ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি—শুষ্ক উত্তর দিল চিন্ময়।

—কিন্তু আমি কুমারী অতসী হব, প্রেমে পড়বো, তারপর শাঁখা-শাড়ী-সিন্দুর পরে বিয়ে করবো…এ সব তো করতে হবে আমায় ওখানে!

—ভালোই তো, সখ মিটে যাবে,—চিন্ময় কাটা জবাব দিল।

—ঠিক বলেছ, চিন্ময়দা, সখ মিটে যাবে—কিন্তু বিয়ে যার সঙ্গে হবে, তাকে তো, আমার পছন্দ নয়—বাইরের সখটা মিটবে—তবে ওটাও দরকার—

—তাকে পছন্দ করে ভেতরের সখটাও মিটিয়ে নিতে পার—চিন্ময় যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েই বলল কথাগুলো। শুনে হেসে উঠলো দূর্ব্বা।

—তুমি চটেছো চিণুদা—তোমাকে দিয়ে দূর্ব্বাসার ক্রোধ-সাধনা চলতে পারে।

—তার মানে।

—মানেটা আজ জেনে কাজ নেই, অন্যদিন বলবো—এসো তাড়াতাড়ি; ওর হাত ধরে টেনে চলতে লাগলো দূর্ব্বা। লীলাময়ীর মত মনে হচ্ছে—কিন্তু চিন্ময় কি যেন বলতে গেল, দূর্ব্বা বলল ত্বরিত কণ্ঠে,

—চুপ! পিছনে ওদের গাড়ীটা আসছে, দেখছো না—চল, তার আগেই আমরা ট্রামে উঠে গিয়ে—চলে এস!

কিন্তু ট্রাম ডিপোয় পৌছবার পূর্ব্বেই মোটরখানা এসে পড়লো— কাছে। একেবারে ওদের পাশে এসে দাঁড়ালো—গাড়ীর ভেতর থেকে কাটুবাবু বলল,

—ও মশাই, কি যেন নামটা—আপনার ?

—চিণ্ময়,···জবাব দিয়ে তাকালো চিণ্ময় কাটুবাবুর পানে।

—অবিলম্বে স্ক্রিপ্ট তৈরী করতে হবে আমাদের— আপনি কখন বসতে পারবেন ?

—যখন বলবেন।

—বেশ, তাহলে আজই সন্ধ্যে বেলা···কোথায় বসবেন, আপনার বাড়ীতে ?

চিণ্ময় খুব বিপদে পড়ে গেল। বাড়ী তার নেই—তাছাড়া সন্ধ্যাবেলা ছাত্রটিকে পড়াতে হবে। কিন্তু দূর্ব্বা ওকে বাঁচিয়ে দিল। বলল,

—আগে আপনি মূল পাণ্ডুলিপিটা ওকে পড়তে দিন একদিন, ও সেটা ভাবুক একটু—তারপর দুজনে বসে স্ক্রিপ্ট লিখবেন। অত তাড়াহুড়ো করলে জিনিষ ভাল হয় না—একেই তো গল্পটা নিতান্ত বাজে আপনার।

—ঠিক কথা—ওকে গল্পটা পড়ে দেখতে দাও—বরুণ বললো চালকের আসন থেকে। গল্পটা বাজে বলায় কাটুবাবু যথেষ্ট দুঃখিত হয়েছে, বিশেষতঃ দূর্ব্বার মত 'কুমারী' মেয়ের মুখ থেকে ওরকম কথা শুনতে কারই বা ভাল লাগে ! সে ডিরেকটার, জবাব একটা দেবেই।

—গল্প সম্বন্ধে কতটুকু বোঝেন আপনি যে বাজে বলছেন ? আপনার বন্ধুর গল্প না নেওয়ার জন্য আপনি এতখানা চটবেন, জানতাম না !

দূর্ব্বা বিস্মিত হোল, বিরক্তও হল।

উত্তর সে দিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সারবান। অতিশয় দৃঢ়কণ্ঠে দূর্ব্বা বলল—বাজে জিনিষকে বাজেই বলি আমি; আপনার সম্মান

রাখবার জন্য মিথ্যে বলতে পারলাম না, দুঃখিত!—একটু থেমে আবার বলল,

—আমার বন্ধুর গল্পকে সিনেমায় রূপ দেবার যোগ্যতা আপনার আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনে—আত্মম্ভরিতাটা একটু খাটো করবেন।

—গল্পটা শুনেছেন আপনি আমার?

— সবটা শুনবার কোনো প্রয়োজন নেই—আমার ভূমিকাটুকুতেই ওর যথেষ্ট পরিচয় আছে। সেই আদিম ন্যাকামী আর নির্লজ্জতা···থাক্, আর কিছু বলছেন?

—গল্পটা খুব উচ্চশ্রেণীর নয়—এটা আমরা জানি দূর্ব্বা দেবি।

বলে বরুণ যেন এই অপ্রিয় ব্যাপারটা সামলাবার চেষ্টা করছে।

—ওঁর ধারণা, উনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একটা গল্প লিখেছেন—গল্প না বলে ওটাকে মহাকাব্য বললে উনি খুসী হন—কিন্তু কি করবো, মিথ্যে বলা আমার অভ্যাস নেই। চল চিনুদা—দূর্ব্বা এগুলো!

—বেশ; ও গল্পটা নাহয় নেব না—আপনার বন্ধুর গল্পটাই নেওয়া যাবে, তবে, ওটা আমাদের আরেকবার শোনা আবশ্যক—বলে কাটুবাবুও ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইলে

—ও গল্প নেবেন কি না, আপনারা বুঝবেন; আমার বন্ধুর গল্প আমি আপনাদের দেবনা—। কুলবধূকে গণিকালয়ে পাঠানো যায় না। চলো চিনুদা···

—আপনার সঙ্গে গল্পটার দোষ ত্রুটিগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতাম আমরা; আপনার বাড়ী গিয়েও সেটা হতে পারে···সময় হবে আপনার?

—অকস্মাৎ জ্বলে উঠে একেবারে নিবে গেলেন যে কাটুবাবু? দেশালাইয়ের কাঠির মাথার বারুদের থেকেও দেখছি নৈতিক বল কম

আপনার। হঠাৎ আমার খোসামুদী কারবার মতন কি পেলেন? গল্পের আমি কি বুঝি? বিশেষ আপনাদের সিনেমার গল্প? আমি অভিনয় করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ, সেইটাই নিষ্ঠার সঙ্গে করতে চাই—আলোচনা কেন করতে যাব আপনার গল্প নিয়ে? ওর দোষ বা গুণ যাই থাক—আপনাদের দ্রষ্টব্য সেটা। আমার বন্ধু যদি তাকে সংশোধন করবার অধিকার গ্রহণ করে, তো তার কাজটা তাকে দিয়ে আমি নিষ্ঠার সঙ্গে করিয়ে দেব।

—আমার একটা অনুরোধ দূর্ব্বা দেবি—বরুণ বলল—যে গল্প নিয়ে আমরা প্রথম নামবো সেটা ভাল গল্প হোক—এ আমরা সবাই চাইছি। যদি ওটা সত্যি বাজে গল্প হয় তো ওকে বাদ দেব—আপনার বন্ধুর গল্পটা শোনাতে আপত্তি আছে কি?

—মাপ করবেন—আমার বন্ধুর গল্প তো এখানে আমি দেবই না, যে কাজটা ও নিচ্ছিল, মানে, গল্পের দুর্ব্বল অংশগুলো ঠিক করে দেওয়া, সেটাও ওকে আর করতে দিতে চাইনে আমি।

—সেকি? কেন?

—কারণ, দেখতে পাচ্ছি, আপনাদের অহমিকা তাল গাছের মত। পৃথিবীর কিছু কাজ হয়তো ওতে হয়—কিন্তু সে যখন শালগাছের সঙ্গে পাল্লা দিতে আকাশের পানে মাথা তোলে, তখন ব্যাপারটা হয় হাস্যকর। সিনেমা-জগতে আপনারা মহাদ্রুম, কিন্তু জানবেন, এখানে বটবৃক্ষ নেই, সব এরণ্ড—শালগাছ নেই, সব তালগাছ, মূর্ত্তি নেই, শুধু মন্দির, তাও ভাঙা!

চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা চিণ্ময়ের পাঞ্জাবীর খুঁটখানা ধরে; টান দিল। ছিঁড়ে গেল খানিকটা হাতায়—'আহা'! শব্দ করে উঠলো চিণ্ময়! —যাকগে! ওতে আর নেই কিছু!—বলে হাতটা ধরলো দূর্ব্বা ওর।

—আসুন, পৌঁছে দিই,—বলে বরুণ এগিয়ে এল, বলল—সেদিনকার ব্যাপারটার জন্য সত্যি আমি লজ্জিত—উঠুন গাড়ীতে!

—অনেক ধন্যবাদ, কিন্তু আমরা ট্রামে দিব্যি যাব বেড়াতে-বেড়াতে! —না, আজ তো আর আপনি পর নন আমাদের, আপনার অভিনয়ের ওপর ছবির সাফল্য নির্ভর করছে—কি বলো কাটু?

—নিশ্চয়! আমিও মাফ চাইছি দূর্ব্বা দেবি—আপনার সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না আমাদের—আপনি যে এমন রসগ্রাহী মেয়ে, কি করে জানবো!—চলুন, কথা কইতে কইতে গাড়ীতেই চলুন।

দূর্ব্বা একটু মুস্কিলে পড়লো। এতখানা রুক্ষ কথা বলার পরও এরা মাফ চাইছে এবং অনুনয় করছে। কাজ যখন নিতে হয়েছে তখন, কিছুটা সয়েও নিতে হবে—জীবনটা এই রকম অনেক 'কম্প্রোমাইজ' দ্বারাই পূর্ণ—তবু একটু ভেবে বলল,—অনর্থক আমাদের জন্য অতখানা পেট্রল পোড়াবেন? —এ তো পোড়াতেই হবে—এগুলো আমাদের এষ্টিমেটেই থাকে। —আচ্ছা,চলুন— দূর্ব্বা আগে চিণ্ময়কে উঠিয়ে দিয়ে নিজেও উঠলো ভেতরের সীটে। কাটুবাবুও ভেতরের সীটে বসলো এসে। বরুণ গাড়ী চালাচ্ছে। এতোক্ষণে কাটুবাবু একটুখানি স্থির হয়ে বলল,—গল্পটা উৎকৃষ্ট বলে আমি কোনদিন দাবী করিনি—তবে বাজারে ঐ রকম গল্পই চলছে।

—চলছে না—পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে। মানুষ আর অত বোকা নেই যে আপনি যা-খুসী দিয়ে তাদের ঠকাতে পারবেন।

—নিশ্চয়! তাহলে গল্পের কি করা যায় বলুন তো? আপনার বন্ধুর গল্পটা সত্যি উচ্চ শ্রেণীর, কিন্তু সিনেমায় ওকে রূপ দেওয়া কঠিন।—

—আপনাদের নির্ব্বাচন বিষয়ে আমার কিছু বলবার নেই—বলে দূর্ব্বা চুপ করল। গাড়ী চলছে।

উত্তর কলিকাতার দিকে চলে গেল গাড়ীখানা দূর্ব্বা আর চিণ্ময়কে মালিকতলায় নামিয়ে দিয়ে। কি জানি কি ভেবে বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত গাড়ী আনলো না বরুণ—দূর্ব্বাও বলল, অনর্থক গলিতে গাড়ী ঢুকিয়ে লাভ নেই—ওরা হেঁটে বাড়ী ঢুকলো এসে···।

ওঘরে, ঠাকুরদার সঙ্গে কে একজন কথা বলছে; নিশ্চয় গোবিন্দ; দূর্ব্বা সটান ওখানেই ঢুকলো গিয়ে; গোবিন্দকে উদ্দেশ করে বলল,
—ভাড়ার রসিদ কি এনেছেন আপনি ?

—না ; কেন ?

—ভাড়াটা দিতাম আমি—চার-পাঁচ মাসের বাকী পড়ে আছে !

—ও, তা এতো তাড়া কেন ? দাদুর সঙ্গে আমার কিছু পরামর্শ রয়েছে ; ভাড়ার ব্যাপার পরে আলোচনা করা যাবে।

দাদু এই সময় ধীরে ধীরে উঠে শৌচাগারে বা অন্যত্র কোথায় গেলেন। দূর্ব্বা চেয়ে দেখলো, পরে বলল,

—পরামর্শ কিছু নেই—আপনার কথা আমি শুনেছি—আপনার বাড়ীতে গৃহিণী হয়ে যেতে পারলে আমি খুশীই হতাম—কিন্তু পারলাম না—আমি এখন সিনেমা আর্টিষ্ট—নাম লিখিয়ে এলাম ; এখন কি আমায় আপনি সহ্য করতে পারবেন ! নিশ্চয় না। তার থেকে শান্ত-সুবোধ কোনো মেয়েকে বিয়ে করুন গিয়ে—ঘর সংসার ভালই চলবে।

গোবিন্দ ওর মুখ পানে চেয়ে রয়েছে ; দূর্ব্বা একটু হেসে আবার বলল,—দেখছেন কি ? লক্ষপতিরা আমায় মোটরে করে বাড়ী পৌছে দিয়ে যায়, সেকি গোবিন্দবাবুর বাড়ীর গৃহিণী হবার জন্য ? ও-সব বায়নাক্কা ছাড়ুন—রসিদ নিয়ে আসুন গিয়ে—বাড়ী তো কাছেই ; যান।

যেন হুকুম ! গোবিন্দ কি বলবে, ঠিক করতে পারছে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে। চিণ্ময় সেই যে ষ্টুডিও থেকে বের হয়েছে

এখন অবধি একটাও কথা বলেনি। নিতান্ত নির্ব্বোধের মতই দূর্ব্বাকে দেখছে, আর তার কথা শুনছে এতক্ষণ। সেই বলল আস্তে,—আপনার সঙ্গে পরিচয় নেই গোবিন্দবাবু, কিছু মনে করবেন না। মানুষের দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে কাউকে এভাবে অপমান করা অনুচিত!

—অপমান করা!—গোবিন্দর কথা ফুটলো—আমি ওকে বিয়ে করে ঘরের লক্ষ্মী করতে চাইছি—আর আপনি বলেন অপমান করা! জানেন, বহুদিন আগে ওদের আমি রাস্তায় বের করে দিতে পারতাম! তখন কোথায় ছিলেন আপনি আর কোথায় ছিল সিনেমাওয়ালা?

—ধন্যবাদ যে বার করেননি, কিন্তু উদ্দেশ্যটা আপনার মহৎ নয়—অত্যন্ত কদর্য্য!

—কদর্য্য! বিয়ে করতে চাইলে কদর্য্য হয় নাকি?

—আপনার কোন্ যোগ্যতাটা আছে ওকে বিয়ে করবার?

—তোমারই বা কি আছে, শুনি? ছেঁড়া পাঞ্জাবী বদ্লাবার সামর্থ্য নেই। তোমার মতন তিন গণ্ডা বি, এ, আমার চাকর—জানো! কুড়ি টাকায় অমন বি, এ, মেলে আজকাল। আর স্বাস্থ্য? এস দেখি পাঞ্জায়!

বন্য বা বর্ব্বর জগতে নারী নিয়ে এরকম ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়, ঠিক এই রকম শারীরিক শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ, কিন্তু সভ্য মানুষের জগতে এ ব্যাপার নিতান্তই অমানুষিক। দূর্ব্বা বিরক্ত হয়ে বলল,

—থামো চিণ্ময়দা—পাথরে ঘাস গজায় না।—বলে সে গোবিন্দর পানে তাকালো—বলল,—আপনি আমাদের পরম হিতৈষী বন্ধু, জানি; আমার রূপলাবণ্যের লোভে দীর্ঘকাল এ বাড়ীতে আমাদের থাকতে দিয়েছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ—কিন্তু—একটু থামলো দূর্ব্বা···কিন্তু বিয়ে আমায় করবার বাসনা আপনার অকস্মাৎ গজালো কেন, বলতে পারেন?

—অকস্মাৎ মানে? বাসনা আমার অনেক দিনের—কথাটা বলতেই যা দেরী হোল—বলবার সুযোগ খুঁজছিলাম···

—বেশ, পাঁচমাসের ভাড়া বাকী ফেলে সেই সুযোগটা যদি করে থাকেন তো ভুল হয়েছে। টাকা আমি এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি—তারপর কথা হবে—ঋণী থেকে কোনো কথা আর কইতে চাই না।

—ঋণী কেন মনে করছো ? এ বাড়ী তোমারই। এই বাড়ী এবং আরও তুখানা বাড়ী আর নগদটাকাও কিছু আমি দেব তোমায় বিয়ের সময়—

—কিন্তু আরেকটা সর্ত্ত আছে। আমি সিনেমায় অভিনয় করবো ; যখন ইচ্ছে যেখানে খুশী যাব—যার তার সঙ্গে বেড়াব—যে কদিন আপনার বাড়ীতে থাকবো, সেই কদিন হব আপনার গৃহিণী ; পারবেন সহ্য করতে ?

—বিয়ের পর আবার ওসব কেউ করে নাকি ? ওতে কেউ কি রাজী হয় ?

—যিনি রাজী হবেন, তাকেই তাহলে বিয়ে করতে হবে।

পূরো আধমিনিট দূর্ব্বার মুখের পানে চেয়ে রইল গোবিন্দ। তারপর বলল—সিনেমায় যায় লোকে টাকা রোজগার করতে ; তুমি কি জন্য যাবে ? তোমার তো টাকার অভাব থাকবে না ?

—যাব সখের জন্য, সুখের জন্য, সৌখীনতার জন্য—টাকা ছাড়াও মানুষের আরো অনেক কিছুই দরকার—যেমন আমি টাকা নই, টাকা নেইও আমার, তবু আপনি আমার জন্য কী না করছেন ?

—আমি ভদ্রসমাজে বাস করি দূর্ব্বা—তোমার সর্ত্ত মেনে নেওয়া চলে না।

—বেশ,—আপনি রসিদ নিয়ে এসে টাকা নিন, তারপর যে-সমাজে ইচ্ছে বাস করুন গে। আপনার কাছে ঋণী আমি থাকতে চাইনে।

বল্লেই চলে গেল দূর্ব্বা সে-ঘরের বাইরে। গোবিন্দ কিছুক্ষণ থেমে

রইল। চিণ্ময় ইতিমধ্যে আর কিছু করবার মত না পেয়ে একটা জলচৌকীতে বসে পড়েছে—একখানা পুঁথির পাতা ওল্টাচ্ছে।

—আপনি কি এই সমস্ত সর্ত্তে রাজি হবেন?—গোবিন্দ শুধুলো।

—কিসের সর্ত্ত? চিণ্ময় বিস্ময়ের চোখে তাকালো।

—দূর্ব্বা যা বলল—বিয়ে করার পর ওকে ঐ সব করতে দেবেন আপনি?

—দূর্ব্বাকে আমি বিয়ে করবো, কে বলল আপনাকে? আশ্চর্য্য!

—ও, আপনি তাহলে দূর্ব্বার জন্যে ঘুরছেন না—এমনিই আসছেন? কিন্তু দাদুর কাছে শুনলাম, আপনি সিনেমার লোক নন, ভদ্রঘরের ছেলে, কোথায় চাকরী করেন?

—চাকরী করি না—দূর্ব্বার জন্যই ঘুরছি এখানে, তবে তাকে বিয়ে করবার জন্য নয়—তাকে ভালবাসার জন্য—

—মানে…?

—মানে—চিণ্ময় একটু থেমে বলল, বিয়ে না করেও ভালবাসা যায়, এটা আপনাকে বোঝানো শক্ত—

—সে আবার কি রকম ভালবাসা—তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইল গোবিন্দ!

—কামগন্ধহীন—উত্তর দিল চিণ্ময়—যে ভালবাসা ভালবাসার উর্দ্ধে, যেখানে নারী রক্তমাংসে গঠিত জীব নয়, জীবনদায়িনী অমৃত, যেখানে দেহটাকে বন্দী করা লক্ষ্য নয়—লক্ষ্য প্রেমের মুক্তি…যেখানে নারী মূর্ত্তিমতী বাসনা নয়, অমূর্ত্ত্য সত্ত্বামাত্র…

—থামো চিণ্ময়দা—দূর্ব্বা ধমক দিল বাইর থেকে—উলুবনে মুক্তো ছড়াচ্চো। 'শুনুন গোবিন্দবাবু—আমাদের ভালবাসা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না; ওটা কাউকে বৃথা বোঝানো যায় না। আর—আমায় বিয়ে করলে লাভের চাইতে আপনার লোকশান অনেক বেশী হবে, তার থেকে বন্ধুত্ব আছে, এই ভালো—বুঝলেন। আমি নামকরা ফিল্মষ্টার হব—নিত্য নূতন

ভঙ্গীতে আমার ছবি বেরুবে খবরের কাগজে—রূপালী পর্দ্দায় আমায় দেখে লোক শুধু অবাক নয়, অজ্ঞান হয়ে যাবে—আর আপনি সে সব দেখে লোকের কাছে বুক ফুলিয়ে বলবেন, চিত্রতারকা দূর্ব্বার সঙ্গে আপনার কতখানা সম্বন্ধ, কেমন নিবিড়, আর নির্ম্মম আর নৈর্ব্যক্তিক···

গোবিন্দ তো চেয়ে আছেই, চিণ্ময়ও চেয়ে আছে দূর্ব্বার দিকে। কথার শেষটার কিছুই বুঝতে পারেনি গোবিন্দ। হাসছে দূর্ব্বা—সেই হাসি রোগটা ওর সারলো না—হেসেই বল্ল,—রসিদটা নিয়ে আসুন—চা খাবেন এখানেই, আর আপনি যদি আমার উপর নির্ভর করেন তো আপনার জন্য বৌ আমি যোগাড় করে দেব—

—কোথায় ?

—কাছেই—পারুলের দিদি শীলাকে বিয়ে করতে রাজি আছেন আপনি ?

—শীলা তো বিধবা !

—হ্যাঁ—হিঃ হিঃ করে হেসে দিল দূর্ব্বা—বিধবাই তো চান আপনি !

কথটার অসামঞ্জস্য এবং অস্থান-প্রকাশ এতক্ষণে মাথায় ঢুকলো গোবিন্দর,—বলল—শীলার জন্য কাঁদছিনে আমি···

—এতক্ষণে সত্যি বললেন। বিয়ের যোগ্য কনের জন্য ভাবছেন না আপনি, ভাবছেন দূর্ব্বার দেহখানা আয়ত্ত করবার জন্য—কিন্তু জানেন তো, মন আয়ত্ত না হলে দেহও আয়ত্ত হয় না—

—তোমার মনকেও আমি আয়ত্ত করতে পারবো—

—পারবেন না—গয়না কাপড় দিয়ে, শারীরিক সামর্থ্য দিয়ে যে-মন জয় করা যায়, সে-মন আমার নেই—আমার মনটা কি জানেন ?

-কি রকম ?—গোবিন্দর কথাটায় যেন বিদ্রূপ ধ্বনিত হচ্ছে—মুনি ঋষির মতন ?

—না—হাসলো দুর্ব্বা আবার মৃদু—মুনিঋষির মনও জয় করা যায়, তার পন্থা আছে—ঋষিরা যেখানে থাকেন, আমার মনটা হচ্ছে সেই দুর্গম গহন অরণ্য—রোদন সেখানে একান্ত নিষ্ফল,—ধন দৌলত কোন কাজে লাগে না—শারীরিক শক্তি অকেজো—সেখানে মৃগয়া করতে যে অস্ত্র দরকার তা আপনার নেই···

—কি সেটা? পাশুপৎ?—আবার বিদ্রূপ করলো গোবিন্দ—

—না—পাশুপতের অধিকারী পশুপতির মন চাই—যে বিষ খায় আর লোককে অমৃত দেয়—যার কিছু নেই আছে শুধু বৈরাগ্য—কিন্তু থাক—

আপনাকে এসব বলে লাভ নেই—আমি এখন ফিল্মষ্টার, আকাশের অনেক উপরে বাস করি—আর আপনি মাটির কাদায়। অনর্থক হাত বাড়িয়ে হাস্যস্পদ হবেন না—যান, রসিদ আছে তো?

—রসিদটার জন্য এত ভাবনা কেন দুর্ব্বা—টাকা দিতে হয়, পরে দিও। আমি তো তোমার নামে নালিশ করতে যাচ্ছি না···

—টাকাটা হাতে রয়েছে, দিয়ে ফেললেই কাজ চুকে যায়—বুঝলেন। আবার হয়তো অন্য কাজে খরচ হয়ে যেতে পারে—তা ছাড়া, আপনি টাকা পেলেই বিশ্বাস করবেন যে আমি ফিল্মষ্টার হয়েছি!

—বিশ্বাস করছি আমি—কিন্তু তুমি মনে রেখো, আমি ও-লাইনে তোমায় যেতে দেব না—তোমাকে ফেরাবই—নইলে আমার বাবা···

গোবিন্দ অকস্মাৎ উঠে চলে গেল। চিণ্ময় অবাক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দুর্ব্বা আবার হাসলে—বললো আস্তে,

—আরেকটা শত্রু হয়তো বাড়লো চিণুদা—মনে রেখো!

—এ বাড়ী ছেড়ে দাও দুর্ব্বা—চলো, দাদুকে নিয়ে আমরা দমদমে, না হয় হাওড়ার ওদিকে বাসা করিগে···

—না—অত সহজে এ বাড়ী ছাড়তে চাইনে চিণুদা—দাদু যতক্ষণ আছেন তাঁর পুঁথীর কবরে—ততক্ষণ অন্ততঃ ছাড়া বড্ড কঠিন···

—হুঁ, চিণ্ময় অসংখ্য পুস্তকরাশির দিকে চেয়ে শুধু 'হুঁ' বলল এবং দেখলো, দূর্ব্বা ঘরের বাইরে গিয়ে দাদুর হাতে জল ঢেলে দিচ্ছে। মুখ হাত ধুয়ে বৃদ্ধ এসে বসলেন আবার খাটে। বললেন,

—গোবিন্দ বড্ড জেদী লোক দাদু - তোমরা কিন্তু সাবধানে থেকো। বছর কয়েক পূর্ব্বে ও ছিল রীতিমত গুণ্ডা···

—হুঁ—চিণ্ময় আবার হুঁ দিল একটা! হাজার টাকার নোটগুলো ট্যাঁকে শুড়শুড়ি দিচ্ছে - সেগুলো বের করে গুণে দাদুর মাথার বালিশের নীচে যেমন রাখতে যাবে, দাদু যেন চীৎকার করে উঠলেন—

উহুঁ—না দাদু—না, টাকা পয়সা এখানে নয় - ও তোমরা রাখ গিয়ে—জয়গুরু, জয়গুরু! নমস্কার করলেন হাত তুলে। চিণ্ময় যেন অপরাধী ভাবছে নিজেকে, কিন্তু কেন? টাকা না হলে মানুষের জীবন একান্ত অচল, এ'তো শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও এই বৃদ্ধ আজো সে কথা বোঝেন নি? 'অর্থম্ অনর্থম' যিনি বলেছেন—তিনি একে অনর্থ-ই বলেছেন—'অপ্রয়োজনীয়' বলেননি তো! চিণ্ময় একটু সরে এসে বলল,

—টাকা না হলে জীবন একান্ত অচল দাদু!

—হ্যাঁ—মানুষের জীবন—মানুষ যেদিন থেকে বিনিময় বিদ্যা শিখেছে—সেইদিন থেকেই টাকার জালে সে বন্দী—জীবজন্তুরা ও-বন্ধন অস্বীকার করতে পারে।

—তাদের মধ্যেও খাদ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে দাদু···চিণ্ময় তর্ক করতে চাইল।

—হ্যাঁ, শুধু খাদ্য নিয়ে—সেটা জৈব প্রেরণা যে দাদু—তারা তো জীবের উর্দ্ধে নয়। কিন্তু মানুষ জীব এবং জীবাত্মা। আত্মা তাদের

মধ্যেও রয়েছে কিন্তু আত্মজ্ঞান তাদের নেই—মানুষ সেই পরম জ্ঞানে ধনী—অন্য ধন তার কাছে অকিঞ্চিৎকর হওয়া উচিৎ···

চিণ্ময় অন্য আর কিছু না বলে টাকা নিয়ে চলে এল।

অনেকক্ষণ পরামর্শ হোল কাটুর সঙ্গে বরুণের ; বরুণেরই বাড়ীতে বসে চলছিল এই যুক্তি—দুমর বিকাল বেলা। মায়া নামক যে মেয়েটি সেদিন গিয়েছিল চাকরী খুঁজতে, তাকেই গতকাল ওরা কাজ দেবে বলে কনট্রাক্ট করে এসেছে—কিছু আগামী টাকাও দিয়ে এসেছে ; রঞ্জাবতী নাটকে দুটি হিরোয়িন আছে, এক রাজকুমারী অতসী—অন্যটি যুবরাজ মৈনাকের বিবাহিতা পত্নী বিতুলা। দূর্ব্বাকে অতসীর ভূমিকায় নামানো ঠিক হয়ে গেছে—মায়াকে বিতুলার ভূমিকা দেওয়া হবে। অন্যান্য চরিত্র অভিনয় করবার জন্য লোকের অভাব হবে না—মানে,—নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী আর ওরা নিতে চায় না—দু' একজন সখী বা বয়স্য যে কোন-লোককে দিয়েই চলতে পারে।

দূর্ব্বা সেদিন বলেছে, 'গল্পটা বাজে' ; কাটু এই কথাটা যেন ভুলতেই পারছিল না। যদিও সে তখনকার মত রাগ সামলে ভদ্র ব্যবহারই করেছিল দূর্ব্বার সঙ্গে, তবু মনের ঝাল তার মেটেনি। সেই বলল,

—ওর বিষ দাঁত ভেঙ্গে ঢোঁরা সাপ না করা পর্য্যন্ত নিদ্রা নেই বরুণ!

—অবশ্য, সেই জন্যই তো এতো কাণ্ড। বরুণও সায় দিল কথাটায়; কিন্তু হেসে বলল—তোমার গল্পটা সত্যি খুব উঁচু দরের নয় কাটু—সত্যিই নয়।

—নিশ্চয় উঁচু দরের। সিনেমার গল্প এর থেকে ভাল হতে পারে না বরুণ। জানো—ওর রহস্য রয়েছে—গল্পটা একজন শক্তিশালী নতুন লেখকের—

—মেরে দিলে ?

—হ্যাঁ—নইলে কাটু কোনদিন ইতিহাসের গল্প লিখবে, এ কি সম্ভব ? আমার বাবা কখনো ইতিহাস পড়েনি—হাসতে লাগলো কাটুবাবু !

—সে লোকটার কোনো প্রমাণ নেই তো যে গল্পটা তার ?—বরুণ হেসে শুধুলো !

—আরে রামচন্দ্র ! শোন, একজন লেখক গত শীতকালে আমার নাম সংগ্রহ করে বাড়ীতে দেখা করলো আমার সঙ্গে—বাড়ী মানে, আমার সেই ফ্ল্যাটে।

—তারপর ?

—যখন সে গল্পটা শোনালো, তখনই বুঝলাম, সিনেমায় এই রকম গল্পই দরকার - কিন্তু লোকটার তখন জ্বর।

—কৃপা করে তাকে ঘরেই ঠাঁই দিলে ?

—দিলাম রাতটার মত। কিন্তু সকালেই দেখি, সারা গায়ে বসন্ত বেরিয়েছে। প্রশ্ন করে জানলাম—আত্মীয়ের মধ্যে তার আছে এক মাসী - হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম—সেখান থেকেই স্বর্গে গেল—

—স্বর্গেই গেছে তো, নাকি তোমার বাড়ীতেই রয়েছে ভূত হয়ে ? প্রশ্নটার সঙ্গে—হাসলো বরুণ !

—স্বর্গে যাবার খবরটা আমায় হাসপাতাল থেকেই দিয়েছিল—তখন আমি 'সতীশ্রী' স্ক্রিপখানা এডিট করছিলাম। - যাক—এ গল্প সিনেমার সম্পূর্ণ উপযোগী—শুধু দু একটা জায়গায় কিছু দুর্ব্বল আছে।

—মানে, অসামঞ্জস্য আছে বলছো তো ? আমার মনে হয়, প্লটখানা ভাল, তবে বিষয়টা ফোটে নি—বেশতো, ঐ চিন্ময়কে দিয়ে লিখিয়ে নাও—ওর লেখার হাত আছে—সেদিন যা শুনলাম—ভালই লেখে মনে হোল !

—হ্যাঁ—ওকে দিয়েই সব ঠিক করিয়ে নিচ্ছি—আচ্ছা, ঐ লেখকটার সঙ্গে দুর্ব্বার কি সম্পর্ক, ঠিক বোঝা গেল না তো ?

—ভালবাসার সম্পর্ক—বরুণ জবাব দিল।

—বিয়ে নিশ্চয় হয়নি—সীঁথিতে সিঁন্দুর নেই ; হবে হয়তো ঐ ছোকরার সঙ্গে !

—তার অনেক দেরী আছে—বলে বরুণ গম্ভীর হাসলো—চল না, তোমার নাটকখানা নিয়ে আলোচনা করে আসা যাক ওর সঙ্গে !

—বেশ তো। বলে তৎক্ষণাৎ সায় দিল কাটুবাবু।

অতঃপর বরুণ পোষাক বদলবার জন্য উপরে উঠে গেল। সুবর্ণা তেতালার বারন্দায় বসে আছে—হাতে একটা কালো রংএর বড় খাম। বৈকালিক প্রসাধন শেষ হয়েছে তার—হয়তো বেরুবে কোথাও। বরুণকে দেখে শুধুলো—কোথায় যোগাড় করলে আবার এটাকে ? খামের ভেতরের ছবি তিনখানা বের করে দেখালো সে। বরুণ বুঝতে পারলো, তার ব্রীফ কেসের ভেতর থেকে দুর্ব্বার ফটোগুলো বের করে ও দেখেছে। বলল,

—আমাদের বইএব নায়িকা হবে···অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে বলল সে, কিন্তু এই ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতা সুবর্ণার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ালো না—বলল,

—কোন বাজারে বাড়ী ?

—বাজারে নয়—ভদ্রলোকের মেয়ে !

— বলো কি ? বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয় না তো ?

—হয়নি—বরুণ সাহেবী পোষাক পরতে আরম্ভ করলো !

—হয়নি তো সিনেমায় আসে কোন্ সাহসে ? ভদ্রলোকের মেয়ে বলছো !

—কেন ?

—ছেলেপিলে হয়ে গেলে পিতৃত্বটা কার ঘাড়ে চাপাবে ?

—তুমি বড্ড—অভদ্র হয়ে উঠেছো স্থবর্ণা—বরুণের স্বরটা একটু কড়া !

—খামোখা আমার খুকীর একটা অংশীদার জুটবে, এটা আমি চাইনে, বুঝলে ! তোমার আর যা-ইচ্ছে করতে পার, ঐটা বাদ···

—খুকীর অংশীদার ! বরুণ যেন গর্জন ছাড়লো একটা—কিন্তু তৎক্ষণাৎ স্বরটা একেবারে খাদে নেমে গেল ওর—গ্যালিশ আঁটতে আঁটতে বলল,

—তবু ভাল যে খুকীর সম্বন্ধে তোমার একটা চিন্তা আছে—কিন্তু থাক, তার বিষয় তোমার আর ভেবে কাজ নেই—ক্লাবে যাবে না ?

—যাব বই কি—তুমি যদি সিনেমা-আর্টিষ্টের বাড়ী যেতে পার, তাহলে আমিও নিশ্চয় ক্লাবে যেতে পারি—স্থবর্ণা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।

—আমি তো মানা করছি নে—কারও স্বাধীনতায় হাত দিইনে আমি !

—ধন্যবাদ ! হাত আমারও দেবার ইচ্ছে নেই—তবে মেয়েটা যখন জন্মেছে···

—মেয়ে সম্বন্ধে কোনো কথা তুমি বলো না স্থবর্ণা, ও তোমার কেউ নয় !

—গাইরি ! স্থবর্ণার বিদ্রূপটা যেন অত্যন্ত অভদ্র এবং অশ্লীল শোনাল, তাছাড়া পুরুষালী ! বরুণ অতি মাত্রায় বিরক্ত হয়ে বলল,

—স্থবর্ণা, তোমার পথে তুমি চলছো, আমার পথে আমি—মাঝে অকারণ ঝড় তুফান আনবার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। কোথায় যাচ্ছ, যাও—যখন ইচ্ছে যাবে—যখন খুসী ফিরবে, আমি তোমায় কোনো প্রশ্ন পর্য্যন্ত করিনে—আশা করি, আমার সম্বন্ধেও তুমি অনুরূপ ব্যবহার করবে—বরুণ পোষাক পরতে পরতেই বেরিয়ে গেল।

স্থবর্ণা চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ—জানালাপথে চেয়ে দেখলো,

বাগানে ঠেলা গাড়ীতে খুকী—বরুণ বেরুবার পথে তাকে কোলে নিয়ে খানিক আদর করলো—তারপর আবার গাড়ীতে বসিয়ে দিয়ে নিজের গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে গেল। সুবর্ণাও বেরুবে এবার।

কালো খামটার ভেতর ছবি তিনখানা রাখতে গিয়ে আর একবার দেখল। ছবিতে মানুষকে যতখানা সুন্দর দেখায়, সত্যি কি আর সে তত-খানি সুন্দর? না তো। ওরা মেকআপ করে, রঙ মেখে ছবি তোলায়, নইলে গায়ের চামড়া আর সত্যি এতো মসৃণ হতে হয় না। ঠোঁটের গড়নটা—হ্যাঁ—এ রকম ধনুকের মতন ঠোঁট কম দেখা যায়—'সেক্স এ্যাপিলং!' না, কি রকম যেন দেবী-দেবী ভাব—দূরছাই! সিনেমার অভিনেত্রী, তার আবার দেবী-ভাব।

সুবর্ণা বারান্দা থেকে ঘরে এল ছবি কখানা নিয়ে। ছোট টেবিলটায় বরুণের, সুবর্ণার এবং খুকুর ছবি সাজানো রয়েছে। খুকীর ছবি বিশ-পঁচিশ খানা—বরুণের স্বহস্তে তোলা—কিন্তু সুবর্ণার মাত্র দুটো, একখানা বিয়ের সময়কার, আরেকখানা সে নিজেই তুলিয়েছিল—'একলা ছবি।' কিন্তু ঐটাই ভাল ছবি; সুবর্ণা ফ্রেমে বাঁধানো সেই ছবিটার পাশে দূর্ব্বার আ-বাঁধা ছবিটা রেখে তুলনা করতে চাইল-"দামী ফুলদানীতে সাজানো মরসুমী ফুলের পাশে যেন সদ্য ফোটা শ্বেত পদ্ম—" কিন্তু এ রকম তুলনা তার মনের অবচেতন স্তরে থাকলেও সে সাধারণভাবে ভাবলো—ফ্রেমে বাঁধানো ছবিখানা সম্রাজ্ঞীর আর ও-ছবিটা যেন হতদরিদ্র ব্যক্তির কন্যার, যার পানে সম্রাটের নজর পড়েছে—কিম্বা, ও কোনো মন্দিরের দেবদাসী, সম্রাট দেবদর্শনে গিয়ে ওকে দেখে এসেছে: কিন্তু এ সব তুলনা করে লাভ কি? মেয়েটা সুন্দরী, অস্বীকার করবার উপায় নাই সুবর্ণার—কিন্তু ছবি দেখে স্থির সিদ্ধান্ত করা উচিৎ নয়; সুবর্ণা ওকে চোখে দেখবে।

যে-কোনদিন স্টুডিওতে গেলেই দেখতে পাবে সুবর্ণা। কিন্তু কি

দরকার? ব্যাটাছেলের মোহ, ও বেশিদিন টেঁকে না। এই তিনবছরে আরো কতকি দেখলো সুবর্ণা—। যতদিন মোহ আছে, রূপ, যৌবন, অর্থ আছে, মিটিয়ে নিক বরুণ তার খেয়াল; সুবর্ণা কেন মিছে মাথা ঘামাতে যায়! শাড়ীখানা বদল করে সুবর্ণা নিজে গাড়ী চালিয়ে ক্লাব-এ চলে গেল চৌরঙ্গীতে!

সুবর্ণা এখানে সম্মানিতা সভ্যা;—ধনীর কন্যা এবং ধনীর গৃহিণী ও; আর ধন বস্তুটাকে সম্মান না করে, এমন লোক বিরল এই পৃথিবীতে আজ। গাড়ী থেকে নেমে সুবর্ণা ক্লাবরুমে এসে ঢুকলো, অমনি ডজন খানেক মেয়ে ওকে সম্বর্দ্ধনা জানালো—আয়, এসো, আসুন—বাংলায়। ইংরাজির বদলে ওরা ইচ্ছে করে এখন বাংলায় কথা বলা চালাচ্ছে; কারণ, কিছু একটা নুতন না করলে ওদের মনে উত্তেজনা আসে না। ছয়মাস পূর্ব্বেও ওদের মধ্যে কেউ বাংলা কথা বললে, তাকে ওরা অপাংক্তেয় মনে করতো—দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সুবর্ণারই প্রস্তাবক্রমে এই ভাষাগত পরিবর্ত্তন। ভাবগত পরিবর্ত্তনও হয়েছে—যথা, ইংরাজি 'টেমপেষ্ট' অভিনয় না করে ওঁরা বাংলা 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয় করলো। এবার হবে অন্য একখানা বাংলা নাটক নাম 'সতীশ্রী।' ওদের উইমেন্স ক্লাবে এ বছর নাকি দুর্গাপূজা করা হবে—আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই; এই রকম উত্তেজনার সৃষ্টি না করে ওরা বাঁচতে পারে না। সিনেমায় ঐ সতীশ্রী বইখানা তোলা হয়েছিল, কিন্তু ভাল হয়নি।

সুবর্ণা সেই ছবিখানা দেখে এসে দিনকয়েক আগে মত প্রকাশ করলো,

—পৃথিবীর সেরা অসতীদের দিয়ে কি সতীশ্রীর অভিনয় কখনো হতে পারে? আমরা সব সতীকন্যারা এখানে অভিনয় করবো সতীশ্রী। প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ পাশ হয়ে গেল, কারণ সুবর্ণাই এখানে ওসব ব্যাপারের পরিচালয়িত্রী। অতঃপর সুবর্ণা সেইদিনই দ্বিতীয় প্রস্তাব করেছিল—ইংরাজি 'ক্লাব নাম' বদলে বাংলা কিছু নাম দিতে হবে। কিন্তু অনেক

চিন্তা করেও মনোমত বাংলা নাম এখনো বের হয় নি, তাই নামটা আজও ইংরাজি রয়েছে। অবশ্য নামের জন্য এরা ভাবছেন সবাই।

আজ সুবর্ণা আসবার সঙ্গে সঙ্গে তার অভ্যর্থনাটা বেশি জোরাল হোল। কারণটা কি জানবার জন্য সুবর্ণা চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল একটি নবাগতা তরুণীকে। ক্লাবের সেক্রেটারী পরিচয় করিয়ে দিলেন—

মিসেস মায়া সেন বি, এ, আমাদের সতীশ্রী নাটকে উনিই নর্ত্তকী দিগঙ্গনার ভূমিকায় নামছেন—

নমস্কার আদান প্রদান হোল উভয়ের। সুবর্ণা বেশ খুসী হোল মেয়েটিকে দেখে—সুন্দরী নিশ্চয়ই, ফিগারটাও চমৎকার, কিন্তু মুখের গঠন তত সুন্দর নয় অর্থাৎ সুবর্ণার থেকে সুন্দর নয়—অতএব নিশ্চিন্ত! কিন্তু মনে পড়ে গেল, আজই একখানা ফটোতে একটা মুখ দেখে এসেছে সুবর্ণা; সে হয়ত সুবর্ণার থেকে সুন্দর। কে সে—কোথায় সে থাকে? এক্ষুনি তাকে একবার দেখতে পেলে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিত সুবর্ণা!

নাচগান আলাপ আলোচনার মধ্যে চা-পান ভোজনও হোল ওদের। রাত গভীর হয়ে আসছে; মায়া বাড়ী যাবে; তাকে পৌছে দেবার জন্য গাড়ী চাই। মায়ার পাড়ায় এদের কারো বাড়ী নয়, মুস্কিল---শেষটায় মায়া ট্যাক্সি করেই চলে যাবে—বলল।

সুবর্ণা ট্যাক্সিষ্টাণ্ড পর্য্যন্ত তার সঙ্গে আসতে আসতে শুধুলো—

—আর কি করেন আপনি?

—আরেকটা কাজ পেয়েছি—রঙ্গাবতী চিত্রালয়এ একটা ছবিতে নায়িকার পাঠ।

—রঙ্গাবতীর নায়িকা! সুবর্ণা বিস্মিত হোল যেন!

—হ্যাঁ—কেন? মায়া চাইল ওর পানে।

—না, কিছু না, কি বই তুলবে ওরা?

—রঞ্জাবতী! ওতে নাকি দুজন নায়িকা আছে, আরেকজন কাকে ওরা ঠিক করেছেন—

—ও—আচ্ছা আসুন! নমস্কার জানালে সুবর্ণা ওকে এবং ভেতরে চলে এল। ভাবতে লাগলো—তাহলে এই মেয়েটা নায়িকা নয়,—উপ-নায়িকা, ঐ ছবিরটা নায়িকা—ভাল!

কিন্তু কী দরকার এত সব ভেবে? সুবর্ণা বেশ আছে। বরুণের যা ইচ্ছে করুকগে—গোল্লায় যাক না সে, সুবর্ণার কি?

সুবর্ণা কিন্তু হেরে যাচ্ছে রূপযৌবনের এই তীব্র প্রতিযোগিতায়—ক্লাব-ঘরে আর না ঢুকে সুবর্ণা নিজের গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরলো। বরুণ তখনো ফেরেনি। খুকী দোলনায় ঘুমুচ্ছে। দেখলো সুবর্ণা, খুকী রূপকথার রাজকুমারী নয়, সুবর্ণারই খানিকটা অংশ—কিন্তু···বরুণ ফিরলো, গাড়ীর শব্দ পেল সুবর্ণা। সুবর্ণা শুয়ে পড়ল।

শেষে ঠিক হয়েছে যে 'রঞ্জাবতী' নাটকখানাই পর্দায় তোলা হবে, লেখকের নাম দেওয়া হবে না—সংলাপ রচয়িতা হিসাবে থাকবে চিণ্ময়ের নাম—কারণ সংলাপ তাকেই লিখতে হচ্ছে। রোজই কাটু-বাবু আর বরুণ গাড়ী চড়ে আসে দূর্ব্বার বাড়ীতে এবং চিণ্ময়কে নিয়ে সংলাপ রচনা চলে। ঘরখানার শ্রী-বদলে গেছে এই কদিনেই—মানে ঝেড়ে ঝুড়ে ওকে পরিষ্কার করা হয়েছে। আর ওদিকে চিণ্ময় তার টুইস্যনিটা ছেড়ে এখানে এসে বাস করবে কিনা—তাই নিয়ে জোর তর্ক চলছে দূর্ব্বার সঙ্গে। টুইশনি এখনো ছাড়েনি সে, পনের দিনের ছুটি নিয়েছে মাত্র।

দূর্ব্বা রাজীছিল না চিণ্ময়ের নাম ঐ নাটকে সংলাপ লেখক হিসাবে দিতে কারণ নাটকখানা ওর ভাল লাগেনি। ঐতিহাসিক পটভূমিকায়

লেখা নাটক কিন্তু ওতে বিস্তর অসামঞ্জস্য আছে, অবশ্য সিনেমার যোগ্য উত্তেজক উপাদানও আছে প্রচুর—আর কাটুবাবু ঐ কারণে ও বই নির্ব্বাচন করেছে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বরুণ রাজী করালো দূর্ব্বাকে এই সর্ত্তে যে—দূর্ব্বার পরামর্শ নিয়ে—চিণ্ময় যথেষ্ট পরিবর্ত্তন করতে পারবে গল্পের - পারিশ্রমিক হাজার টাকা।

বাইরের সেই ঘরটায় সবাই বসে ওরা—কাটু, বরুণ, মিহির এবং চিণ্ময় ; দূর্ব্বা মাঝে মাঝে এসে বসে—চা খাবারও তৈরী করে দেয় এবং আলোচনাতেও যোগদান করে—কিন্তু সে খুব বেশী সময়ের জন্য নয়—অথচ দূর্ব্বাকে বেশী সময় পাবার জন্যই ওরা দক্ষিণ কলকাতা থেকে অতখানা রাস্তা পেট্রল এবং সময় খরচ করে যায় আর অতটা রাত্রি অবধি থাকে। চার পাঁচ দিন কাজ চললো গল্পটা মোটামুটি কি দাঁড়াবে, ঠিক হয়ে গেল এবার দৃশ্য ভাগ করে সংলাপ রচনা করতে হবে। ওদিকে অভিনেত্রী এবং অভিনেতা নির্ব্বাচন চলছে—ওমেদারের দল সন্ধান করে করে—দূর্ব্বার সেই সাত নম্বরে সম্বুদ্ধ লেনের বাড়ী আবিষ্কার করে এখানেও হানা দিতে আরম্ভ করলো—তাদের কিছু একটা পার্ট দিতে হবে।

ওঃ কি যুগই পড়েছে—কত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে আসে, আর নাম-ঠিকানা-ফটো পরিচয় পত্র রেখে যায়, তার লেখাজোখা নেই। মস্ত একখানা একসারসাইজবুক ভরে ওঠলো প্রায়—কিন্তু ওদের কাউকেই যে নেওয়া হবে না, তা জানে দূর্ব্বা—তার মতন আশ্চর্য্য সুন্দরী কেউ যদি এসে পড়ে এই আশায় বরুণের দল কাউকে মানা করে না আসতে। কিন্তু বাড়ীটা প্রায় সিনেমা কোম্পানীর অফিস হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা মনে মনে বিরক্ত হচ্ছে, কিন্তু এমন ঘটবে সে জানতো না। চিণ্ময় এখন ঐ বারবাড়ীর ঘরটায় থাকে—তাই পাড়ার লোকের

ধারণা—চিণ্ময় দূর্ব্বার নিকট আত্মীয়, আর বরুণের দল আসে চিণ্ময়ের বই সিনেমার জন্য কিনতে। এইজন্য পাড়ার অনেকেই আবার দূর্ব্বাকে ধরেছে কাজের জন্য, সুটিং দেখাবার জন্য বা বিনাপয়সায় সিনেমা দেখাবার জন্য। দূর্ব্বা বেশ মুস্কিলে পড়েছে এই সব ব্যাপারে।

কিন্তু দাদু নির্ব্বিকার—তিনি যেমন তাঁর ঘরে আসীন ছিলেন, তেমনি আছেন; শুধু খবর জেনেছেন যে দূর্ব্বা অভিনয়ে যোগ দিচ্ছে এবং পারিশ্রমিক ভালই পাচ্ছে; চিণ্ময়ও এখানে এসে আছে, খায় এবং থাকে। গোবিন্দ সেই যে সেদিন গেছে আর আসিনি। তার পাওনা টাকাও নিয়ে যায়নি সে। কি মতলব করছে, কে জানে ?

কিন্তু জানা গেল—গোবিন্দ এই কদিন পাড়ার বহু মাতব্বর ব্যক্তিকে বলেছে যে বিপ্রদাস চৌধুরীর বিধবা নাতনী, অতবড় বংশের মেয়ে কিনা ফিল্মষ্টার হচ্ছে—পাড়ার লোকের বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু সহর কলকাতা—আপনাপন দৈনন্দিন জীবন নিয়ে মানুষ এখানে আজ রুদ্ধশ্বাস —রেশনের কিউ—কাপড়ের কণ্ট্রোল, বা আফিসে যাবার ভিড়, শুধু নয়—মনোবৃত্তির মালিন্য এ সবকে ছাড়িয়ে গেছে তাদের—তারা হাসে এবং জবাব দেয়—ভালই তো, পর্দায় নতুন একখানা মুখ দেখা যাবে। অর্থাৎ ও নিয়ে মাথা ঘামাবার কারো সময় যদি বা হয় তো দূর্ব্বার বিরুদ্ধে নয়—সাপক্ষেই! দু একজন বৃদ্ধ অবশ্য বললেন যে কাজটা অন্যায় করছে—দূর্ব্বা—পঞ্চতীর্থ মশায়ের বাধা দেওয়া উচিত—কিন্তু তাদের কথা এযুগে কেউ গ্রাহ্য করে না। জাতে পতিত বা ধোপানাপিত বন্ধ করে কলকাতায় কাউকে জব্দ করা সম্ভব নয়—অতএব গোবিন্দ আর কি করতে পারে ?

করতে সে অনেক কিছুই পারে—গুণ্ডা লেলিয়ে দিতে পারে, বাড়ী থেকে উঠে যাবার নোটিশ দিতে পারে····এবং আরো সাংঘাতিক···

দুর্ব্বাকে গুম করে···গোবিন্দ কথাটা ভাবতে ভাবতে থেমে গেল—না, ও বড় ফ্যাসাদ। অর্থবান হলেও গোবিন্দ অত্যন্ত ভীরু প্রকৃতির লোক। আদুরে মানুষ, এতোটুকু শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য তার অসহ্য! যদি···ধরা পড়ে যদি জেল হয় - যদি···না, গোবিন্দ ওপথে যাবে না। তার চেয়ে দুর্ব্বা সিনেমায় যোগদিক—তখন তো···তাকে লাভ করতে দরকার শুধু কিছু টাকার! গোবিন্দ সে টাকা যোগাতে পারবে—আয়রণ শেফ খুলে গোবিন্দ ব্যাঙ্কের পাশবই আর কোম্পানীর কাগজগুলো একবার দেখে নিল—নগদ টাকাই তার কয়েক লক্ষ! তারপর লোহার কারবারটা এখন খুব জোর চলছে—গোবিন্দ মুচকী হাসলো।

সন্ধ্যা হয়েছে—ভেতরে এসে গোবিন্দ তার শিল্কের পাঞ্জাবীখানা গায়ে দিল—সোনার বোতাম, সোনার শেকলে গাঁথা—কিন্তু বরুণের পাঞ্জাবীতে সেদিন হীরে দেখে এসেছে। হীরে বসান বোতাম নেই গোবিন্দর, তবে হীরের আংটি আছে একটা—দামী কমল হীরের। গোবিন্দ বের করে পরলো। খুব ভাল একটা সেণ্ট রুমালে এবং পাঞ্জাবীতে ঢেলে নিল খামিকটা—মণিব্যাগটা ভেতরের ফতুয়ার পকেটে ভরে ভাড়া আদায়ের রসিদটাও নিল তার সঙ্গে অবশ্য—বেরুলো গোবিন্দ ছড়ি হাতে। সামনেই পড়লো মেয়েটা—ষোল বছরে পড়তে যাচ্ছে—দিব্যি ঢলঢলে হয়ে উঠেছে—চঞ্চল হয়ে গেছে তার চোখ।

—কোথায় যাচ্ছ বাবা ?—প্রশ্ন করে বসলো!

—ভাড়াগুলো আদায় করে আনি—বলেই গোবিন্দ জোরে হেঁটে বেরিয়ে এল - যেন পালিয়ে এল। কিন্তু আজকালকার তুখড়মেয়ে—বাবার গায়ের গন্ধটা আর সাজ ওর দৃষ্টি এড়ালো না—মুচকী হাসলো মেয়েটা, পরক্ষণেই গম্ভীর—হয়ে গেল—এতোদিন পরে বাবা আবার বিয়ে করবে নাকি ?

না—এরকম কিছু শোনেনি সে—তবে বাবার যা স্বভাব তাতো আর বদলাবে না—থাকগে। নিজের কাজে মনোযোগ দিতে চেষ্টা করতে লাগলো সে—কিন্তু মানুষের মন বড্ড বিশ্রী বস্তু! কে জানে কখন ওর মনের মধ্যে নিজের বিয়ের চিন্তা এসে ঢুকেছে। কিন্তু বিয়ে সে যাকে করতে চায়—তার বাবাতো তাকে জামাই করতে চায় না—এই দুশ্চিন্তাটা মনের মধ্যে বাসা বাঁধলো—কি করবে? কিছু একটা করতে হবেই তাকে এবং অবিলম্বে। বাড়ী থেকে পালিয়েই যাবে নাকি?—না, অতটা সাহস হয় নি ওর এখনো। তবে যাকে নিয়ে কথা, সে ঐ কথাই বলে। বলে যে বাইরে কোথাও গিয়ে বিয়ে করে গোবিন্দকে সংবাদ দেওয়া যাবে—তখন গোবিন্দ আর করবে কি? বাধ্য হয়ে মেয়েকে ক্ষমা করে নেবে এবং জামাইকেও যথাযোগ্য আদর আপ্যায়ন করবে। কিন্তু মেয়েটা তার বাবাকে চেনে খুব, ভরসা পায়না সে—বাবা যদি তাড়িয়েই দেয় জন্মের মত!

যে-ছেলেটির সঙ্গে তার ভালবাসা, সে স্বজাতি তো নয়ই অধিকন্তু স্বচ্ছন্দ অবস্থার লোকও নয়—বিদ্যাও বেশি নয়—তবে রোজগার করে ভালই—সিনেমার ক্যামেরাম্যান।

গোবিন্দ বেরিয়ে পড়লো দুর্ব্বাদের বাড়ীর দিকে, দূর বেশি নয়, চার পাঁচ মিনিটের রাস্তা—কিন্তু এটুকু পথেই যার সঙ্গে দেখা হোল সেই তাকালো গোবিন্দর মুখপানে। ব্যাপার কি? গোবিন্দ বুঝতে পারে নি প্রথম, তারপর বুঝলো, তার পোষাকের আভিজাত্য এবং অঙ্গের সুরভি ওদের এই কৌতূহলের কারণ। আনন্দিতই হোল গোবিন্দ, নির্ব্বোধের যা কাজ! কিন্তু ঐ চেনা লোকটাকে পাড়ার যে দেখলো সেই মুচকী হাসলো!

সটান চলে এলো গোবিন্দ গোঁফে তা দিতে দিতে। চেহারাটা নিশ্চয়ই ভাল দেখাচ্ছে ওর—বরুণদের সঙ্গে ওকে আজ বেমানান দেখাবে না—ফুলো ফুলো গালে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে ঢুকলো ঘরে।

বড় টেবিলখানা ঘিরে বরুণ, কাটু, মিহির আর চিন্ময়—দূর্ব্বা নেই ওখানে। হয়তো ভেতরে আছে। গোবিন্দ তো আর বাইরের লোক নয়, সে আধমিনিট দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ভেতরে ঢুকলো

—দূর্ব্বা—দাদু !

এদের কেউ ওকে সম্বর্দ্ধনা বা অভ্যর্থনা কিছুই করলো না। আশ্চর্য্য ! ওরা ভাবে কি ? কতটাকা নিয়ে নেমেছে ওরা সিনেমা করতে ?' ক'লক্ষ টাকা মূলধন হলে সিনেমা করা যায় ? তিন লক্ষ, পাঁচলক্ষ, দশলক্ষ—গোবিন্দ করতে পারে—আছে তার টাকা ! কিন্তু···

দূর্ব্বাও বেরিয়ে এল—ও আপনি ? রসিদ এনেছেন ?

—রসিদটার জন্য এত তাগাদা কেন দিচ্ছ তুমি দূর্ব্বা ?

—কারণ, টাকাটা আপনাকে দিতে চাই—

—কিন্তু টাকা আদায় ছাড়া আমার অন্য কথাও তো থাকতে পারে ?

—না—দূর্ব্বা কিঞ্চিৎ কঠোর ভাবে বলল—অন্য আর কোনো কথা থাকতে পারে না—অন্য কথার জবাব আমি দিয়েছি !

—দাও নি—বিয়ের কথা নয়—আমার অন্য একটা প্রস্তাব আছে।

—অন্য কি প্রস্তাব আবার ? দূর্ব্বা গলা নামিয়ে শুধুলো !

—সিনেমায় যখন তুমি নামবেই, তখন পরের কোম্পানীতে কেন ? আমি টাকা দিচ্ছি তুমি ছবি তোলার ব্যবস্থা কর—

—বলেন কি ? সে যে অনেক টাকার ব্যাপার—দূর্ব্বা হাসলো !

—কত ? দুলাখ—পাঁচলাখ—আমি দেব।

বিস্মিত হতে গিয়েও দূর্ব্বা বিস্মিত হোল না খুব। টাকা গোবিন্দর আছে, এবং ভালই আছে এটা তার জানা—তবে সে টাকা যে দূর্ব্বার জন্য সিনেমাকোম্পানী গড়ে গোবিন্দ খরচ করতে চাইবে এ তার জানা ছিল না। দূর্ব্বা জবাব দেবার পূর্ব্বে একামনিট ভেবে নিল, তারপর বলল,

—সিনেমার ছবি করা খুব বড় ব্যাপার ; শুধু টাকা থাকলেই হয় না, ওটা জানতে বুঝতে অনেক সময় লাগে—ও কথা এখন থাক !

—না, গোবিন্দ আবদারের সুরে বলল, না দূর্ব্বা, থাকবে না। টাকা আমার, তুমি কোম্পানী খোল, বুদ্ধি তোমার—

—কিন্তু আমি এ বিষয়ে এখনো বুদ্ধ হয় নি—বলে হাসলো দূর্ব্বা।

—তুমি—তুমি ঠিক পারবে, তুমি আবার না পার কি ?

—ওটা শিখবার ব্যাপার আর শিখবার জন্যই যাচ্ছি আমি ওখানে। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করবো। আপনি যান দাদুর কাছে বসুন গে !

দূর্ব্বা চলে গেল রান্নাঘরে। আর অসীম আনন্দে গোবিন্দ আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ওখানেই প্রায় মিনিটখানেক। তারপর বেরিয়ে এল বসবার ঘরে।

দূর্ব্বা তার সঙ্গে পরামর্শ করবে বলেছে—এর থেকে আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে গোবিন্দর জীবনে ! পরামর্শ করবে, মানে রাজি হবে, আর রাজি হবে মানেই গোবিন্দ তাকে লাভ করতে পারবে ! অন্তরটা শিউরে শিউরে উঠছে গোবিন্দর। এই আনন্দের আস্বাদই ভূমানন্দ, আঃ ! গোবিন্দ বাইরের লোকগুলোকে তার সৌভাগ্য প্রসন্ন মুখ খানা দেখিয়ে যাবে একবার।

এসে ঢুকলো—বরুণ শুধু তাকাল ওর পানে। আর সকলেই স্ক্রিপ্ট নিয়ে ব্যস্ত। একখানা চেয়ারে বসল গোবিন্দ—বরুণকেই প্রশ্ন করলো,

—আচ্ছা স্যার, কি পরিমাণ টাকা লাগে একখানা ছবি করতে ?

—দু'লাখ, তিনলাখ, চারলাখ, থেকে বিশ ত্রিশ চল্লিশ লাখ পর্য্যন্ত, যেমন ছবি।

—আমি সাধারণ ভাল ছবির কথা বলছি। গোবিন্দ পুনরায় বলল।

—কেন ? ছবি তৈরী করতে চান নাকি আপনি ? বরুণ প্রতিপ্রশ্ন করলো।

—ব্যবসাদার মানুষ, বলা তো যায় না, কোনদিকে কখন ঝোঁক চাপে।

—শেয়ার মার্কেটে ঝোঁক আছে ? বরুণ শুধুলো।

—আজ্ঞে না—

—রেস এ ?

—না —আমার লোহালক্কড়ের কারবার।

—মদভাঙ এক আধটু ?

—এ সব প্রশ্ন করছেন কেন ? গোবিন্দ বোকার মত শুধুলো।

—ওসব না হলে সিনেমালাইনে আসা উচিৎ নয়—হাসলো বরুণ।

বরুণ কথাটা কাটিয়ে দিতে চায়, ঠিক সেই সময় দূর্ব্বা এসে ঢুকলো—কথাগুলো ও শুনেছে ঢুকবার সময়। হেসে বলল,

—ওসব না হলেও সিনেমালাইনে আসা যায়, বরুণবাবু, সেইটে প্রমাণ করবার জন্য আমি ঢুকতে যাচ্ছি—গোবিন্দবাবুকে আপনি একেবারে গাধা বানিয়ে দিচ্ছিলেন যে !

—ওঁর প্রশ্নটা খুব বুদ্ধিমানের মত হয়নি দেবি—বরুণ হেসে বলল।

—তা না হোক, আপনার জবাবটা অসত্য হবে, এ আমি পছন্দ করিনে।

—আমি ক্ষমা চাইছি—সত্যি এরকম জবাব দেওয়া উচিৎ হয়নি আমার।

—মাফ চাইতে হয় - ওঁর কাছে চান—কথাগুলো ওঁকেই বলেছেন।

বরুণ সত্যি মাফ চাইল গোবিন্দের কাছে, বলল, কিছু মনে করবেন না, এ লাইনে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নিয়ে নামতে হয়, এই কথাই বলছিলাম।

আনন্দের আমেজ লেগেছে গোবিন্দর মনে। দূর্ব্বা গোবিন্দের জন্য কোন্‌টা না করতে পারে !—গোবিন্দ জীবন দিতে প্রস্তুত থাকবে দূর্ব্বার জন্য—না, জীবন বড় মূল্যবান বস্তু—টাকাই সে দিতে পারে - দেবেও !

উৎসবটা খুবই জমেছে সুবর্ণাদের ক্লাবে। সতীশ্রী নাটকখানার মহড়া শেষ হয়েছে,—আজ তার অভিনয় রজনী। বিশিষ্ট বন্ধু বান্ধব সব নিমন্ত্রিত হয়েছে, আসছে সব—সুবর্ণা অনেক আগেই এসেছে, সেই এর পরিচালয়িত্রী। কিন্তু সেই মায়া নামক মেয়েটি এখনো এসে পৌছায়নি। তাকেই প্রথম নামতে হবে দিগঙ্গনার নৃত্য দেখবার জন্য। মায়া অবশ্য বলেই গেছে যে তার সুটিং আছে ষ্টুডিওতে—সেটা শেষ করে রাত্রি আটটার পর সে আসতে পারবে। সে-এসে পৌছালেই থিয়েটার আরম্ভ হতে পারে।

উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওরা রাস্তার পানে, কখন মায়া আসে। এত দেরী কেন হচ্ছে? বিরক্ত হয়ে সুবর্ণা টেলিফোন করলো ষ্টুডিওতে। কে একজন জানালো যে আরো আধঘণ্টা দেরী হবে সুটিং শেষ হতে। এদিকে যে তাহলে সুবর্ণাদের প্রোগ্রাম আপসেট হয়ে যায়! অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে সুবর্ণা তার সহকারিণী চিত্রাকে কয়েকটা কাজের ভার দিয়ে গাড়ী চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ষ্টুডিওর দিকে।

ষ্টুডিওতে এর আগে এসেছিল একদিন—কি একটা ছবির সুটিং দেখবার জন্য—কাজেই কোন অসুবিধা হোল না তার। গেটে গাড়ীখানা রেখে সটান গিয়ে ঢুকলো একেবারে ফ্লোরে—হটাৎ, যেখানে ছবি তোলা হচ্ছে।—ঢুকেই দেখতে পেল, রাজকুমারবেশী বরুণ বিতুলা-বেশিনী মায়াকে বলছে—চোখের জলের সমুদ্রে ডুবে মরলেও আমি সেই লোনা জলে নেমে তোমায় তুলতে যাব না বিতুলা, পথ ছাড়ো!

—যাও—বিতুলা সরে দাঁড়ালো—কিন্তু মনে রেখো, যে অগ্নিকণা আমার গর্ভে সে এই চোখের জলের সমুদ্র শুকিয়ে দিতে পারবে—কিন্তু তারপর···

—তারপর ?

—সেই হোমশিখাকে আর স্পর্শ করতে এসোনা—সে অধিকার আজ তুমি হারালে !

—আচ্ছা, আমার প্রয়োজন হবে না তাকে স্পর্শ করবার !

যুবরাজবেশী বরুণ গট্‌গট্‌ করে চলে গেল রাজপথের ওপর দৃষ্টির বাইরে—আর বিহুলাবেশিনী মায়ার চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলতে লাগলো ! ক্যামেরাম্যান কাছাকাছি এগিয়ে এসে বিহুলার ছবি তুললো। ডিরেকটার বলল—'কাট্'—দৃশ্যটুকু তোলা শেষ হোল।

এতক্ষণে মায়ার দৃষ্টি পড়লো একধারে দাঁড়িয়ে থাকা সুবর্ণার পানে। তাড়াতাড়ি কাছে এসে নমস্কার করে বলল,—চলুন—আজকার মত আমার হয়ে গেছে—আমি ডিরেক্টারকে বলে আসি।

সুবর্ণা দেখতে পেল, বরুণ ওদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে একখানা সোফায় বসে সিগরেট ধরালো। সুবর্ণাকে সে দেখতে পায়নি—কারণ ঘরখানা প্রকাণ্ড—তাতে রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের অংশ তৈরী করা হয়েছে এবং ফুলের টব আর গাছের ডালে প্রায় সবটা ভর্ত্তি। তাছাড়া চেয়ার টেবিল অসংখ্য এবং বহু লোক কাজ করছে একসঙ্গে—বহু দর্শকও দেখছে। সকলেই বলছে—গর্জাস হয়েছে দৃশ্যটা ! সুবর্ণা বুঝতে পারলো তার আসবার পূর্ব্বে অনেক দৃশ্যই তোলা হয়েছে এখানে আজ, মায়ার প্রেমের অভিনয়, মান অভিমান ইত্যাদি। কিন্তু বরুণ অত লোকের ভিড়ে এখনো তাকে দেখেনি ! দেখা আর দিতে চায় না সুবর্ণা - সে ধীরে ধীরে বাইরে চলে এল—ফ্লোরের। মায়াও বেরিয়ে এল ওদের কাছে বিদায় নিয়ে, গাড়ীতে ওঠলো।

চলছে গাড়ী—অকস্মাৎ সুবর্ণা প্রশ্ন করলো মায়াকে,—কত টাকা পাচ্ছেন আপনি ওখানে ?

—হাজার দুই দেবেন—সবটা পাব কিনা, জানি না ; মাত্র পাঁচশো পেয়েছি।

—পাবেন না, মনে করছেন কেন ?—ওরা কি ঠকাবে আপনাকে, মনে করছেন ?

—না—মায়া থতমত খেয়ে গেল—ঠিক তা নয়, টাকা জিনিষটা হাতে না এলে বিশ্বাস করা যায় না।

—কে কে আছেন আপনার সংসারে ?

—স্বামী, শাশুড়ী আর একটি ছোট দেবর—স্বামীর খুব অসুখ, তাঁর জন্যই আমায় একাজ নেওয়া। তাঁকে ভাল করতে হবে।

—কোথায় স্বামী আপনার ? এখানেই—মানে, কলকাতাতে ?

—না—এই টাকা পেয়েই তাঁকে আমি চেঞ্জে পাঠিয়েছি—চুনারে। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে যদি ভাল হন—তবেই···মায়ার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত করুণ।

—কি অসুখ তাঁর ?

—পেটের অসুখ—বড্ড ক্রনিক হয়ে গেছে—আমি কাছে থাকতে পারলাম না, কেমন যে আছেন—দু-তিন দিন চিঠি পাইনি।

—তাঁর কাছে কে আছেন ওখানে ?

—আমার শাশুড়ী—এখানে আছি দেওর আর আমি।

—কত বড় দেওর ?

—পনের বছরের—স্কুলে পড়ে—আপনাদের ক্লাবে আসবে হয়তো সে

সুবর্ণা আর কিছু প্রশ্ন করলো না অনেকক্ষণ। গাড়ীখানা জোরে চলছে—কালীঘাটের মন্দির—দেখা যায় না বড় বড় বাড়ীর আড়ালে কিন্তু সুবর্ণা দেখতে পেল—মায়া হাতজোড় করে নমস্কার করছে।

—মা কালীকে ?—সুবর্ণা শুধুলো।

—হ্যাঁ—কেন ?

—না—কিছু না—হাসলো সুবর্ণা, আর কিছু বললো না। মায়াও নিশ্চুপ বসে।

সুবর্ণা গাড়ী চালাতে চালাতে ভাবছে—অর্থের একান্ত প্রয়োজনেই মায়া বাইরে এসেছে—সাধারণ গৃহজীবনে ও সেবাপরায়ণা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বঙ্গবধূ। হয়তো স্বামী সোহাগিনী—সন্তান বৎসলা—কিন্তু সন্তান এখনও হয়নি ওর—সুবর্ণা চাইল মায়ার মুখপানে; কুমারী মেয়ের মত মুখ, সুন্দর, উজ্জ্বল, পবিত্র। ও কেন এল সিনেমা লাইনে? কিন্তু কেন এলো তা শুনেছে সুবর্ণা—অর্থনৈতিক কারণ!

—ছেলে মেয়ে কিছু হয়নি আপনার—না ?—প্রশ্ন করলো সুবর্ণা।

—না—আপনার ? প্রতিপ্রশ্ন করলো মায়া!

—একটি মেয়ে—বছর দুই এর—জবাব দিল সুবর্ণা—এবং আজই বোধ হয় প্রথম ভাবলো—তার একটা মেয়ে আছে এবং কেউ প্রশ্ন করলে সেটা বলতে হয়। কিন্তু কৈ—কেউ এ প্রশ্ন তো কোন দিন করেনি সুবর্ণাকে! মেয়েটা যে তার, একথা মনেই থাকে না ওর। ঐ ফুটফুটে যুঁইকুড়িটার ও মা নাকি—হ্যাঁ!

—কী দুষ্টু আর দামাল মেয়েটা—বাব্বা! অনর্থক কথাটা বললো সুবর্ণা—একান্ত অনর্থক—কারণ মায়া তো প্রশ্ন করেনি—কিন্তু এমনি অকারণ কথা বলার আস্বাদ আছে—অতি চমৎকার একটা আস্বাদ—অনুভব করছে সুবর্ণা।

—কোথায় রেখে এলেন তাকে - ওর বাবার কাছে ?

—না—থাকে আয়ার কাছে—বাবারই ভক্ত, আমায় সে ছুঁয়েই যায় না—চেনেই না শয়তানটা।

হাসছে মায়া কথাগুলো শুনতে শুনতে। এই মাত্র সে অভিনয়

করলে, মহাবীর—নায়ক রাজকুমারকে বলে এলো—তার গর্ভে আছে অগ্নিকণা—কিন্তু কৈ—মায়ার গর্ভ শূন্য—কোনদিন পূর্ণ হবে কি না, কে জানে? অসুস্থ স্বামীর মলিন মুখখানা মনে পড়ে গেল তার—কে জানে, কেমন আছে!

—ওকি! কাঁদছেন কেন আপনি?—সুবর্ণা অতি বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো মায়ার চোখের কোণায় জল দেখে। বিব্রত, লজ্জিত হয়ে উঠলো মায়া—সত্যি তার চোখে জল এসে গেছে; কিন্তু সুবর্ণা কি মনে করবে! ছিঃ ঐ সন্তান সৌভাগ্যবতীর আনন্দের উচ্ছ্বাস শুনে সে হয়তো কেঁদেছে ঈর্ষায়—এই রকম কিছু মনে করবেনা তো সুবর্ণা? বলল,

—না দিদি না, ওঁর মুখ মনে পড়ে গেল—বড় অসহায় অবস্থায় আমি পাঠিয়েছি তাঁকে। ছেলে মেয়ের আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি ভাই—স্বামী সুস্থ হলেই হবে—আর আমার কিছু চাইনে; চোখের জলটা মুছলো মায়া আঁচল দিয়ে। রুমাল হয়তো ওর আছে, বার করে হাতে রাখে না—মায়া কান্না দেখাবার মত মন নেই ওর।

ওর চোখের অশ্রু অনাবিল, অপাপবিদ্ধ—সুবর্ণা অনুভব করলো। হেসে বলল,

—স্বামী ভাল হয়ে যাবেন—অত ভাবনার কি আছে? কিন্তু এ লাইনে আপনি এলেন কেন ভাই—আপনার মত স্বামীপরায়ণা সতী মেয়ের তো এ পথ নয়?

—না এলে ওঁকে বাঁচোনো যাবে না—আর তো কোন কাজ জানা নেই। স্কুলে নাচ শিখে ছিলাম, গাইতে পারতাম, অভিনয়ও করতে পারি—আর ঐ দেখেই উনি আমায় বিয়ে করেছিলেন—নিজেও ভাল নাচতে পারেন।…তাছাড়া অন্য কাজে তো বেশি টাকা পাওয়া যায় না, ভাইদিদি…

—হ্যাঁ—কিন্তু—সুবর্ণা একটু ইতঃস্তত করে বলল - এ লাইনে চরিত্র ঠিক রাখা খুব কঠিন।

—জানি—আমি অনুমতি নিয়েছি—ওঁর জীবনের তুলনায় আমার দৈহিক পবিত্রতা আমি তুচ্ছ মনে করি—কিন্তু···

—বলুন—

—কিন্তু ওঁর ছাড়া আর কারো সন্তান আসবে আমার কোলে, এ আমি সইতে পারবো না।

চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো মায়ার। এই আশ্চর্য্য সতীর সান্নিধ্যে সুবর্ণা যেন নির্ব্বাক হয়ে গেছে—গাড়ীখানা জোরে চালাতে ভুলে গেছে সুবর্ণা—পিছনে একখানা যাত্রীবাহী বাসের জোর 'হর্ণ' শোনা গেল—সুবর্ণা তাড়াতাড়ি নিজের গাড়ীখানা পাশ করে থামালো।

—আপনি আশ্চর্য্য মেয়েতো !—সুবর্ণা এতক্ষণে বললে।

—কেন ?—চোখ মুছে মায়া প্রশ্ন করলো—করুণ হাসি তার ঠোঁটে !

—সতীশ্রী নাটকের নায়িকা আমি না হয়ে আপনি হলেই ঠিক হোত, কিন্তু এখন তো পার্ট মুখস্থ করতে পারবেন না—সুবর্ণা ওর প্রশ্ন এড়িয়ে বলল কথাটা।

—না তার কি দরকার! আমি ঐ দিগঙ্গনার নৃত্যটাই নাচবো—টাকা পোটা পেলেই ওঁকে পাঠাতে পারবো কাল—

—কাল রবিবার—পোষ্ট অফিস বন্ধ—বলে হেসে সুবর্ণা আবার গাড়ী চালাল,

—ও হ্যাঁ—আমার মনে ছিল না—বলে মায়া যেন কেমন বিমনা হয়ে গেল।

আর কোনো কথা হোল না পথে। মায়ার মনে অবশ্য কৌতুহল

জেগেছে সুবর্ণার সমস্ত পরিচয় জানবার জন্য, কিন্তু মায়া এখানে সামান্ত নটী, আর সুবর্ণা পরিচালিকা, মনিব স্থানীয়া—সুতরাং কিছুই সে প্রশ্ন করতে পারলো না। আর সুবর্ণা ভাবছে, এইমাত্র মায়া যে রাজকুমারী বেশী লোকটির সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করে এল—মায়া জানে না, সুবর্ণার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি। কিন্তু সুবর্ণা অন্য একটা কৌতূহল দমন করতে পারছে না—আর একজন নায়িকা কে—যার ছবি সে দেখেছে—সে কোথায় ?

গাড়ী ক্লাব ঘরের ইয়ার্ডে থামলে পর নামতে নামতে সুবর্ণা বলল,

—ও গল্পটায় আপনিই নায়িকা—না আর কেউ আছে ?

—আছে—সেই নায়িকা—রাজকুমারী অতসী—

—তার সত্যি নাম কি ? আলাপ হয়েছে আপনার সঙ্গে ?

—হ্যাঁ—নাম দুর্ব্বা চৌধুরী—বড় সুন্দরী মেয়ে।

—কৈ—তাকে দেখলাম না তো ?

—আজ তার অভিনয় নেই—তাই আসেনি—বয়স আমারি মতন, এমন আশ্চর্য্য সুন্দর !

মায়ার বিস্ময়োক্তিটা কানে লাগলো সুবর্ণার—হেসে বলল,

—আপনার থেকে সে সুন্দর, তাতে অত খুসী কেন আপনি ? হিংসাই তো হওয়া উচিৎ।

—হিংসে ? না দিদি, ওর ওপর হিংসে কেউ করবে না—শুধু রূপেই সে সুন্দর নয়, মনেও সে মহিয়সী—মানুষ শরীরে মনে অমন চমৎকার হয়—জানতাম না !

—লেখাপড়া কতটা জানে ?

—তা জানি না দিদি—আমার বিদ্যেতে সেটা জানবার কথা নয়। ওখানকার সবাই ওকে সমীহ করেন—প্রডিউসার বরুণবাবু পর্য্যন্ত !

—ও, আচ্ছা, একদিন দেখে আসা যাবে—আসুন।—বলে সুবর্ণা ওকে নিয়ে ক্লাবঘরের গ্রিণরুমে ঢুকলো।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব তৈরী হয়ে গেল, অভিনেতা অভিনেত্রীগণ, পর্দ্দা উঠলো—দিগঙ্গনা বেশে মায়া।

অপরূপ নৃত্য মায়ার, দর্শকচক্র যেন ভূলোক ছেড়ে দ্যুলোক এসে গেছে, কী আশ্চর্য্য শিক্ষা! সমস্ত তনুলতা ঘিরে, কী অমৃতনিস্যন্দী সুষমা ওর! 'বিশ্বের বাসনা যেন ব্যাকুল হয়ে ওর পদপ্রান্ত চুম্বন করতে চায়—নির্ব্বাক অডিটেরিয়াম হাততালি দিতে ভুলে গেল—ভুলে গেল 'আচ্ছাবা' বলে চীৎকার করতে!

প্রথম দৃশ্যতেই মায়া জমিয়ে দিল অভিনয়—শ্রোতৃমণ্ডলী আরো কিছু পাবার প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে। পরবর্ত্তী দৃশ্যে এল সুবর্ণা, নায়িকা রূপে, এক দরিদ্র যুবকের বধূ সে—স্নেহে কোমলা, প্রেমে মাধুর্য্যময়ী আর নিষ্ঠায় অচল প্রতিষ্ঠিতা। বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যেও সে জীবন দেবতার অভিসার পথে তার ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপ জ্বালিয়ে চলতে লাগলো—অভিনয় অনবদ্য হয়ে উঠেছে—বরুণ এসে দর্শকদের মধ্যে আসন নিল এক কোণে।

নায়িকা কল্যাণীর জ্যোতির্ম্ময়ী সতীরূপ দর্শকচিত্তকে অভিভূত করে দিচ্ছে—আশ্চর্য্য! ঐ নায়িকা বরুণের সহধর্ম্মিণী সুবর্ণা—গৃহে যার সতীত্ব দুরে থাক—পত্নীত্বের প্রকাশ কদাচিত দেখেছে বরুণ! মাতৃত্ব ও যায় মধ্যে খুঁজে পায়নি কখনো! সুবর্ণা কি দেহ মনে বদলে গেল নাকি? এমন প্রাণস্পর্শী অভিনয়নিষ্ঠা কোথায় পেল ও! ওকি সত্যি সুবর্ণা, না আর কেউ?—অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বরুণ!

দিগঙ্গনার নৃত্যের পর গোপাঙ্গনা বেশে আবার এল মায়া। বহু দর্শক এর প্রতীক্ষা করেছিলেন। নটীজাতীয় অতি সাধারণ লাস্য-নৃত্য নয় এ,—ভাবস্নিগ্ধ আনন্দ নৃত্য! বরুণ মুগ্ধ চোখে দেখলো—আর

ভাবলো, মায়া তাদের ছবিতে রাজবধূ কিন্তু রাজনর্ত্তকী বেশে তাকে ছবিতে নামালে হয়তো আরো ভাল হোত ; কাটুর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করবে সে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাবলো—এ নৃত্য রাজকুমারের প্রমোদাগারের নৃত্য নয়—বিবসনা বিশ্ববাসনার কামানার্ত্ত প্রকাশ নয়—এ নৃত্য নটরাজের শুভ্র চরণ কমলে রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডের অঞ্জলি—রাজোদ্যানে এর সম্মানরক্ষা হবে না। বরুণ দেখতে পেল, ঐ নৃত্যপরা দ্বাদশীর দিকে এগিয়ে আসছে সতীশ্রী কল্যাণী—মন্দিরের মর্ম্মরশ্বেত অঙ্কে তার অলক্তরঞ্জিত পদবিন্যাস পূজারিণীর পবিত্রতার মত মূর্ত্তিমতী—সুবর্ণা ! সুবর্ণা ! এই সুবর্ণা, সতী সুবর্ণা ! বরুণ চিনতে পারছে না ওকে। সুবর্ণা অঞ্জলি উদ্যত করে পূজার্ঘ অর্পণ করছে—বলছে,

আমার সব বেদনা সব চেতনা—রচিল এযে কি আরাধনা···

কোথা দিয়ে যে সময় চলে গেল, টের পেল না বরুণ, অকস্মাৎ সে অনুভব করলো, অভিনয় শেষ হয়ে গেছে—এবং দর্শকবৃন্দ উঠতে আরম্ভ করেছে—সবাই বলছে চমৎকার !—অদ্ভুত ! আশ্চর্য্য—অনুপম সৃষ্টি ! বরুণ দেখতে পেল, ষ্টেজের উপর দাঁড়িয়ে সুবর্ণা সকলকে নমস্কার করছে, আর অসংখ্য দর্শকের মধ্যে থেকে বহু ব্যক্তি পুষ্পমাল্য, তোড়া ছুঁড়ে দিচ্ছে ওর গলায়, গায়ে, পায়ে। মৃদু হেসে সুবর্ণা গ্রহণ করছে এই অর্ঘ্য সম্ভার—এই প্রীতি, এই পূজা...

বরুণের সুবর্ণা বিশ্বের সুবর্ণা হয়ে উঠলো নাকি আজ ? হ্যাঁ তাইতো ! ও সতী কল্যাণী নয়, ও নায়িকা সুবর্ণা এখন—অসংখ্য মানবের চিত্তবিনোদন কারিণী অভিনেত্রী !—না, বরুণ আর দেখবে না, দেখাও করবে না সুবর্ণার সঙ্গে। অসংখ দর্শকের উদ্বেলিত প্রীতি-উৎসে সে পরিস্নাত হোক—বরুণ বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম করবে—নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে বরুণ গাড়ীতে চড়লো।

দর্শকগণ দাবী জানালেন দিগঙ্গনাবেশী মায়াকেও তাঁরা দেখবেন, প্রীতি জানাবেন। কিন্তু মায়া নিজের কাজ সেরেই টাকাগুলো নিয়ে দেওরের সঙ্গে বাড়ী চলে গেছে। সুবর্ণা সবিনয়ে জানাল সে কথা। দর্শকগণ ক্ষুব্ধ হলেন, পুনর্ব্বার এই অভিনয় দেখবার আবেদন জানিয়ে তাঁরা প্রস্থান করলেন। এতক্ষণে সুবর্ণা একটু স্বস্তি পেল! উঃ! কী অভিনন্দন! কী আশ্চর্য্য মাদকতা এর! কিন্তু আরো আশ্চর্য্য যেটা, সেইটাই ভাবছে বাড়ী ফিরবার পথে। সৃষ্টিকর্ত্তা নাকি নিজের বিচিত্র সৃষ্টি দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, সুবর্ণারও তাই হয়েছে। এমন আশ্চর্য্য অভিনয় সে করলো কি করে, কোথা থেকে জুটলো প্রেরণা, কেমন করে কী হয়ে গেল! এই দুটো ঘণ্টা সে সুবর্ণা ছিল না, ছিল বধূ কল্যাণী, সেবায়, স্নেহে, প্রেমে, পূজায় সে যেন আরেক জন হয়ে উঠেছিল, যেন - কার শক্তিতে!

মনে পড়ে গেল সুবর্ণার—মায়ার চোখের দুফোঁটা জল,—'ওর জীবনের তুলনায় আমার দৈহিক পবিত্রতা অধিক তুচ্ছ মনে করি'— কথাটি। আশ্চর্য্য সতী মায়া! ঐ স্পর্শমণির স্পর্শেই লোহা-সুবর্ণা সত্যি-সুবর্ণা হয়ে গেছে।

বাড়ী এসে দেখলো, খুকীকে বুকে নিয়ে বরুণ ঘুমিয়ে আছে। দীর্ঘ দিন পরে সুবর্ণার অধরোষ্ঠ নীচু হয়ে এল, বরুণের ললাটের পানে!

—উঁহু—থাক, ঠোঁটে রং রয়েছে তোমার—বরুণ বলল!

—থাক—সুবর্ণা ত্বরিতে গিয়ে ঢুকলো বাথরুমে!

লজ্জায় মিশে যাবে নাকি সুবর্ণা মাটির সঙ্গে, নাকি—বিদ্রোহের বহ্নি জ্বেলে দেবে পুড়িয়ে, দেবে সব সুকুমার মনোগন্ধ!

সিনারিও লেখা আর শেষই হচ্ছে না। কাটুবাবু বড্ড খুঁৎখুতে মানুষ, কী যে সে চায় - চিণ্ময় বুঝতে পারে না। মূল গল্পটাই যথেষ্ট জোরালো

ছিল না. চিণ্ময় তার মধ্যে আরো কিছু যোগ বিয়োগ করে সেটাকে এক রকম দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু ছবিতে যে সব দৃশ্য এবং কথা তোলা হবে—সেগুলো আর কাটুবাবুর পছন্দই হয় না। অনেক ভেবে, অনেক মাথা ঘামিয়ে চিণ্ময় মনের মত করে লিখলো পাতাখানেক—কাটুবাবু শুনে বললো—'বাঃ! চমৎকার—তারপর একটু মাথা চুলকে বলল—শেষটা বোরিং মনে হচ্ছে একটু—'ওটা কেটে দিন—পরে আবার বলল্ এতে গল্প কিন্তু মোটে এগুচ্ছে না—আরো একটু পরে বলল্, 'শুধু কথাই আছে ড্রামা কৈ?'—ইত্যাদি। শুনে শুনে চিণ্ময় বুঝে নিয়েছে, কাটুবাবুদের মত ব্যক্তিকে স্বয়ং কালিদাস ভবভূতিও খুশী করতে পারবেন না, কারণ—ওদের ধারণা, ওদের মত ব্রেণ আর জন্মায়নি। কাটা ছাঁটা শেষ হলে দেখা গেল, চিণ্ময়ের অত কষ্ট করে লেখা দৃশ্যটার মধ্যে মাত্র চার পাঁচ লাইন রইল। লেখা একেবারে বাদ গেল। অকারণ অসময়ে অসম্ভব কিছু না ঘটালে বা না বলালে ওদের ড্রামা হয় না—গল্প গতি পায় না এবং বাংলাদেশের নির্বোধ দর্শক নাকি সে চিত্র পছন্দ করে না। সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর কিছু খাদ্য নাকি এদের রুচি হয় না—তেলে ভাজা পাঁপর পেঁয়াজ বড়াই এখানে দিতে হবে! এতোটা বিজ্ঞ লোকের সঙ্গে কাজ করা আর নরক ভোগ করা প্রায় সমান। চিণ্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলো। যে সংলাপটি সে অত্যন্ত চিন্তা করে রচনা করেছে—কাটুবাবু তার অর্থ না বুঝেই বলল, ওটা চলবে না—আবার যেটা চিণ্ময়ের মোটে পছন্দ নয়—কাটু বলবে—বা! চমৎকার!

এ লাইনে এলেই কতকগুলো কথা ওরা শিখে ফেলে—যেমন—'ডাল্', 'বোরিং'—'গল্প এগুচ্ছে না'—'ড্রামা কোথায়?' 'গুরুচণ্ডালী হচ্ছে'—'জমছে না'—'রস নেই' 'রিপিটিশ্যান হোল'—ইত্যাদি! ওদের গল্প কিসে গতি পায়, আর কোথায় ড্রামা হয়, সে বিষয়ে বিভিন্ন ডাইরেক্টরের

বিভিন্ন মত আছে। আশ্চর্য্য যে ওরাই যখন কোন বিদেশী চিত্র দেখে আসে, তখন অকুণ্ঠভাবে তার প্রংশসা করে—আর বলে—আহা! কী চমৎকার! কিন্তু এদেশে ওরা বলে—ওদের দর্শক আর আমাদের দর্শকের অনেক ক্ষেত্রেই কোন ছবি বাজারে না চললে, নির্ব্বিচারে ওরা দর্শকের স্কন্ধে দোষ চাপিয়ে বলবে, অশিক্ষিত দেশ—বুঝলো না—ওরা ভেবে দেখে না, দেশকে ভাল জিনিষ ওরা করে দিয়েছে? ফাইনেন সার বধ করে একসঙ্গে পঞ্চমকারের সাধনায় ওরা সিদ্ধ হতে চায়—ছবি কেমন হবে, চিন্তাও করে না। কিন্তু যাক্ সেকথা, চিণ্ময় যতদূর সাধ্য চেষ্টা করলো কাটুবাবুদের খুসী করতে—এর জন্য তার নিজের মত এবং চিন্তাকে সে একেবারে বিসর্জ্জন দিয়ে বসেছে—তবুও পারছে না। দৃশ্য আছে—যুবরাজ চিত্রক রাজকুমারী অতসীর প্রমোদ্যানে লুকিয়ে আছে, রাজকুমারী অতসী গান গাইতে গাইতে আসছে—অপূর্ব্ব শ্রুত সঙ্গীত, চিত্রক মুগ্ধ। কাটুবাবু আদেশ করলো—এইখানে যুবরাজ গুলি করে একটা পাখী হত্যাকরুক। রাজকুমারী সেই শব্দে হকচকিয়ে না উঠলে দৃশ্য জমবে না—পাবলিক বিরক্ত হবে। মিনিট খানেক ওর মুখপানে চেয়ে চিণ্ময় নির্ব্বিচারে তাই লেখে দিল। যুবরাণী বিদুলা সন্তান সম্ভবা—প্রসব বেদনায় কাতর—ওদিকে রাজ্যের সকলে শাঁখ বাজাবার জন্য অপেক্ষা করছে—বিধবা রাজমাতা অস্থির হয়ে ঘুরছেন—কাটুবাবু আদেশ করলো—এইখানে যুবরাণী বিদুলাকে একটা বিরহ সঙ্গীত অতি অবশ্য গাইতে হবে—চিণ্ময়ের মুখখানা তেতো খাওয়ার মত বিস্বাদ হলেও সে লিখে দিল—কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারছে না চিণ্ময়।—রাজকুমার যখন কয়েক বছর পরে বহু আঘাত খেয়ে ফিরে এল স্বরাজ্যে—তখন বিদুলা মন্দিরে পূজারতা—কুমার চিত্রভানু ঐখানে খেলা করছে। মৈনাক তাকে চোখে দেখে নি—চিনতে পারলে না—বিদুলাকে তো চিনবারই উপায় নেই, সে সন্ন্যাসিনী—

কিন্তু বিদুলা স্বামীকে চিনতে পারলো,—ভানুকে ডেকে বলল,—এই তোর বাবা—যা প্রণাম কর!

ভানু গিয়ে মৈনাকের পায়ে প্রণাম করে বলল—বাবা! উদ্বেলিত অশ্রুতে দুই গণ্ড ভেসে গেল মৈনাকের।—

কিন্তু কাটুবাবু বললেন—কিচ্ছু হয় নি—ওটা কি দৃশ্য হয়েছে নাকি? রামো! মিনিটখানেক হতভম্ভ হয়ে থেকে চিণ্ময় বলল—কি করতে হবে?

—শুনুন—ওটাকে গুরুচণ্ডালী দোষ বলে; যে স্পিড্ এ ড্রামা এল, তারপর ঐ কি তার পরিণতি! ভেবে দেখুন—দর্শক কি চাইবে এখানে!

—কি চাইবে?—চিন্ময় নিরীহের মত প্রশ্ন করলো!

—চাইবে একটা করুণ উত্তেজনা—মানে, ড্রামা—মানে গতি, মানে,—কি বলবো—? চাইবে—মৈনাক কেঁদে গিয়ে বিদুলাকে জড়িয়ে ধরুক—অজস্র চুম্বন আর অসংখ্য কথার অমন সুন্দর যায়গাটা মাটি করে দিলেন—আঃ—একটা চমৎকার গানের শিচুয়েশ্যান!!

—আচ্ছা, আমি ভেবে রাখবো—বলে নিঃশব্দে উঠে আসছে চিণ্ময়—মনে মনে বলল—অসহ্য!

—ভাববেন—ক্যামেরা ক্লোজ আপ করে দিল আর মৈনাকের যুগল মূর্ত্তি আসছে এগিয়ে—মার্ভেলাস!

—আর ছেলেটা?

—ওটার কিছু দরকার নেই—আমাদের ড্রামা এই দম্পতীর মিলন দেখানোতেই শেষ!

—কিন্তু মিলনের সেতু ঐ ছেলেটাই!

—ছেলে দেখতে কেউ আসে না সিনেমায়—বিদুলার প্রেম বিহ্বল সেকস্ এ্যাপিলিং চেহারাই তারা দেখতে চায়—দেখবেন, বাহবা পড়ে যাবে!

মানুষের যৌনক্ষুধার দুর্বলতাকে কাটুবাবু পয়সা রোজগারের প্রকৃষ্ট পন্থা মনে করে—ওর থেকে উচ্চ কিছু চিন্তা করবার শক্তি ওর নেই! কিন্তু চিণ্ময় এরকম দৃশ্য লিখতে কিছুতেই পারবে না। যতরাগ আর অভিমান গিয়ে পড়ল দূর্ব্বার উপর। সেই তো এই কাজে ওকে ঢুকিয়েছে!

বৌবাজারের কাছে একটা অফিস খুলেছে 'রঞ্জাবতী চিত্রালয়'—কাজেই দূর্ব্বার বাড়ীতে এখন আর বসতে হয় না—টালীগঞ্জেও যেতে হয় না রোজ। চিণ্ময় সকাল সাতটায় যায় অফিসে, বারোটার সময় দূর্ব্বার বাড়ীতে খেয়ে আবার তুটার সময় যায়—আর রাত্রি প্রায় বারোটা পর্য্যন্ত কাজ চলে। রাত বারটার পর প্রায়ই চিণ্ময়কে হেঁটে ফিরতে হয় মানিকতলায়। তার টুইস্যানি-চাকরী আর নেই—এখন দূর্ব্বার বাড়ীতেই সে থাকে—খায়, শোয়।

বাইরের সেই বৈঠকখানা ঘরটাই ব্যবহার করে চিণ্ময়। পাড়ার লোকে জানে, চিণ্ময় নিকট আত্মীয় দূর্ব্বার—কিন্তু কি রকম আত্মীয়, কেউ খোঁজ রাখে না। কিম্বা রাখলেও কিছু বলে না সম্মুখে। দূর্ব্বা সিনেমায় ঢুকেছে, এর পর ওর সম্বন্ধে ভাল কিছু ভাববার থাকতে পারে—এ রকম লোক বাংলা দেশে কম। পাড়ার ছোকরারা নিশ্চয়ই আলোচনা করে—তবে অলখ্যে!

চিণ্ময় এসে পৌছাল বেলা প্রায় তুটো। দূর্ব্বা ভাত আগলে বসে আছে। এতো বেলা হয় না, আজ কাটুর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে দেরী হয়ে গেছে।

—কী ব্যাপার! এতো দেরী! দূর্ব্বা বললো চিণ্ময়কে দেখে!

—হুঁ, তুমি স্বচ্ছন্দে আমায় জমালয়ে পাঠাতে পারতে দূর্ব্বা, ওখানে কেন পাঠালে?

—কেন ! কি হোল কি ?

—কত আর বলবো ! বলে জামা খুলে তেল মাখতে মাখতে চিণ্ময় ব্যাপারটা ওকে জানালো। হাসিমুখে সব শুনে গেল দূর্ব্বা—তার পর হেসেই বলল,

—যাও, স্নান করো—ও গল্পে তোমার নাম দেওয়া হবে না—যা ওরা চায়, লিখে দাও—তোমার কোনো দায়িত্ব ওতে নেই—তুমি মেশিন মাত্র এখানে।

—কিন্তু ছবিটা ভাল হবে না দূর্ব্বা—তোমার নামটা তো থাকবে। বদনাম, নাম নয়।

—না—আমার অভিনয় আমি ঠিকই করবো আর জেনে রাখ, এটা তোমার আমার শিক্ষানবিসীর কাল—কাজটা শিখবার জন্যই তোমায় পাঠিয়েছি।

—সর্ব্বত্রই ঐ রকম, শিখে করবো কি ?

—নিজেরা করবো ভাবনা নেই, ফাইনেনসার হাতে রয়েছে ! হাসলো দূর্ব্বা।

—কে গোবিন্দবাবু ?

—হ্যাঁ কেন ? মুখখানা অমন ওল সেদ্ধর মতন করলে যে ! কথাটা ভাল লাগল না ?

—এ খেলা বন্ধ কর দূর্ব্বা ! চিণ্ময়ের আবেদন অশ্রুসজল হয়ে

—না ! এই নারী তার খেলা কখনো বন্ধ করে না। এই বিশ্বপ্রপঞ্চ মহামায়ার খেলা, লীলা, মেয়েরা তার অংশ, তাই তাদের খেলা চলে অবিশ্রাম—স্বামী নিয়ে—সংসার নিয়ে ; আমি না হয় সিনেমা নিয়ে খেলবো। যাও, স্নান কর, চিণুদা !

দূর্ব্বা রান্নাঘরে ঢুকলো গিয়ে—চিণ্ময় কলতলায় স্নান করতে গেল। দূর্ব্বার দুঃসাহস ওকে বিস্মিত শুধু নয়, বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে। সত্যি সে গোবিন্দর প্রস্তাবটা গ্রহণ করবে তাহলে! সত্যি সিনেমাকোম্পানী খুলবে দূর্ব্বা! কেন? কী দরকার অত বড়লোক হবার? দূর্ব্বাকে নিয়ে চিণ্ময় শান্তপল্লীতে গিয়ে বাস করবে—জীবন যেখানে জীবনামৃত পেয়ে ধন্য হয়—প্রাণ যেখানে প্রাণারামে পরিতৃপ্ত—আত্মা যেখানে আত্মস্থ! সেই দূর্ব্বার ঠাঁই—সেইতো তার আশ্রয়—কিন্তু না, দূর্ব্বাকে ওরা দেবমন্দিরের অঙ্গন থেকে তুলে এনে গড়ের মাঠের ক্লাব লনে রোপন করছে—বর্ষার জল নয়—রবারের পাইপ ভরা জলে ওকে স্নান করায়—একটু বেশী বাড়লে কাঁচির রোলার চালিয়ে ওর সাবলীল বৃদ্ধি বন্ধ করে দেয়—ওদের লন ওদের মনের মত হতে হবে—দূর্ব্বা সেখানে দূর্ব্বা নয়। কমনীয় 'লন'—রঙিন মরসুমী ফুল আঁকবার জন্য সবুজ ক্যানভাস মাত্র। ওর পবিত্রতা, ওর পূজার গৌরব, ওর 'অক্ষত' নামের মহিমা শহরের উগ্র গন্ধে আবিল হয়ে যাচ্ছে—হায়!

দূর্ব্বা ওকে খাইয়ে বিশ্রাম করতে পাঠালো এবং নিজে খেতে বসল। চিণ্ময়ের আবার রঙ্গাবতীর অফিসে যাবার কথা কিন্তু দূর্ব্বা বললে যে অনেক বেশী খাটুনী হয়েছে, আজ আর যেতে হবে না। চিণ্ময় ভাবতে লাগল কাটুবাবু তাকে যথাসময়ে অফিসে দেখতে না পেলে চটবে। কিন্তু দূর্ব্বা ওসব গ্রাহ্য করে না, বলল—ক্রীতদাস তো হয়ে যাওনি—যাও, ঘুমওগে। শরীর সত্যি ক্লান্ত ছিল। চিণ্ময় শুলো, ঘুমিয়ে গেল।

আগামীকাল দূর্ব্বার স্যুটিং—যেতে হবে তাকে ষ্টুডিওতে। স্ক্রিপ্ট লেখা একবার শেষ হওয়ার পর স্যুটিং আরম্ভ হয়েছে কিন্তু কাটুবাবুর ইচ্ছেমত সেটাকে আবার পরিবর্ত্তন, পরিবর্জন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি

করা হচ্ছে—খাটুনিটা ও ডবল তেডবল হয়ে গেল তাই চিন্ময়ের। পাঁচশো টাকার মধ্যে দুশো তাকে দেওয়া হয়েছে—বাকী কবে দেবে, কে জানে! দূর্ব্বা খাওয়া শেষ করে ভাবছিল এইসব কথা। মোহগ্রস্ত গোবিন্দ তিন লক্ষ টাকা দিতে চায় ছবির কোম্পানীর খুলবার জন্য—তার ভেতরের ইচ্ছেটা জানে দূর্ব্বা—দূর্ব্বাকে লাভ, এবং আরো অনেক কিছু লাভ। এ ব্যবসায় চললে বছরের মধ্যে কোটিপতি হওয়া বিচিত্র নয়—গোবিন্দ সেসব খবরও নিয়েছে। কিন্তু কাটুবাবু বা বরুণের কোনো সংস্রবে সে দূর্ব্বাকে রাখতে চায় না—এই সর্ত্ত। দূর্ব্বা এখনো সম্মতি দেয়নি ছবির ব্যাপারে এভাবে নামবার. তবে ভেবে দেখবে বলেছে। হয়তো সম্মতি সে দেবে—তাই চিন্ময়কে ফাইনেনসারের কথা বললো। . .

খেয়ে হাত ধুচ্ছে- হঠাৎ আহ্বান এল দরজা থেকে—দূর্ব্বা ভাই; —এসো—এসো—দিদি!—দূর্ব্বা সাদর আহ্বান জানালো মায়াকে।—এতক্ষণে খেলে? মায়া বিস্ময়ান্বিতা হয়ে প্রশ্ন করলো—বেলা সাড়ে তিনটে।—হ্যাঁ—বন্ধুটির আসতে দেরী হোল—বসো দিদি—দূর্ব্বা মায়ার হাত ধরে ঘরে এনে বসাল এবং মুখের পানে চেয়ে শুধুলো—চিঠি পাওনি—না?

—না ভাই—বড্ড মন কেমন করছে। তিনি ভাল আছেন তো দূর্ব্বা?

ব্যাকুল বেদনাহত কণ্ঠস্বর। দূর্ব্বা জ্যোতিষী নয়—যোগিনীও নয়—ভবিষ্যৎ বলবার কোনো ক্ষমতা তার নেই—সবই জানে মায়া—তবু মানুষের মনের দুর্ব্বলতা—মায়া আশা করছে দূর্ব্বা বলবে—নিশ্চয় ভাল আছে—আর তাই শুনে মায়ার মন শান্ত হবে। দূর্ব্বা ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বলল—নিশ্চয় ভাল আছেন—আমি বলছি, ভাল আছেন তিনি, তুই ভাবিসনে দিদি, তোর মত সতীর স্বামীর অমঙ্গল হবে না—

কিন্তু মায়ার চোখে জল—বলল—ঘরে কিছুতেই মন টিকলো না দূর্ব্বা,

দেওরটা স্কুলে গেছে—একা বড্ড খারাপ লাগছিল। চিঠি কেন এলনা ভাই ?

—ওর দুর্ব্বল শরীর, মা বুড়ো মানুষ—চিঠি হয়তো সময়ে লিখতে পারেননি ; বেশ দিদি, তুই একটা কাজ কর—কাল থেকে তিন দিন আমার স্যুটিং আছে, তোর নেই—মানে যুবরাণী হয়ে তোকে কাঁদতে হবে না—হাসলো দূর্ব্বা। এর মধ্য দেবরকে সঙ্গে নিয়ে তুই চলে যা না,—অসুবিধে কি ?

—সবকটা টাকাই ওকে পাঠিয়ে দিয়েছি—আরতো এ্যাড্ভান্স পাব না।

—আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যা

—তোমার অসুবিধে হবে না ?

—কিছু না—টাকা না থাকলেও অসুবিধা হয় না আমার—আজই তুই চলে যা দিদি।

—হুঁ - কিন্তু তুই কেন এমন করে আমায় যেতে বলছিস দূর্ব্বা ? তিনি সত্যি ভাল আছেন তো ?

—নিশ্চয় ভাল আছেন, তুই সেটা নিজের চোখে দেখে আয়—আর ওকে বলিস, দূর্ব্বা নামে তোর একটা বোন জুটেছে—দধীচির অস্থি হাতে সে তোকে পাহারা দেবে। তোর পবিত্রতা রাখতে দূর্ব্বা দানবী হতেও প্রস্তুত। বস্ দিদি, আমি দাদুকে একবার দেখে আসি—তিনি হয়তো ডাকছেন !

দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে এবং দাদুর ঘরে গিয়ে দেখলো, দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসে আছেন। দূর্ব্বা নমস্কার করলো তাদের।

—নমস্কার ! আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি আমরা। সেদিন ষ্টুডিওতে দেখেছি আপনাকে ; তারপর ঠিকানা সংগ্রহ করতেই যথেষ্ট বেগ পেতে হোল !

—কেন? রত্নাবতী সিনেমায় তো ঠিকানা আছে আমার!

—তাঁরা সেটা বললেন না, যাক্—আমরা যে জন্য এসেছি, বলি। আমাদের পুরানো কোম্পানী; চার-পাঁচখানা বই করেছি আমরা। এখন যেটা করতে যাচ্ছি, তারই নায়িকার ভূমিকায় যদি আপনি যোগ দেন…

দুজন ভদ্রলোকের মধ্যে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি একটু রোগা-পাতালা। তবে সুশ্রী চেহারার, চোখগুলি বেশ বড় উজ্জল—রং ফর্সা! অপরব্যক্তি একটু মোটা, গোলগাল, চোখ ছোট, রং শ্যামল—বয়স দুজনেরই প্রায় ত্রিশ।

—আমি কিন্তু কয়েকটা বিশেষ সর্ত্ত করিয়ে তবে ওখানে যোগ দিয়েছি।

—জানি—সেকথা শুনেছি আমরা—যিনি আপনার ঠিকানা দেন, তিনিই সেকথা বলেছেন। ও সব সর্ত্ত আমরাও মেনে নিতে রাজি আছি, তবে—

—কি তবে?—বলুন?

—ষ্টুডিওতে অনেক সময় রাত্রে কাজ করা দরকার হয়—আর আউটডোর সুটিং থাকলে বাইরেও যেতে হয়। আমাদের বইএ দরকার হবে।

—আমায় বাদ দিন—বাইরে আমি যেতে পারবো না, রাত্রেও কাজ করবো না। দূর্ব্বা জবাব দিয়ে দাদুকে বলল, তামাক সেজে দেব, দাদু?

—না দিদি, থাক? বৃদ্ধ উত্তর দিলেন।

এতোক্ষণে সেই মোটা লোকটি বললেন, এ লাইনে যখন আসছেন, তখন অত কনডিশান করলে চলবে কেন? পারিশ্রমিক আমরা ভালই দেব।

— মাফ্ করবেন. কনডিশ্যান ছাড়া আমি যেতে পারবো না. তাছাড়া অন্য কারণ আছে।

—আচ্ছা আমরা মেনে নেব। কত পারিশ্রমিক আপনার? দৈনিক হারে তো?

—না, সম্পুর্ণ চরিত্রাভিনয়ে কিন্তু আমি এখন আর কোন চরিত্র অভিনয় করবো না।

—কেন?

কারণ আমি রাজকুমারী অতসী। শুনেছি আপনাদের নায়িকা বড় ঘরের মেয়ে। রাজকুমারী অতসীকে আমি হত্যা করতে পারি না।

—হত্যা করবেন কেন?

—কারণ আপনাদের নায়িকার চরিত্রের সঙ্গে অতসীর চরিত্রের কোথাও মিল নেই। মাফ্ করবেন।

— দূর্ব্বা নমস্কার জানিয়ে সেঘর ত্যাগ করলো। লোকদুজন হতভম্ভ হয়ে চেয়ে রইল, তারপর উঠে গেল।

সেদিন রাত্রের ঘটনাটা স্থবর্ণাকে শুধু আঘাতই করে নি, উত্তেজিত করে তুলেছে। অনেকে আছে, যারা আহত হলে আঘাতটা সামলাবার জন্যই ব্যস্ত হয়। আবার অনেকে প্রতিঘাত না করা পর্য্যন্ত শান্ত হয় না। স্থবর্ণা শেষোক্ত শ্রেণীর মেয়ে। বাথ রুমে ঢুকে নিজের অপরিসীম লজ্জাকেও সম্বরণ করলো, তারপর দুচোখে যে জ্বালা ওর জ্বলে উঠলো,—তাতে সংসার ভস্ম হয়ে যেতে পারে। স্থবর্ণা মুখের রঙপাউডার ধুয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে অন্য একটা ঘরে এলো গিয়ে—মেয়েটাকেও ছুঁলে না।

উত্তেজনায় অন্তরটা কেঁপে উঠছিল ওর, দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় ও তাকে তখনকার মত সম্বরণ করলো, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্ত হতে পারলে না। অনেক

রাত্রে ঘুমুলো সুবর্ণা, তাই উঠতে বেলা নয়টা বাজলো ; নতুন কিছুই নয়, এরকম বেলায় শয্যাত্যাগ ওর নিত্যকার ব্যাপার।

প্রভাতী চা পান করতে করতে সুবর্ণা প্রশ্ন করে জেনে নিল, বরুণ অনেকক্ষণ পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করে খুকীকে নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছে মোটরে। এরকম বেড়াতে যায় বরুণ যখন তার খেয়াল হয়। খুকীটা বরুণের একলার, সুবর্ণার যেন যেন ওতে কিছুমাত্র অংশ নেই। না—সুবর্ণা নিজেই তার অংশ ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সুবর্ণা খুকীর কথা ভাবলো না— ভাবতে লাগলো, বরুণ কেন তাকে কাল প্রত্যাখ্যান করলো। বরুণের অন্য যতই দোষ থাক—স্বামী হিসাবে সে উদার এবং ভদ্র। অনর্থক আঘাত করা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। অতএব বিশেষ কোনো হেতু আছে যার ক্রিয়ার এই প্রতিক্রিয়া—কী সেটা ?

মানুষ নিজের দোষ সহজে দেখতে পায়, না দেখতে চায় না ; মনের এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে জীবন দেবতা অনেক আশ্চর্য্য খেলা খেলে যান। সুবর্ণাও তার নিজের দোষত্রুটি দেখবার চেষ্টা করলো না। সে ক্লাবে যায়, পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলা মেশা করে, রাত বারোটা বাজিয়ে বাড়ী ফেরে—যখন-তখন যেখানে সেখানে চাঁদা দেয়, সভ্যা হয়, মিটিং করে ঘরের থেকে বাইরের জগৎ তার কাছে অনেক বেশী বিস্তৃত। ঘরে একটাস্বামী সংসার আছে এবং তাদের জন্য কিন্তু কর্ত্তব্যও আছে, সুবর্ণার একথা মনে থাকে না। প্রসাধিতা এবং প্রাতীক্ষিতা পত্নীকে দেখে পতির মনে যে স্নেহ কামনা জাগে, যে প্রেমসুধা ক্ষরিত হয়, গভীর রাত্রির কোমলতার মধ্যে বহু দর্শকের উগ্র দৃষ্টিতে উচ্ছিষ্ট সেই নারীকেই ঘৃণা করা অস্বাভাবিক নয়, এই অতি সহজ কথাটা সুবর্ণা বুঝতে চাইল না। কারণটা এর কিন্তু অত্যন্ত সহজ। সুবর্ণা অত্যাধুনিকা মেয়ে, আজকার অভিনয়ের অসাধারণ সাফল্য ওকে অভিভূত করে দিয়েছে

প্রশংসায়, করতালিতে, কথার উচ্ছ্বাসে। সুবর্ণা নিজের সেই অসাধারণত্ব স্বামীর কাছে প্রকাশ করে প্রশংসা পেতে চেয়েছিল—যাকে ওর ভাষায় বলে 'কম্‌প্লিমেণ্ট !' কিন্তু ভাববার অন্ত যে একটা দিক আছে—সুবর্ণা সেটা ভাবে নি। কিন্তু ভাববার মত মন ওদের নেই, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে 'গোষ্ঠযোষিকা' ; সুবর্ণা সেই বেশে এসেছিল স্বামীর সান্নিধ্যে ; সুবর্ণা সেটা জানে না, জানে বরুণ। তার পড়া আছে। অন্তরের অভ্যন্তরে বরুণ আধুনিক নয়, অতিমাত্রায় প্রাচীন পন্থী। সুবর্ণা সেটা আবিষ্কার করতে চায় নি কোনো দিনই, ওর প্রয়োজনাভাব।

কিন্তু সুবর্ণা তো শুধু 'কমপ্লিমেণ্ট' পাবার জন্যই স্বামীর কাছে যায় নি ; প্রেমের একটা অপরূপ রূপ—একটা অশ্রুত রাগিনী—একটা অনাস্বাদিত আকর্ষণও ছিল তার তখন—একটি আশ্চর্য্য নারীর—পুণ্যময় স্পর্শের প্রভাব সেটা। সতীত্বের সংজ্ঞা সুবর্ণার জানা আছে, পছন্দ সে করে না ; কিন্তু এই নতুন সংজ্ঞা তার জানা ছিল না। মনে পড়ল, 'সতীস্ত্রী' নায়কের লেখক এক জায়গায় বলছেন—'কে কবার বিয়ে করেছে, সতীত্ব যাচাই করবার সেইটাই নিরীক নয়, কে কতখানা নিষ্ঠায় সংসার করে, কত গভীর তার প্রেম, এবং তার বর্ত্তমান জীবনে সে স্বামীপরায়ণা এইটেই নারীত্বের সত্য তুলাদণ্ড। তা না হলে অহল্যা, দৌপদী, কুন্তীর সতীনাম তালিকা থেকে বাদ যেত। কবে কার জীবনে কি ঘটেছে তা নিয়ে সতীর বিচার হয় না—তার বর্ত্তমান প্রেম সত্য হলেই সে 'সতী'।'

সুবর্ণা প্রাতঃকালীন বেশবাস পরিধান করতে করতে ভাবলে কথাগুলো। 'তার বর্ত্তমান প্রেম সত্য হলেই সে সতী'—তার প্রেম সত্য নয় কেন? হ্যাঁ সত্য, নিশ্চয়ই সত্য ; গত রাত্রিতে সে পরিপূর্ণ প্রেম নিয়েই এসেছিল বরুণের কাছে কিন্তু বরুণ তাকে অপমান করলো। কেন? কারণ ঐ মেয়েটা। ঐ যে ফটোর মধ্যে রয়েছে।

কী ওর নাম? কে ও? থাকে কোথায়? জানতেই হবে। সুবর্ণা যেমন করে হোক জানবে—জানবেই। নিঃশব্দে সুবর্ণা বেরিয়ে গেল মোটরে। কাটুবাবুর ফ্ল্যাট তার চেনা; দূরও বেশী নয়; সুবর্ণা বিশাল বাড়ীটার 'লন'এ গাড়ী দাঁড় করিয়ে খট্ খট্ করে উপরে উঠে গেল হিল-ওয়ালা জুতো পায়ে; বাড়ী নয়, প্রাসাদও নয়, পারাবত নিবাস। পাঁচতলা বিল্ডিং—তার সবকার উপর তলায় থাকে কাটু। ফ্ল্যাট খানা ভাল, মূল্যবান এবং মূল্যবান আসবাবও আছে সেখানে। বরুণ বা সুবর্ণা শুধু নয়, বহু ধনীর শুভাগমন হয় আজকাল কাটুর ঘরে; তাই তার ঘর যথেষ্ট মার্জিত রাখে সে। দুখানা মাত্র ঘর, একটা শোবার, আরেকটা বসবার এ সংলগ্ন স্নানাগার, সৌচাগার, যেমন হয়ে থাকে এসব বাড়ীতে, তাই। সামনে বারান্দা, পিছনে ব্যালকনি, ফুলেরটব গোটা কয়েক দরজা জানালায় রঙিন পর্দ্দা—যা কিছু বর্ত্তমান সভ্যতার বিশেষত্ব। তার সব আছে টেলিফোন, রেডিও, পাখা…ইত্যাদি।

সুবর্ণা দরজায় টোকা দিল, তৎক্ষণাৎ জবাব এল ইংরাজিতে—ভেতরে আসুন! সুবর্ণা ঢুকেই দেখতে পেল,—কাটু বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। আয়নাতে সুবর্ণার ছায়া দেখে ফিরে দাঁড়ালো চিরুণী হাতে। বিস্ময় অবশ্য তত বড় নয়—কারণ সুবর্ণা এখানে স্বামীর সঙ্গে দু একবার এসেছে, তবে একা এই প্রথম। কিন্তু আসলে কাটুর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে—শুধু চিরুণী সমেত হাত তুললো সুবর্ণাকে নমস্কার করবার জন্য।

—নমস্কার!—বলে হাসলে সুবর্ণা মৃদু—এবং বসলো বড় একখানা চেয়ারে।

—একা? নাকি বরুণও সঙ্গে আছে?

একাই—বিশেষ দরকার আপনার সঙ্গে আমার। বসুন—হুকুম করলো সুবর্ণা।

—চা আনতে বলে দিই—বলেই কাটুবাবু আধ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে ফিরে এসে বসলো। চিরুণীটা তখনো তার হাতে। সুবর্ণা আরেকটু হেসে বলল,

—নতুন ছবিটার নায়িকা কে আপনাদের ?

—নায়িকা দুজন ? কেন ? আপনার হাতে কেউ মেয়ে আছে নাকি ?

—না—যা প্রশ্ন করছি, অনুগ্রহ করে জবাব দিলে খুসী হই।

—নায়িকার নাম দূর্ব্বা—

—দূর্ব্বা ! থাকে কোথায় সে ?

—থাকে মানিকতলার সাত নম্বর সম্বুদ্ধ লেনে—কেন বলুন তো ?

—তাকে আমি দেখতে চাই ! অসামান্যা সুন্দরী নাকি সে ?

—আপনার থেকে নয়—কাটু হাসলো একটু !

—সত্যি বলুন ; আমার রূপের প্রশংসা শুনতে আসিনি এখানে !

—সত্যিই বলছি—কাটু আবার হাসলো—আপনার মত মোহকরী রূপ তার কিছুই নেই—দেবীর মতন দেখতে ; তবে আমাদের চরিত্রের জন্য ঐ রকমই দরকার।

—আমার রূপটা খুব মোহকরী নাকি ?—সুবর্ণা প্রশ্নের সঙ্গে তীব্রভাবে তাকালো। কাটু ঠিক বুঝতে পারছে না, সুবর্ণা চটছে কি খুসী হচ্ছে। কিন্তু সে অতিশয় দুঃসাহসী। তবু কথাটা বলবার পূর্ব্বে একবার ভেবে নিয়ে বলল—

—সুবর্ণাদেবি, আপনি যে কোথায় নারী, কোথায় আপনার মানবীত্ব, বরুণ আবিষ্কার করতে পারে নি। আদর্শের দিকে 'দেবী' দেখতে শুনতে বেশ, কিন্তু মানুষের কাছে মানবীই বড়—বৃহৎ, মহৎ, মোহকরী আর মধুর !

—সত্যি সাহিত্যিক হয়ে উঠলেন কাটুবাবু ?

—না—হই নি, হতে চাইনে। সাহিত্যিক করে কল্পনার জগৎ নিয়ে বিচরণ আর আমরা করি বাস্তব মানুষ নিয়ে কারবার—সাহিত্যিকের ধর্ম্ম আদর্শবাদ আর আমাদের ধর্ম্ম···

—বাস্তববাদ···

—না দেবি—ওটা আধুনিক কথা। বাস্তব নিয়ে কাজ করি বলেই আমরা বাস্তববাদী নই—আমরা আবিষ্কারবাদী, বিশ্লেষক বৈজ্ঞানিক। মানুষের দেহমনের অসীম রহস্যের ইন্দ্রজালকে আমরা দেখতে চাই, সেখানে কি আছে।

—আমার মধ্যে কি দেখলেন?—প্রশ্নটার সঙ্গে সুবর্ণা সুমিষ্ট শঙ্কিত হাসি হাসলো।

—দেখেছি, আপনি সব স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও বন্দিনী। আপনার মানবী মহিমা মর্য্যাদা পেল না বরুণের কাছে, বরং অপমানিত হোল, যার ফলে আজ আমার ফ্লাটে আপনার আবির্ভাব ···

—অর্থাৎ?—তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো সুবর্ণা,—কি বলতে চায় কাটু?

—অর্থাৎ বহুপুষ্পলোভী বরুণ দেখতে পেল না যে তার বাড়ীতে গোলাপ ফুল ফুটে আছে, তুচ্ছ দূর্ব্বার জন্য আগ্রহ অনাবশ্যক। গোলাপ অকারণ অপমানিত হচ্ছে। বেয়ারা চা নিয়ে এল, কিন্তু সুবর্ণা সেদিকে না তাকিয়ে বলল অকস্মাৎ,

—কথায় এত অলঙ্কার দিতে কোথায় শিখলেন কাটুবাবু? কোনো সাহিত্যিক সংগমে গিয়ে পড়েছেন নাকি?

—হবে—কাটু ট্রেখানা এগিয়ে দিতে দিতে বলল।

—কিন্তু আপনাদের সিনেমা জগতে তো এ সব ভাষা চলে না—সেখানে চলে চিৎপুরী হিউমার—আর চোর-চণ্ডালের ভাষা—ব্যাপার কি?

—সিনেমা এতকাল শবের মত ছিল দেবি—মৃত দেহে আত্মার

নিস্ফল—তাই তাকে সাজাতে দরকার মৃত্তিকা, মার্ব্বেল, মালা আর মায়াকান্না!

—অনুপ্রাসের ভাষাটা সত্যি আপনি আয়ত্ত করেছেন—সুবর্ণা না হেসে পারলো না—কিন্তু কোথায় শিখলেন?—শুধুলো।

—সেকথা থাক—চা খান—আমি এখানে অলঙ্কার দিয়ে কথা বলছি, কারণ আমি সিনেমার শবদেহের সঙ্গে কথা বলছিনে - সত্যিকার একটি জীবিত মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি—ভাষার অলঙ্কার যেখানে ভাবকে সুন্দর করে!

—চমৎকার বলেছেন? আমি তাহলে জীবিত মেয়ে অর্থাৎ মহৎ মানবী?

—নিশ্চয়ই! আপনার মহত্বটা প্রকাশ থাকলেও মানবীত্ব মূল্য পেল না, কারণ আপনাকে আবিষ্কার করার শক্তি বরুণের নেই। কারণ বরুণ নারীত্ব চায় না, চায় নূতন। অথচ আপনিই নিত্য নূতনরূপে তাকে মুগ্ধ করতে পারতেন—সে শক্তি আছে আপনার।

—কিসে বুঝলেন?—চা-টা প্রায় শেষ করে সুবর্ণা শুধুলো।

—সুবর্ণা দেবি—কাটু বললো—পুরুষের চোখে এটা ধরা পড়তে দেরী হয় না। বরুণ প্রেমিক হতে পারে, পুরুষ নয়, শিক্ষিত হতে পারে সাহসী নয়, সুন্দর হতে পারে, সুদৃঢ় নয়—কাটু একটু ইতঃস্তত করলো—সোনার গহণায় নারীকে সাজাতে পারে—কিন্তু তার নারীত্বকে আকর্ষণ করে আনতে সে অক্ষম—তাহলে ধনী স্বামী তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রেম লাভ করতে পারতো।

—কে সক্ষম?—সুবর্ণার কণ্ঠে প্রশ্নটা দুর্ব্বল হয়ে আসছে যেন?

—সুদৃঢ় পেশী—যাকে বলে আয়রন নার্ভ! অলঙ্কার নারীর আয়ত্তে, পুরুষের আয়ত্তে অলঙ্কৃত বীর্য্য—নারীত্ব যেখানে নত হয়ে বন্দনা জানায়।

কাটু অকস্মাৎ সুবর্ণার বাঁহাতখানা তুলে নিয়ে বললো,—শুনুন সুবর্ণা দেবি—দূর্ব্বার খোঁজ করার মত হীনতা আপনার কেন জাগলো? সামান্য একজন অভিনেত্রী সে—আপনি অভিজাতা, অসাধারণীয়া—যে কোন পুরুষের বাঞ্ছিতা—কেন আপনি এই অপমান সহ্য করছেন?

সুবর্ণা যেন নির্ব্বোধ বনে গেছে। একি করলো সে? কেন এল ও এখানে? কিন্তু কাটুর কামনাতীক্ষ্ণ স্পর্শ সুরার মত ওর শিরায় সঞ্চারিত হচ্ছে, বলল, —ছাড়ুন—হাতটায় ব্যথা হয়ে গেল।

—ব্যথার দরকার—"ইক্ষু কি দেয় রস না পীড়িলে" কাটু অকস্মাৎ ভারতচন্দ্রকে টেনে আনলো। কিন্তু লাইনটা সুবর্ণার পড়া আছে। উঠে সে বলল কাটুকে, আপনি একটু বেশী ভাবেন আমার সম্বন্ধে কাটুবাবু!

—ভাবি—তার কারণ অতিশয় সহজ, যেখানে আপনি মহিমান্বিতা নারী, বরুণ সেখানে পৌছাতে পারেনি—পারবেও না কোন দিন; আপনি ব্যর্থ হচ্ছেন।

—আপনি সার্থক করতে পারতেন নাকি? অকস্মাৎ অতর্কিত-ভাবে কথাটা বেরিয়ে গেল সুবর্ণার মুখ দিয়ে। ওর আজন্ম-অভ্যস্ত চটুল বচন ওকে নিষ্ঠুর ভাবে বিড়ম্বিত করবে—বুঝতে পেরেই চেয়ার থেকে উঠে যাচ্ছে সুবর্ণা,

—অনেক ধন্যবাদ চা খাওয়ানোর জন্য—চল্লাম এখন।

—না বসো—কাটু ত্বরিতে ওর হাতখানা ধরে ফেললো, বলল, তোমার ব্যর্থ আসা যাওয়ার বেদনা তোমার থেকে আমি বেশী অনুভব করি সুবর্ণা—বসো তোমায় আজ একটা কথা বলবো—দীর্ঘ দিনের এই, প্রতীক্ষিত সুযোগ আজ এসেছে আমার...

সুবর্ণাকে টেনে কাটু চেয়ারে বসিয়ে দিল আবার; তারপর কত কি যে সে বলে গেল, সুবর্ণার কিছুই প্রায় মনে পড়ে না। তার শুধুই

মনে পড়তে লাগলো, স্বামীর উপর অভিমান করে সে এই লোকটির কাছে দূর্ব্বার ঠিকানা জানতে এসেছিল,—তাঁর আগমনটাকে কাটু আবির্ভাব এবং অভিসার মনে করেছে! হয়ত তারও বেশী—আত্মদান, আত্মসমর্পণ। একটুক্ষণ পরে সম্বিতলব্ধা সুবর্ণা বলল,—ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন কাটুবাবু, আপনার কাছে আসা আমার ভুল হয়েছিল, ছাড়ুন।

—না সুবর্ণা, ভুল তোমার হয়নি ; তোমার অন্তঃপ্রকৃতির অনায়াস প্রকাশ এটা—বরুণের প্রেম তোমায় সুখী করতে পারেনি—এ সত্য আমি জানি—তবু আমি চেয়েছিলাম, বরুণ তোমায় ভালবাসবে, কোন দিন না কোনো দিন এবং তুমি সুখী হতেও পারবে। কিন্তু তা হবার নয় ; বরুণ মায়া-মৃগের পানে ছুটছে···বসো আরেকটু, আমার অনেক কথা বলবার আছে।

—থাক ও আর বলে কাজ নেই, বলেই সুবর্ণা ঝটিতি বেরিয়ে পড়ল বারান্দায়—তারপর কোনদিকে সিঁড়িটা, দেখতে গিয়ে দেখলো সামনে খুকীকে কোলে নিয়ে বরুণ দাঁড়িয়ে।

স্তম্ভিত সুবর্ণা বিবর্ণা হয়ে যেতে পারতো, কিন্তু আশ্চর্য্য ওর শিক্ষা, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি। পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যে নিজকে স্থির করে নিয়ে বলল, সকাল থেকে কোথায় ঘুরছিলে মেয়েটাকে নিয়ে? দাও। সুবর্ণা হাত বাড়াল খুকীকে কোলে নেবার জন্য, কিন্তু বরুণ মেয়েকে তেমনি করে ধরে বলল,—তোমার এখানকার কাজ হয়েছে সুবর্ণা ?

—হ্যাঁ -না, এখানে কি কাজ ? খুকীকে খুঁজতে এসেছিলাম। দাও ওকে······

—থাক! শাড়ীখানা ময়লা হয়ে যাবে—বলেই বরুণ পাশকেটে চলে এল খুকীকে নিয়ে কাটুর বসবার ঘরে। কাটু দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে। বরুণ নির্মিমেষনেত্রে দেখতে লাগলো কাটুর হাস্য-মধুর মুখখানা —পরিম্লাত যেন!

—মেয়েটাতে আমারও ভাগ আছে—সুবর্ণা সরোষে গর্জন ছাড়লো বাইরে থেকে।

—না সুবর্ণা, তোমার মত ও হয়নি—সবটাই আমার। গর্ভে ওকে ধারণ করবার জন্য তোমায় যথেষ্ট মূল্য দিচ্ছি—এই স্বাধীনতা, এই স্বেচ্ছাচারিতা, এই স্বৈরাচার—তার একটা মাত্র কারণ, তুমি আমার সন্তানের জননী—যাও, বাড়ী যাও! আমার এখানে কাজ আছে অনেক!

সুবর্ণা বলতে চাইল যে সে এখানে শুধু দূর্ব্বার ঠিকানা নেবার জন্যই এসেছিল, অন্য আর কোনো কারণ নেই—কিন্তু বরুণের কথাগুলোতে তার আভিজাত্য-রুচি, অভিমানী-মন, নিদারুণ আহত হোলো—কিছুই সে বললো না, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল শুধু বরুণের দিকে নয়, কাটুর পানে কঠোর একটা দৃষ্টি হেনে।

বরুণ চেয়ারে বসে বল্‌ছে কাটুকে—

—আজকার সুটিং-এর জন্য সব তৈরী তো কাটু? অতসীর সঙ্গে আজ আমার অভিনয়; দেখতো আমার পার্টটা।

কাটু কৈফিয়তের মত বলতে চাইল,—সুবর্ণা দেবী এসেছিলেন দূর্ব্বার ঠিকানা জানতে……

—থাক ওর কথা—দেখ, আমার পার্ট ঠিক হচ্ছে কিনা—খুকীকে চেয়ারে বসিয়ে বরুণ অভিনয়ের রিহার্সেল আরম্ভ করলো।

নতুনের এই তীব্র প্রতিযোগিতার যুগে নিত্য নূতন ফিল্মকোম্পানী জন্মাচ্ছে আর মরছে, কিন্তু 'রঞ্জাবতী ফিল্ম'-এর বরাত ভাল,—ছবিখানা ভালই হচ্ছে ওদের। নগদ টাকা পাওয়ার জন্য ষ্টুডিওর তরফ থেকে ওদের যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হয়—ডাইরেক্টার কাটুবাবু নিজে অংশীদার—

তাই ধনিক-ডোবাবার মতলব তার নেই—খরচপত্র বেশ হিসাবমত চলে। অনর্থক অপব্যয় যেটুকু হয়েছে, তা দূর্ব্বার ব্যাপারে।

কিন্তু দূর্ব্বা অসাধারণ ভাল অভিনয় করছে। রাজকুমারী অতসীকে আচারে-ব্যবহারে, ভাবে-ভঙ্গীতে-ভাষায় চিনবার উপায় নেই যে সে নিতান্ত দরিদ্র জনৈক পণ্ডিতের নাতনী—পরণের কাপড় অভাবে বাইরে বেরুতে পারতো না এই মাসখানেক পূর্ব্বেও।

স্ক্রিপ্ট লেখার ব্যাপার নিয়ে চিণ্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল কিন্তু দূর্ব্বা মাঝে পড়ে সে গোলযোগ মিটিয়ে দিয়েছে; অবান্তর দৃশ্য বা অসম্ভব জায়গায় গান ইত্যাদি প্রচলিত বস্তু বাদ দিতে হয়েছে কাটুকে—কারণ দূর্ব্বা বরুণের দৃষ্টি-স্নিগ্ধা, আর কাটুর নৈতিক দূর্ব্বলতা ভালভাবেই প্রকাশ হয়ে গেছে বরুণের কাছে।

হাজার হোক্ গরীবের ছেলে—বরাতজোরে নাম করেছে এবং ঐ বরাতজোরেই বরুণের মত বন্ধু পেয়েছে—নইলে ত্রিশ হাজার টাকার শেয়ার-হোল্ডার হবার মত কোন যোগ্যতা তার কখনো হোত না। কিন্তু কাটুর মনের মধ্যে যে অগাধ আশা সঞ্চিত হয়ে উঠছে সেই মুহূর্ত্ত থেকে, তার বিরাটত্বের দিকে তাকিয়ে ও অবাক্ হয়ে যাচ্ছে—ভাবে—না, এ হবার নয়, এ আশা পূর্ণ হবে না। কিন্তু আশা নামক অবাস্তব বস্তুটা আশাই—ওকে কেউ ছাড়তে চায় না—কাটুও চাইল না।

ওদিকে গোবিন্দর অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। প্রায়-ষোড়শী কন্যার জন্য পাত্রের অনুসন্ধান স্থগিত রেখে সে ক্রমাগত দূর্ব্বার দরজায় ধর্ণা দিচ্ছে, কবে ফিল্ম কোম্পানী খোলা হবে—কে হবে পরিচালক আর কি বই অভিনীত হবে—এবং—গোবিন্দ মনে মনে ভাবে, কোনো একটা ভূমিকায় তাকে নামানো যায় কি না, দূর্ব্বাকে বলবে।

গোবিন্দর এষ্টিমেট পাঁচ লক্ষ টাকা! তিন লক্ষ সে এখুনি দিতে

চায়—বাকীটা দরকার হলেই দেবে। দূর্ব্বা এবার কাজে নামুক ; কিন্তু দূর্ব্বা গা' মাখছে না। কারণটা জানবার জন্য প্রশ্ন করে গোবিন্দ জেনেছে যে, সিনেমার সব ব্যাপার ভাল ভাবে না জেনে দূর্ব্বা এগুতে চায় না ; পরের টাকা নষ্ট করবার তার ইচ্ছে নেই।

গোবিন্দ কয়েকদিন গিয়ে রঞ্জাবতী নাটকের 'সুটিং' দেখে এসেছে ; ওখানেই সে বড়াই করে' প্রকাশ করে ফেলেছিল যে, সে নিজেই একটা কোম্পানী খুলবে। এই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল ভাল ভাবেই ভোগ করছে গোবিন্দ এখন। মধুলোভী মৌমাছির দল গোবিন্দ-রূপী মধুচক্রে হানা দিতে আরম্ভ করেছে—হবু ডিরেক্টার—ওদের দালাল, ভবিষ্যৎ আর্টিষ্ট এবং অতীত দেউলেগণ! গোবিন্দ কিন্তু ভুলবায় লোক নয়—সে সকলকে বলে দিল—দূর্ব্বা ডাইরেক্টার এবং প্রধানা অভিনেত্রী না হলে সে নামবে না। অতএব দূর্ব্বার বাড়ীতেও হানা দিতে লাগলো বহু ব্যক্তি। বিরক্ত দূর্ব্বা বাইরের ঘরে এসে চিণ্ময়কে বলল—

—তোমার মত দ্বারয়ানকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে হয় ; ওদের ঢুকতে দাও কেন ?

—দাদুর কাছে আমি ওদের পাঠিয়ে দিই দূর্ব্বা!—চিণ্ময় ভয়ে ভয়ে জানালো।

—দাদু এখন আর আমার অভিভাবক নয়, জানো মুখ্যু ? এখন আমার অভিভাবক তুমি। ওদের ঝামেলা দাদুর ঘাড়ে আর চড়িও না ; তাঁকে শান্তিতে মরতে দাও এবার।

—ওরা জানে না, আমি তোমার কে।—ভাবে, আমি তোমার প্রেমস্থ একজন!

—ওদের বলে দিও, তুমি আমার সব!—দূর্ব্বা ত্বরিতে ভেতরে চলে এল। আর চিণ্ময়! হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো খোলা দরজাটার দিকে!

কিন্তু এভাবে ক'দিন চালাতে পারবে চিণ্ময় ! অন্তরের এই অন্তহীন আকর্ষণকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য ওর নেই। দূর্ব্বা জানে ওর দুর্ব্বলতা, এবং জানে বলেই এমন করে তাকে নিয়ে খেলাচ্ছে !—কিন্তু দূর্ব্বা কি সত্যি খেলাচ্ছে তাকে নিয়ে? না—চিণ্ময় ভুল করছে। নিদারুণ ভুল। এই অসাধারণীয়া আশ্চর্য্য নিষ্ঠাবতী তরুণীর বাক্য এবং কর্ম্ম দেখে তার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা একান্তই ভুল হচ্ছে চিণ্ময়ের।

অকস্মাৎ শাড়ীখানা বদলে দূর্ব্বা এসে বলল চিণ্ময়কে,—চলো, তোমার স্যুট্ হয়তো তৈরী হয়ে গেছে, নিয়ে আসি······

—এ সময় ট্রামে বড্ড ভিড় থাকে দূর্ব্বা—তার ওপর আজ নাকি খেলা আছে—ফুটবল খেলা, মানে কলকাতার লোকের হিষ্টিরিয়া···চিণ্ময় জবাব দিল।

—ট্যাক্সিতে যাব—অভাব কি আমাদের—যাও, কাপড় পর—হুকুম হল।

নিঃশব্দে উঠে চিণ্ময় কাপড় পরতে গেল; দূর্ব্বা ওর টেবিল থেকে খবরের কাগজ তুলে চোখ বুলিয়ে চলেছে—সিনেমার বিজ্ঞাপন—"—আসছে, আসছে, আসছে—দুর্ব্বার গতিতে দূর্ব্বা চৌধুরী—"

দূর্ব্বার একখানা ছবি ওই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে। কী বিশ্রী বিজ্ঞাপন! কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূর্ব্বা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার কুড়িয়ে নিল—ব্যবসাদারের বৈষয়িক বিজ্ঞাপন—বলবার কি আছে? দূর্ব্বার রূপটাকে দেখিয়ে ওরা অর্থ অর্জন করতে চায়—দেহপসারিণী না বলে রূপপসারিণী বলা উচিৎ। হ্যাঁ—রূপপসারিণী দূর্ব্বা আজ—রূপ দেখিয়ে টাকা রোজগার করতে হচ্ছে তাকে—যদিও দেহ তার এখনো অকলঙ্কিত!—কিন্তু···

—চলো!—চিণ্ময় ধুতি-পাঞ্জাবী পরে এসে দাঁড়ালো। দেখলো দূর্ব্বা

এক নিমেষ তাকে, তারপর কিছু না বলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। ট্যাক্সিতে উঠলো দুজনে। সহরের রাস্তার দুপাশে পোষ্টার—'কুমারী দূর্ব্বা চৌধুরী—' যেন নামাবলী পরেছে সারা কলকাতা দূর্ব্বার নামের। লেখা রয়েছে, 'শ্যামস্নিগ্ধা সুরূপার বিচিত্র বিস্ময়কর আবির্ভাব—দূর্ব্বা চৌধুরী······'

সেই রূপ—সেই রূপোপজীবিনী দূর্ব্বা ট্যাক্সিতে। কুমারী দূর্ব্বা! হ্যাঁ, কুমারী কথাটা তো মিথ্যা নয়—দূর্ব্বার কৌমার্য্য অটুট, অনাঘ্রাত, অক্ষত! পাশে-বসা চিণ্ময়ের দিকে চেয়ে দূর্ব্বা বলল,—

"কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী" নয়, চিণুদা, "কুমারী দূর্ব্বা চিণুদার সাথে"

—হ্যাঁ, কি তার হয়েছে? তুমি তো কুমারীই! মিথ্যে লেখেনি ওরা কিছু!

—তোমার স্বার্থটা আত্যন্তিক হয়ে উঠছে চিণুদা'—ভাষাটা আন্তরিক হোল না!

—অর্থাৎ!

—অর্থাৎ তুমি চাইছ, আমি কুমারী দূর্ব্বা হই! তাহলে তুমি আমায় বিয়ে করতে পার—কেমন? কিন্তু তুমি জান আমি বি-ধ-বা—

—তোমাকে বিয়ে করা চলে না দূর্ব্বা, তুমি দেবচরণে উৎসর্গিতা দেবদাসী—বিয়ে তোমায় দেবতারাই করতে পারে—আমি নিতান্তই মানুষ! তাই মানুষের দুর্ব্বলতা আমার আছে—আমি কামজয়ী শিব নই, রিপুজয়ী ঋষি নই!

—তোমায় আমি নীলকণ্ঠ করবো চিণুদা, আকণ্ঠ বিষ পান করে অমৃতই পরিবেশন করবে।

——না দূর্ব্বা, থাক; মানুষের জগতে মৃত্যুঞ্জয়ের থেকে বেশি দরকার মৃত্যুশীল মানুষের।

—কেন?···দূর্ব্বা তীক্ষ্ণ প্রশ্ন করলো।

—কারণ, লৌকিক জগতে শিব অলৌকিক, অপ্রয়োজনীয়—তাছাড়া অবাস্তব।

—শিব অলৌকিক নয় চিণুদা, সম্পূর্ণ লৌকিক এবং বাস্তব। পুরুষের যে শ্রেষ্ঠ পৌরুষ, যে বীর্য্যমহিমা, যে সাধনার সংযম, যে সত্যাচার, তাই শিবময়—নারী-পুরুষের ক্লেদপঙ্কিল কামার্ত্ততা সেখানে ভস্ম হয়, তাই তিনি মদন-ভস্মকারী—বিশ্বের সব বিষ বহনক্ষম বলে তিনি নীলকণ্ঠ, প্রেমের অমৃতক্ষরণে তিনি সব-কিছুকে অ-মৃত করেন, তাই মৃত্যুঞ্জয়; মৃত্যু এখানে দেহের মৃত্যু নয়, এ মৃত্যু মনের ক্লেদাক্ত কামনার মৃত্যু!

—থাক দূর্ব্বা—তোমার কথাগুলো অমৃতবৎ লাগছে না, বিষ মনে হচ্ছে!

—পান কর আকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ হয়ে যাবে!—দূর্ব্বা ওকে ছুঁলো একটু!

—থাক—চিণ্ময় কিছু তফাতে সরে বসে একখানা বই খুললো।

হাসছে দূর্ব্বা!

বিড়ালের ইন্দুর নিয়ে খেলা, অথবা বাঘের খেলা বাচ্চাদের নিয়ে, কিম্বা···চিণ্ময় আর মাথা তুললো না। দোকানের কাছে গাড়ী আসতেই দুজনে নেমে গেল। পোষাক তৈরী আছে, প'রে দেখে নেবে চিণ্ময়—দূর্ব্বা বলল এতোক্ষণে,—ঠিক ফিট্ করেছে কি না, দেখে তুমি রেঁস্তোরায় এসো, আমি বসছিগে।

দোকানেরই এক কোণায় রেঁস্তোরা—অভিজাতগণ এখানে বাজার করতে এসে চা-খাবার খান। দূর্ব্বা চলে গেল সেখানে, বসলো গিয়ে একটা চেয়ারে। ঝলমল করছে সর্ব্বাঙ্গ রূপের বিদ্যুতে। কাছেই অন্য একটা টিপয় ঘিরে তিনটি তরুণী চা খাচ্ছিল, তাদের একজন বলল, —বাঃ, মেয়েটা কি সুন্দর রে!

কথাটা শুনতে পেল দূর্ব্বা, তাকালো ওদের পানে হেসে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে—

লজ্জিতা মেয়েটি বলল হেসে। দূর্ব্বা জানে, দেখেছে ছবির পোষ্টারে; তবু শুধুলো—কোথায় দেখেছেন?

—ঠিক মনে পড়ছে না—খুব চেনা মনে হচ্ছে!

ইতিমধ্যে 'বয়' এসে শুধুলো, কি দেবে দূর্ব্বাকে খাবার।

—আমার সঙ্গী এখুনি আসবে, তারপর খাবার দিও—বলে দূর্ব্বা তাকে বিদায় করে দিল। কৌতূহলী মেয়ে তিনটি ওর দিকে চেয়ে বলল, —আপনার স্বামী সঙ্গে আছেন বুঝি?

দূর্ব্বা কিছু বললো না, মৃদু হাসলো শুধু। ঠিক সেই সময় এল চিণ্ময়, কথাটা সে শুনতে পেয়েছে এবং দূর্ব্বার হাসিটাও দেখেছে; বলল, —পোষাকের একটু দেরী হবে, বললেন।

—বেশ, বসো, চা,খাও—কি খাবে? চপ্ না ওমলেট্!

—তুমিই জান কি খাব।

—সেকি! তুমি খাবে, আমি জানবো কি করে?

—হ্যাঁ, তুমিই জানবে। না জানবেতো আমার কে তুমি? অবশ্যই জানতে হবে তোমায়!

চিণ্ময়ের কথায় ঝাঁজ রয়েছে কিন্তু এটা দারুচিনির ঝাঁজ—সুগন্ধী, সুমধুর, সুতৃপ্তিকর। দূর্ব্বা হেসে তাকালো ওর মুখ পানে, তারপর টেনে বসিয়ে বলল,—বেশ, আমিই জানি—বসো···বয়!—ডাক দিল সে বয়কে।

বয় এলে সে খাদ্য আনবার হুকুম দিয়ে চিণ্ময়ের দিকে চাইল, চিণ্ময় সেই মোটা বইখানা পড়ছে। অন্য মেয়েগুলি দেখছে ওদের। হঠাৎ একজন বলল,—ওটা কি বই পড়ছেন আপনার বর?

দূর্ব্বা জবাব না দিয়ে আবার মৃদু হাসলো; বিস্মিত চিণ্ময় ওর হাসিটার অর্থ কিছু মাত্র বুঝতে পারলো না। দূর্ব্বা এদের পূর্ব্বে কি

বলেছে, তার জানা নেই! কিন্তু মেয়েটিকে জবাব দেওয়া দরকার সেই জবাব দিল,—সাহিত্য দর্পণ!

—আপনি কি এম, এ, পরীক্ষা দেবেন? চিণ্ময়কেই মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করলো এবার।

—ইচ্ছে আছে বাংলায় দেবার; বলে চিণ্ময় বইএ দৃষ্টি দিল আবার।

—না—দূর্ব্বাই বলল মেয়েটিকে—ওসব ওকে দিতে দেব না আমি ভাই, অনর্থক সময় নষ্ট করতে হবে না—চিণ্ময়কেই বললো সে এবার—তার চেয়ে দাদুর কাছে চর্যাপদ আর চরিতামৃত পড়ে নাও—বাকীগুলো আমিই পড়েছি···তোমার আর পড়তে হবে না।

—তার মানে?

—মানে—আমি যেগুলো পড়িনি সেইগুলো পড়লেই তো পূরো পড়া হয়ে যাবে তোমার—হাসছে দূর্ব্বা! মেয়েগুলোও হাসছে। ওদের ভাল লেগেছে দূর্ব্বাকে। বেশ মেয়েটি, স্বচ্ছন্দ, সুরূপা, স্বাস্থ্য-সুন্দরী··· বলল সেই প্রথমটি—আমিও বাংলায় পরীক্ষা দেব এবার।—কিন্তু আপনি 'সময় নষ্ট করা' বলছেন কেন আপনার বরকে?

আবার 'বর' শব্দটা কানে বিঁধলো চিণ্ময়ের। আশ্চর্য্য এই নির্ব্বোধ মেয়েগুলো! দূর্ব্বার সিঁথিতে সিঁদুর নেই, দেখছে না কেন ওরা? কিন্তু মনে পড়লো—সিঁন্দুর আজকাল সব মেয়ে পরে না, বিশেষ আধুনিকারা!

—পড়তে ওকে হবেই, তবে ডিগ্রী ওর দরকার নেই—ওতে শুধু অহমিকা বাড়ে। ল্যাজ-লম্বা জীবগুলো লজ্জার ধার ধারে না—ও আমার চাইনে। দূর্ব্বা জবাব দিল মেয়েটিকে।

—সিংহের ল্যাজ খুব বড়, সে পশুরাজ—চিণ্ময় যেন ক্রুদ্ধ হয়েই বলল কথাটা।

—পশুরাজ মানে পাশব শক্তির রাজা—আমার প্রিয়কে আমি পশুর উর্দ্ধে রাখতে চাই,—নির্ম্মল, নিরুপাধি, নির্ব্বিশেষ—রাজা নয়, ভিখারীও নয়!

—কি তবে? সন্ন্যাসী!—কঠোর বিদ্রূপমাখা প্রশ্ন বেরুলো চিণ্ময়ের কণ্ঠ থেকে।

—না—অত্যন্ত ধীরে জবাব দিল দূর্ব্বা—না বন্ধু, আমার প্রিয়তম হবে পুরুষ—পুরুষসিংহ নয়, হিন্‌স্ ধাতু তাতে থাকবেনা, পুরুষ-প্রবর নয়, প্রবরত্ব তাতে আমি আরোপ করবো না—শুধু পুরুষ, শান্ত-শুদ্ধ-সংযত, বিজিতেন্দ্রিয়, পৌরুষ যার অধিগত, পুরুষকার যার আয়ত্তে, সংসার আর সন্ন্যাসের উর্দ্ধে যে শ্মশানভূমি, সেই শিবের কল্যাণের আসনে যার অধিকার।

—মিষ্টি!—বিরক্তির সঙ্গে ইংরাজি কথাটা উচ্চারণ করলো চিণ্ময়। বয় খাবার দিল, চিণ্ময় ছুরি-কাঁটা নিয়ে আরম্ভ করে দিল খেতে। দূর্ব্বা হাসছে। মেয়েটি বলল—আপনি সত্যি মিষ্টি, ওঁকে কেন ধোঁকা দিচ্ছেন এমন করে?

—ওকে খনি থেকে তুলেছি মাত্র—কাটাই-ছাঁটাই করে তবে তো গলার হারে গাঁথবো!

—কদ্দিন বিয়ে হয়েছে আপনাদের?

—বিয়ে—একটু চঞ্চল হলো দূর্ব্বা, চিণ্ময় লক্ষ্য করলো—কিন্তু দূর্ব্বা হেসে বলল,—বিয়ে আমাদের অনাদিকাল থেকে হয়ে আছে আত্মার আত্মায়, মানুষটাকে পেলাম মাত্র সেদিন, মাসখানেক হবে।

চিণ্ময় অত্যন্ত বিরক্ত হচ্ছে এই মিথ্যা কথায়। দূর্ব্বার সঙ্গে বিয়ে তার হয়নি এবং কোনোদিন হবার সম্ভাবনাও আছে বলে সে মনে করে না। কিন্তু দূর্ব্বা যে ভাষা ব্যবহার করলো, তাতে মিথ্যার গন্ধ নেই—অর্থ তার যাই ওরা বুঝুক না।

মেয়েগুলি নমস্কার জানিয়ে চলে যাওয়ার পর চিণ্ময় বলল,

—ওরা কি বুঝে গেল তোমার আমার সম্পর্কটা ?

—এ সম্পর্ক আধ্যাত্মিক, ওদের বোঝাবার জন্য পাতানো হয় নি। খেয়ে নাও—যেতে হবে ষ্টুডিওতে।

চিণ্ময় আর কিছু না বলে কাঁটা চামচ নিয়ে পড়ল।

উঠতে দেরী হয়ে গেছে সুবর্ণার; কারণ রাত্রিজাগরণ। ক্লাব বা ঐরকম কিছুর জন্য নয়; মানসিক উত্তেজনার জন্য। কাটুর সঙ্গে তার কথা -এবং বরুণের আকস্মিক আবির্ভাবই এর জন্য দায়ী কিন্তু আরো কিছু আছে সংগোপনে। কাটুর অসাধারণ দুঃসাহস, আশ্চর্য্য বাক্‌পটুতা এবং অদ্ভুত সংযম। সংযমটারও প্রশংসা করলো সুবর্ণা এই জন্য যে, একলা ঘরে একাকিনী পেয়েও কাটু অস্বাভাবিক অপমান কিছু করে নি সুবর্ণার!

অনেকক্ষণ ভাবলো সুবর্ণা বসে বসে। ভাবতে লাগলো বরুণের সঙ্গে তার বিবাহ এবং ভালবাসার কথা কিন্তু—প্রেম নামক ব্যাপারটার সঙ্গে সত্য পরিচয় নেই সুবর্ণার। যে দৈহিক ভোগস্পৃহা দিন কয়েকের জন্য ওদের বিবাহিত জীবনে দেখা দিয়েছিল, খুকীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তা নিবে গেছে,—অথচ আশ্চর্য্য এই যে, সুবর্ণার রূপ-যৌবন অটুট শুধু নয়—অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু বরুণকে সে বাঁধতে পারলো না। কি এর কারণ, কোনোদিন ভেবে দেখবার চেষ্টা করেনি সুবর্ণা, আজও করলো না। চিন্তাই করলো না যে, সন্তান জননের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বামী-নিষ্ঠা বৃদ্ধির পথে না গিয়ে খর্ব্ব হতে হতে লোপ পেয়ে গেছে। বর্ত্তমানে সে বরুণের গৃহবাসিনী বন্দিনী ছাড়া নিজকে আর কিছু মনে করতে পারে না। বিবাহিত জীবনে এ যে কতখানি ক্ষতিকর, সুবর্ণার

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মন সেদিক দিয়ে না ভেবে শুধু ভাবতে লাগলো, তার দেহের, তার রূপযৌবনের, তার আত্মার অপমান করছে বরুণ! ভালই। সুবর্ণাও গ্রাহ্য করবে না।

এই বিপরীত চিন্তা সুবর্ণাকে বিপথে চালিয়েছে, এবং আজ সেই আগুনে আহুতি দিল কাটু। কাটু নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তি ছিল তার কাছে। কাটুকে সুবর্ণা বরুণের করুণাপুষ্ট পোষা কুকুর ছাড়া আর কিছু মনে করতো না; কিন্তু তার চোখে আজ ঐ কাটুই বিশেষ একটা রূপ নিয়ে দেখা দিল—একজন পুরুষ রূপে।

পুরুষের যে পৌরুষ নারীর অন্তরে অভিলাষ জাগায়—যে সাহস এবং সংযম নারীকে মোহিত করে—বীর পূজার সেই বীর্য্যবত্তার নিকৃষ্টতম স্তর এই দুঃশ্চরিত্রতা—যাদের ইংরাজী ভাষায় বলা হয় 'ভিলিয়ান'। কিন্তু এর একটা আশ্চর্য্য মোহকরী শক্তি আছে সাধারণ মানবীর কাছে—দেহ এবং মন যাদের কামনাতুর। সুবর্ণার সৃষ্টিধর্মী দেহমনে সেই আকাঙ্খা জাগ্রত হতে দেরী হোল ঘণ্টা কয়েক কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সে অনুভব করলো, কাটু 'ভিলিয়ান' কিন্তু কাটুই তার জীবনের সার্থকতার সেতু! এই আশ্চর্য্য এবং অকল্যাণকর অনুভূতিটার পরবর্ত্তি অধ্যায় নিয়ে আর মাথা ঘামাতে চাইল না সুবর্ণা। কাটুর অসাধারণ দুঃসাহসের দিকে অগ্নিশিখালুব্ধ পতঙ্গের মত তার মন এগুতে লাগলো। সমস্ত দিন হোল না সুবর্ণা বাড়ী থেকে। অথচ দু-তিন জায়গায় তার যাবার কথা ছিল—টেলিফোন করে জানিয়ে দিল—শরীর খারাপ। শুধু সজাগ সংবাদ নিতে লাগলো—বরুণ কখন ফিরলো এবং আবার কখন বেরিয়ে গেল। খুকী আয়ার কাছেই থাকে—আর বাবার কাছে। মাঝে মাঝে ঠাকুরমা অবসর মত তাকে আদর করেন। খুকী সম্বন্ধে সুবর্ণার কিছুই করবার নেই; এমন কি, সুবর্ণাকে খুকী চেনে না বল্লেই মনে হয় সকলের।

দুপুরের খাওয়া সেরে বরুণ আবার বেরিয়ে গেছে, খবর পেল সুবর্ণা। একটা সোফায় শুয়ে সে গড়াচ্ছিল—অকস্মাৎ উঠে বসলো। কাটুর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে; কিন্তু সে জানে, বরুণও সম্ভবতঃ সেখানে থাকবে, কাজেই সুবর্ণা সঠিক খবর জানবার জন্য কাটুর ফ্ল্যাটে ফোন করতে গেল; কিন্তু এভাবে আত্মসমর্পণ সুবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েরা করে না—অত হাল্‌কা হতে পারে না তারা। ফোনের রিসিভার তুলতে গিয়ে থেমে গেল সুবর্ণা—তার পর চলে গেল কাপড় পরতে।

বেরুবে সে,—ষ্টুডিওতে গিয়ে কাটুর সঙ্গে দেখা করবে। সে জানে, আজ তাদের সুটিং আছে এবং সেইজন্যই বরুণ খেয়েই বেরিয়ে গেছে। কাটু ডিরেক্টার, কাজেই সেও ষ্টুডিওতে থাকবে। সুবর্ণা কাপড় পরতে পরতে ভাবলো, ষ্টুডিওতে গেলে কারো কিছু বলবার নেই। সুবর্ণা জানাবে যে সে সুটিং দেখতে এসেছে নতুন বইটার। এ রকম আগেও সে গেছে অনেকবার।

গাড়ী চালিয়ে সুবর্ণা চলে এলো ষ্টুডিওতে। নতুন ষ্টুডিও—বরুণেরও অংশ আছে এতে, সেইজন্য সুটিং-ডেট্ ওরা খুশীমত পাবার ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সুবর্ণা জানতো, বরুণের ছবি তোলার কাজ সাধারণতঃ রাত্রে হয়—এ ছবিটার কাজ বরাবর দিনে হচ্ছে কেন? কে জানে!

গাড়ী রেখে সুবর্ণা নেমেই দেখতে পেল—বিরাটকায় জনৈক ব্যক্তি মেক-আপ রুম থেকে বেরিয়ে আসছে—তার সঙ্গে একটি তরুণী এবং তার পেছনে একজন স্যুট্‌পরা ভদ্রলোক! তরুণীর বেশ দেখলেই বোঝা যায়, সেকালের রাজকুমারী সে—কে মেয়েটা?—সুবর্ণার তৎক্ষণাৎ মনে পড়লো সেই ফটোর মেয়ে—যার নাম দূর্ব্বা—দুর্ব্বার দূর্ব্বাদল!

কিন্তু পিছনের স্যুট্‌পরা লোকটিকে চিনতে পারলো না সুবর্ণা—কে ও! রঙ্গাবতী ফিল্ম কোং-এর প্রায় সকলকেই চেনে সুবর্ণা; মিহির, নৃপেন, কাটু তার বিশেষ পরিচিত—কিন্তু এ লোকটি কে? হয়তো নতুন কোনো

অভিনেতা ভেবে সুবর্ণা আর চিন্তা করলো না ও নিয়ে। দূর্ব্বার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য এগিয়ে এল। মেক-আপ রুম থেকে ছবি তোলার জায়গায় যাবার পথ অতি সামান্য,এক মিনিটেরও কম রাস্তা,কাজেই সুবর্ণা তাড়াতাড়ি হেঁটে এসে দূর্ব্বাকে নমস্কার জানিয়ে বলল—আপনিই নায়িকা অতসী,কেমন ?

—হ্যাঁ—দূর্ব্বা জবাব দিয়ে প্রতি নমস্কার করলো এবং শুধুলো—আপনি কি স্যুটিং দেখতে এসেছেন ?

—হ্যাঁ—চলুন, বলে এগিয়ে চললো সে ষ্টুডিওর দিকে। অন্য ঘরে বরুণ মেক-আপ করছিল, ঠিক এই সময় সেও বেরিয়ে এসে দেখলো, দূর্ব্বা আর সুবর্ণা ঢুকছে ছবিতোলার ঘরে।

বরুণের চোখে মুখে অপ্রসন্নতার ভাব ফুটে উঠলো, কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য—পরক্ষণেই চিন্তিত হয়ে উঠলো সে। সুবর্ণার পক্ষে স্যুটিং দেখতে আসা কিছু বিচিত্র বা বিস্ময়কর নয়, কিন্তু সাধারণতঃ সে আসে না। আজ হঠাৎ এল কেন ? দূর্ব্বাকে দেখবার জন্য কিম্বা কাটুর সঙ্গে আরো বিশেষ কোন কথা বলবার জন্য। কিন্তু কাটুর সঙ্গে গোপন কথা বলতে সে এখানে নিশ্চয় আসবে না—কারণ বরুণ এখানে থাকবেই, তার জানা ; অতএব সে দূর্ব্বাকেই দেখতে এসেছে। স্বামী-বরুণ বর্ত্তমানে কার দিকে আকর্ষিত হচ্ছে, জানবার চেষ্টা করা স্ত্রী-সুবর্ণার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং তাহলে বরুণের বলবারও কিছু নেই বিশেষ। বিশেষতঃ কাটুও জানিয়েছে যে সুবর্ণা কাটুর কাছে দূর্ব্বার ঠিকানা জানতেই গিয়েছিল কিন্তু বরুণকেই তো সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারতো সুবর্ণা !

ছবিতোলার বদ্ধ ঘরের একদিকে খানকয়েক চেয়ার পাতা আছে, বসবার জন্য—সেইখানেই বসবে সুবর্ণা, ইতিমধ্যে কাটু তাকে দেখে এগিয়ে এল এবং মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করে বললো—আসুন,এইদিকে।

প্রকাণ্ড 'সেট্'এ কাজ হচ্ছে ; রাণী রঞ্জাবতীর রাজ-অন্তঃপুর।

যুবরাজ মৈনাক সেখানে গিয়ে দেখা করবে প্রেমমুগ্ধা রাজকুমারী অতসীর সঙ্গে। চমৎকার করে সাজানো হয়েছে সেট্—বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে এরই জন্য, দেখলেই বোঝা যায়। কাটু সেই সব দেখিয়ে বেড়াতে লাগলো সুবর্ণাকে। দূর্ব্বা ক্যামেরার সামনে বসে এবং নতুন স্যুটপর চিণ্ময় বসবার যায়গায় একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। বরুণ এসে বসলো চিণ্ময়ের পাশে—সিগারেট একটা চিন্ময়কে দিল, নিজেও একটা ধরালো—কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি—ক্যামেরা, লাইট, সাউণ্ড ঠিক করা হচ্ছে।

সুবর্ণাকে নিয়ে কাটু দেখিয়ে বেড়াচ্ছে সেট্টা। খুব বড় সেট করা হয়েছে—উদ্যান, অলিন্দ, উৎস ইত্যাদি সেকালের রাজবাড়ীতে যা থাকবার কথা—সব করা হয়েছে—যদিও সবই ফাঁকি—যথা ফুল কাগজের, গাছ কাটা ডাল, দেওয়ালগুলো কাগজ দিয়ে তৈরী, কাঠের ফ্রেম—তথাপি সুন্দর করে করা হয়েছে সব। সুবর্ণা দেখে বেড়াচ্ছে—কাটু অকস্মাৎ তার বাঁ হাতখানা ধরলো। সুবর্ণা বিস্মিত হোল না, চেয়ে দেখলো—বরুণ খুব দূরে নেই···তবে এদিকে তাকাচ্ছে না—হেসে বলল,

—ছাড়ুন···আপনাদের নায়িকার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি আমি।

—আমার নিজের নায়িকার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে—কাটু জবাব দিল।

—বেশ, তাকে বলবেন···সুবর্ণা আড়চোখে একবার তাকালো বরুণের দিকে, বরুণ নিঃশব্দে সিগারেট টানছে; স্যুটপরা ভদ্রলোকটিও সিগারেট টানছে, হয়তো ওরা কথা বলছে পরস্পর। ঠিক শুনতে পেলনা সুবর্ণা—মাঝে একটা মার্ব্বেলের দেওয়াল, অর্থাৎ কাগজের বেড়া, বাগানের অংশবিশেষরূপে খাড়া আছে। কাটু অসঙ্কোচে সুবর্ণার হাতে একটু জোর দিয়ে বলল,—আমি জানি, তুমি কি জন্য এসেছ—বরুণকে আর বরদাস্ত করা তোমার উচিৎ হচ্ছে না সুবর্ণা! তোমার নারীত্বের এই

অপমান আমাকে ব্যথা দেয়—তুমি সকল দিকে বঞ্চিতা ; অথচ তুমি যে-কোনো পুরুষের হৃদয়-জয় করবার শক্তি রাখ—আমি তোমায় দীর্ঘদিন দেখে আসছি—পিপাসার মত আমার অন্তরে জাগে তোমার মূর্ত্তি…

কাটু চাইল সুবর্ণার পানে, বিশ্বের সমস্ত ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা যেন সেই চাহনিতে মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—'মহা-বুভুক্ষা' যেন জ্বলন্ত সে দৃষ্টিতে—সুবর্ণা মৃদু হাসলো।

আশ্চর্য্য দুঃসাহস কাটুর ; সে ঐখানেই, অত কাছে, অত লোকের সান্নিধ্যেও সুবর্ণাকে কাছে টেনে বলল আবার—তুমি আমার—তোমায় আমি ওর হাত থেকে উদ্ধার করে আপনার করব, শুধু তোমার সম্মতির অপেক্ষা।—কাটু অকস্মাৎ সুবর্ণার দুই গণ্ডে চুম্বন এঁকে দেবে…

ত্বরিতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সরে এল সুবর্ণা, কপট রাগ করে বলল—যান্! শয়তান কোথাকার!…ও দেখতে পাবে…

—ওকে আমি ভয় করিনে—বিশ্বের কাউকেই ভয় করিনে আমি তোমকে পাওয়ার পথে…

কাটু আবার এসে ধরলো সুবর্ণার দেহবল্লরী…অকস্মাৎ ক্যামেরা-ম্যান হাঁকল,—'লাইট প্লিজ'—অন্য একজন বলল,—মণিটার, অপরজন বলল—ডিরেক্টার কোথায়?

—'ইয়েস'—কাটু এসে দাঁড়ালো সামনে ; সুবর্ণা অন্য দিক দিয়ে ঘুরে এসে বসলো চিণ্ময়ের কাছাকাছি একটা চেয়ারে। বরুণ তখনো সিগারেট টানছে—কারণ, রাজকুমারী অতসীর অভিনয় আগে আরম্ভ হবে—গান আছে একটা। গান অবশ্য আগেই রেকর্ড করা হয়েছে—এখন শুধু ছবি তোলা হবে—কাজেই বরুণের প্রবেশের দেরী আছে। তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে দেখলো বরুণ সুবর্ণার দিকে—লাল হয়ে গেছে মুখ তার! কিন্তু বেশ প্রসন্ন মুখ!

ক্যামেরার সামনে দূর্ব্বা। স্থবর্ণা সহস্র বাতির উজ্জ্বল আলোকে চেয়ে দেখতে পেল—নিদারুণ ঘৃণায় দূর্ব্বার মুখ পরিপূর্ণ! কাটুর সঙ্গে তার কাণ্ড এবং কথাগুলো দূর্ব্বার জানা হয়ে গেছে নাকি? ও যে খুব কাছে ছিল—মাত্র কাগজের দেওয়ালটার আড়ালে!—কিন্তু দূর্ব্বা অভিনয় করতে উঠলো এবং তার মুখে প্রিয়বিরহের গভীর বেদনা পরিস্ফুট হয়ে উঠলো মুহূর্ত্তে—স্থবর্ণা ঠিকমত ধরতে পারলো না—দূর্ব্বা তাদের কথা শুনেছে কি না।

রাজকুমারী অতসীর সঙ্গে যুবরাজ মৈনাকের প্রেমাভিনয়ের দৃশ্য তোলা হচ্ছে—স্থবর্ণা দেখছে আসনে বসে; একটু তফাতে আছে চিণ্ময়—স্থবর্ণা চেনেনা তাকে, তবু শুধুলো,—নায়িকা দূর্ব্বা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে নিশ্চয়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—আমার আত্মীয়া—চিণ্ময় জবাব দিল।

—শুনেছি উনি কুমারী! আপনি কি ভাই হন ওর?

—বন্ধু—হেসে উত্তর দিল চিণ্ময়—অবশ্য আমাকে ও চিনুদা বলে ডাকে।

—বন্ধুত্বটা ভবিষ্যতে আরো নিবিড় হবার আশা আছে নিশ্চয়—স্থবর্ণা হাসলো।

—আর নিবিড় হবার আশঙ্কা কম। ও দূর্ব্বা, মৃত্তিকা-জননীর কন্যা, আমি কিন্তু মৃণ্ময় নই। আমার নাম চিণ্ময়···করুণ হাসির সঙ্গে জবাব দিল চিণ্ময়!

স্থবর্ণা কথাটির রস অনুভব করলো কিন্তু সম্যক্ অর্থ উপলব্ধি করতে পারলো না, তাই পুনর্ব্বার প্রশ্ন করলো,

—চিণ্ময়ের সঙ্গে দূর্ব্বার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হতে বাধা কি? চিৎশক্তি তো সর্ব্বত্র ব্যপ্ত!

—হ্যাঁ, কিন্তু চিৎশক্তিতে 'সৎ' যোগ করে ও আমায় 'সচ্চিৎ' করতে চায় 'আনন্দ' বাদ দিয়ে। অর্থাৎ মাটির সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ছিন্ন করে আকাশের আলো করতে চায়।

—আলোর প্রকাশে আনন্দও আছে।

—আছে, যারা সে আলো দেখে—আলোর নিজের আছে শুধু জ্বালা···

চিন্ময়ের কথাগুলো এমন বেদনাহত শোনাচ্ছিল যে সুবর্ণা বিস্মিত হলো যথেষ্ট, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলো, এই ছেলেটি দূর্ব্বাকে ভালবাসে।

—সিনেমার মেয়েকে ভালবাসার কোন অর্থ নেই—অকস্মাৎ অতর্কিতে বলে ফেললো সুবর্ণা।

ব্যথিত চিন্ময় মুখের দিকে চাইল তার, এবং অত্যন্ত ধীর স্বরে জবাব দিল—ভালবাসার এক এবং অদ্বিতীয় অর্থই সর্ব্বত্র সুপ্রকাশ সুবর্ণা দেবি—সেটা সিনেমার মেয়ে বা সমাজের মেয়েতে তফাৎ দেখে না, যদি সত্যি সেটা ভালবাসা হয়—সে যদি হয় সত্য প্রেম—নইলে ভালবাসার নামে সে যৌন ব্যভিচার—বিবাহিত জীবনেও সেটা নিষ্কলুষ নয়—বরং অধিক দোষাবহ।

—আপনি কি সত্যি ভালবাসেন ওকে? সুবর্ণা শুধুলো।

—জানি না—আমার প্রেম এখনো কষ্টিপাথরে যাচাই হয় নি···

ওদিকে ছবিতোলা শেষ হয়েছে, সবাই উঠে এল, বরুণ, কাটু, ক্যামেরাম্যান। দূর্ব্বার কাজ শেষ হয়েছে আজকার মত; এসেই বলল—চল চিনুদা, সন্ধ্যা হয়ে এল···

—আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি আমি—সুবর্ণা বলল দূর্ব্বাকে।

—আজ আর সময় হবে না সুবর্ণা দেবি—বড় ব্যস্ত আছি—কিছু মনে করবেন না—চলো চিনুদা—

দূর্ব্বা চিন্ময়ের হাত ধরে টেনে বেরিয়ে পড়লো ওখান থেকে।

দূর্ব্বা সটান চলে গেল ষ্টুডিওর গেটের বাইরে। নিশ্চুপ চেয়ে দেখলো স্বর্ণা; তার তন্বী দেহবল্লরী গেটের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর ফিরে তাকিয়ে দেখলো, কাটু ওর কাছে দাঁড়িয়ে বলছে, —ওর জন্যই ছটার সময় কাজ বন্ধ করতে হোল—নইলে রাত দশটা পর্য্যন্ত কাজ করে এই সেটের সবটা তুলে নিতাম—হারামজাদী মেয়ে···

—কেন? ও থাকলো না কেন?

—ওর সঙ্গে সর্ত্ত আছে; আমরা কেউ সে সর্ত্ত মানতে চাইনি—কিন্তু জানোতো, ওর দিকে বরুণের দৃষ্টি, সেই ওর সব সর্ত্ত মেনে নিল, ···নইলে সামান্য একটা সিনেমা-অভিনেত্রী, তার এতো দেমাক—তোমার কথাটা পর্য্যন্ত শুনলো না!

—সত্যি; ও কি খুব নামকরা অভিনেত্রী?

—মোটেই না—এই প্রথম ও পর্দ্দায় আসছে। আমরাই ওকে 'বুম' করে বের করে দিচ্ছি; অজস্র টাকা খরচ হচ্ছে ওর পেছনে—পাব্‌লিসিটির নানা পলিশি খাটানো হচ্ছে—কিন্তু দেখলে তো, কি রকম শয়তান মেয়ে!

—ওর জন্য কেন এতো করছেন আপনারা?—স্বর্ণা সব জেনেও আবার শুধুলো।

—আনরা করছিনে—করছে বরুণ! ওকে তার চাই-ই—হুঁ! বরুণ একটা যাচ্ছেতাই হয়ে উঠেছে। তুমি বসো একটু, আমি কাজটা সামলে আসি!

কাটু ত্বরিতে চলে গেল; স্বর্ণা দেখতে পেল, বরুণ তার দিকে এগিয়ে আসছে—হয়তো তাই দেখেই কাটু সরে গেল। স্বর্ণা দাঁড়ালো ফিরে।

—তুমি অকস্মাৎ এখানে কেন স্বর্ণা?—বরুণ প্রশ্ন করলো!

—তোমার প্রিয়তমাকে দেখতে—উত্তর দিল সুবর্ণা নম্র স্বরে।

—অথবা তোমার প্রেমাস্পদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে! কথাটা বলার সঙ্গে অধিক রুক্ষ হলো বরুণ।

—হতে পারে—তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করেই সুবর্ণা সরে চলে এল খানিকটা, চোখে ওর বিদ্যুজ্জ্বালা—অন্তরে অগ্নি। বরুণ বুঝতে পারলো, সুবর্ণা আর বরুণের নেই…পর হয়ে গেছে। নিঃশব্দে সেও অন্য দিকে সরে গেল—নিশ্বাসটা পড়লো শুধু খুকীর জন্য। সুবর্ণা সেই অভাগী মেয়েটার মা—অকস্মাৎ বরুণ ত্বরিতগতিতে ঘরের বাইরে এসে গেটে-রাখা গাড়ীখানায় চড়ে ষ্টার্ট দিল—তারপর বিদ্যুৎ বেগে চালিয়ে দিল বাড়ীর পানে। আইন অমান্য করে গাড়ী চলছে বরুণের!

সুদীর্ঘকাল খুকীকে সে দেখেনি—ওর তো মা নেই, সে মরেছে। বরুণ একাই এখন খুকীর মা-বাবা! স্নেহে উদ্বেলিত-হৃদয় বরুণের মনে হোল, এই ভাল হয়েছে। সুবর্ণার মত মা না-থাকাই মঙ্গল। সুবর্ণা যেখানে ইচ্ছে চলে যাক—খুকীর কেউ তাকে হতে হবে না আর!

সন্ধ্যা হলেও অন্ধকার হয়নি এখনো—বরুণ বাড়ী পৌঁছালো। বাগানের বড় বকুল গাছটার ডালে ঝোলানো দোলনায় খুকী দোল খাচ্ছে—আয়াটা দোলাচ্ছে ওকে; বরুণ ছুটে এসে তাকে বুকে তুলে নিল,

—মা - মা-মণি…

—বাব্বা!—খুকু জড়িয়ে ধরলো ওর গলা; বরুণের বুকভরা উচ্ছ্বাস কবিতায় ঝরছে—

"ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে—
ছিলি আমার পুতুল খেলায়, প্রভাতে শিবপূজোর বেলায়—
তোরে আমি ভেঙেছি আর গড়েছি…"

অকস্মাৎ দাঁড়ানো গাড়ীখানার দিকে নজর পড়তেই বরুণ সামনে এসে

উঠলো খুকীকে কোলে নিয়ে এবং তারপরই গাড়ী চালিয়ে দিল কোথায়, কে জানে! তখনো সিনেমা গৃহের রং-পাউডার ওর মুখে, যুবরাজ মৈনাকের বেশ ওর পরণে। কিন্তু বরুণের ওসব খেয়ালেই এল না।

দূর্ব্বা সবে মাত্র পৌছে শাড়ীখানা বদলেছে সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার জন্য; প্রদীপ তার হাতে—তুলসী তলায় আসছে—অকস্মাৎ খুকী-কোলে বরুণ! বিস্ময়ে হতবাক্ দূর্ব্বা প্রায় আধ মিনিট কিছুই বলতে পারলো না। কি ব্যাপার?

—মা-মা মাম্-মা···খুকীই বলল এবং হাত বড়োলো কোলে যাবার জন্য।

—আয়! এসো—দূর্ব্বা বাঁ-হাতখানা বাড়াতেই খুকী ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর বুকে। দূর্ব্বা বিস্মিত হয়ে দেখলো—বরুণের চোখে জল রয়েছে। অবাক হয়ে শুধুলো,—কি ব্যাপার বরুণবাবু?

—কিছু না—ওকে নাও তুমি দূর্ব্বা···বরুণ সরে দাঁড়ালো কিঞ্চিৎ—সন্ধ্যাদীপ দাও তোমার।

দূর্ব্বা কি বুঝে আর কিছু শুধুলো না—নিঃশব্দে খুকীকে কোলে নিয়ে তুলসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল—একহাতে প্রদীপ অন্যহাতে তার দীপ-শিখার মত খুকী! তুলসীমঞ্চ ভেঙে গেছে—কিন্তু পরিষ্কার—খুকীকে সেইখানে নামিয়ে দূর্ব্বা প্রদীপ দিল, প্রণাম করলো ভুমিষ্ঠ হয়ে—দেখা-দেখী খুকীও করছে প্রণাম···বরুণ হাসছে দেখে। বরুণের মা এইভাবে প্রণাম করেন, সুবর্ণা কোনোদিন করেনি। খুকী করছে। খুকী—বরুণের জননীর শৈশবমূর্ত্তি···। দূর্ব্বা খুকীর মাথায় তুলসীতলার ধুলিকণা বুলিয়ে দিল—আশীর্ব্বাদ—মাতৃঅন্তরের অমোঘ অক্ষয় কবচ; বরুণ নির্নিমেষ চোখে দেখছে—খুকীকে বুকে তুলে দূর্ব্বা বলল—

—চলুন, আপনাকে দাদুর কাছে বসিয়ে দিয়ে ওকে কিছু খাওয়াই; খিদে পেয়েছে ওর।

--তুমি ওর মা হবে দূর্ব্বা ?—বরুণ অকস্মাৎ বলে বসলো।

—কেন ? ওর মা কি হলো ? বিস্মিত দূর্ব্বা প্রতিপ্রশ্ন করলো।

—ওর মা নেই…মান্ধাতার মতন ও বাপের গর্ভে জন্মেছে…মা ওর নেই দূর্ব্বা। তার কথা জিজ্ঞাসা করোনা—ওর সবটা আমার মত, ও সবটাই আমার, তুমি অংশ নাও ; সিনেমার শেয়ার নাওনি—ওর সবটাই তুমি গ্রহণ কর…

—থামুন বরুণবাবু—আপনি বড্ড উত্তেজিত হয়ে আছেন! মুখ হাত ধোননি—পোষাক পর্য্যন্ত বদলাননি…চলুন, বসবেন—এ সব কথা থাক এখন...

—তুমি ওর মা হতে পারবে না দূর্ব্বা ?

—ওর মা হতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই বরুণবাবু কিন্তু কারো স্ত্রী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—আজ এই সন্ধ্যাবেলায় ওকে আমি তুলসীতলায় কুড়িয়ে পেলাম, আমি ওর মা—আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন—যান, বসুনগে দাদুর কাছে !

দূর্ব্বা চলে গেল খুকীকে নিয়ে। আজকাল দূর্ব্বার বাড়ীতে প্রয়োজনীয় সব জিনিষই থাকে—দুধ, মিষ্টি, চা. চিনি—কারণ বর্ত্তমানে তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। খুকীকে খাওয়াবার জন্য তাকে ভাবতে হবেনা আজ, কিন্তু কিছুদিন পূর্ব্বে এই রকমভাবে কোনো মেয়ে এলে দূর্ব্বা অকূল সমুদ্রে পড়ে যেতো। অর্থ মানুষের কত দরকার, ভাবতে ভাবতে দূর্ব্বা খুকীকে নিয়ে রান্নাঘরে গেল। রাঁধুনী সে রাখেনি—কিন্তু একটা ঠিকে ঝি আছে—উনুন ধরিয়ে সে অপেক্ষা করছিল অন্য আদেশের। দূর্ব্বা তাকে দুধ গরম করতে বললো—তারপর চায়ের জল চড়াতে বলল। খুকীটা আশ্চর্য্য মেয়ে। দূর্ব্বাকে সে মুহূর্ত্তের জন্য পর ভাবলো না, নিজের গর্ভধারিণীকে নিকটে না পাওয়ায় যে-কোনো

মেয়েকে ও অনায়াসে মা বলে কাছে যেতে পারে—মাতৃলাভ ওর কাছে যেন অমূল্য বস্তু। কারণ অনায়াসলভ্য মাতৃরূপ ওর জীবনে দেখা দেয়নি।

ওকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে দূর্ব্বা ভাবতে লাগল,—যে মেয়েটিকে ষ্টুডিওতে সে দেখেছে কাটুর সঙ্গে কথা কইতে, সেই সুবর্ণা, বরুণের স্ত্রী এবং এই খুকীর মা! অকস্মাৎ বরুণ কেন এল তার কাছে এমন করে, তাও যেন আন্দাজ করতে পারছে দূর্ব্বা। খুকীকে কোলে নিয়ে খুকীর মার প্রতি ঘৃণাটা ধীরে ধীরে করুণায় বিগলিত হয়ে উঠতে লাগলো দূর্ব্বার অন্তরে—অভাগী নারী—আর দুর্ভাগা পুরুষ,—বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টিতে অভিশপ্ত এই দম্পতি!

বরুণ এসে দাদুকে নমস্কার করে বসলো একটা চেয়ারে। ঘরের বাল্ব সম্প্রতি বদলে দেওয়া হয়েছে, উজ্জ্বল আলোতে ঘরখানার সমস্তটা দেখা যায়—স্তূপীকৃত পুস্তকরাশির দিকে চেয়ে বরুণ প্রশ্ন করলো, —সমস্ত জীবনটা কি শুধু বই পড়েই কাটিয়ে দেওয়া যায় না দাদু?

—নিশ্চয় যায়—কিন্তু একথা কেন দাদা? অর্জিত বিদ্যা প্রযুক্ত না হলে ব্যর্থ হয়······মানুষের কোনো কল্যাণে তো সে লাগে না···মানুষের যা-কিছু কাজ জগৎ-কল্যাণেই হওয়া উচিৎ···

—নিজের আনন্দ লাভ হয় দাদু—বরুণ বলল—সন্ন্যাসীরা যে গিরিগুহায় ধ্যান ধারণা করেন, সেও তো আত্মোপলব্ধি আর আনন্দ লাভের জন্য?

—হ্যাঁ—কিন্তু সে আনন্দ ব্রহ্মানন্দ—সে আনন্দ উপলব্ধি হলে ব্রহ্মই সত্য থাকে, জগৎ মিথ্যা প্রতিভাত হয়—তখন জগৎ-কল্যাণের প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু পুস্তক-পাঠের আনন্দ ব্রহ্মানন্দ নয়—এ আনন্দ নিজে লাভ করে অপর রসগ্রাহীকে লাভ না করানো পর্য্যন্ত পূর্ণ তৃপ্তি হয় না—তাই এখানে জগতের রসজ্ঞ লোক-সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিতে হয়—এই জন্যই এর নাম সাহিত্য!

—ব্রহ্মোপলব্ধিতে কি তার প্রয়োজন হয় না দাদু ?

—না—ব্রহ্মই একমাত্র অনুচ্ছিষ্ট বস্তু—কারো মুখ থেকে তাঁকে শোনা যায় না, কোনো ভাষায় তাঁকে বলা যায় না—কোনো মূর্ত্তিতে তাঁকে প্রকাশ করা যায় না—

—কে ?···দাদু অকস্মাৎ কথা থামিয়ে প্রশ্ন করলেন বাইরে পদ শব্দ পেয়ে,—আমি গোবিন্দ—বলে গোবিন্দ প্রবেশ করে প্রণাম করলো এবং বসল।—আমি কদিন আপনাদের ওদিকে যেতে পারিনি বরুণবাবু, কাজ চোলছে তো ? কতখানা হোল আপনাদের ছবির ? প্রশ্ন করলো সে বরুণকে !

—চলছে—বরুণ সংক্ষেপে জবাব দিয়ে দাদুকেই আবার শুধুলো,

—তাঁকে তাহলে কি ভাবে জানতে হবে ?

—গুরু, অর্থাৎ যিনি তাঁকে জেনেছেন—তাঁরই প্রদর্শিত পথে চলতে হবে—তাঁকে জানার অর্থ তাঁর উপলব্ধি হওয়া—তাঁতেই সব, এবং সবেতেই তিনি, এই বোধ জাগ্রত হওয়া···অনন্ত বিশ্বপ্রপঞ্চে তাঁর সৎ চিৎ, আনন্দস্বরূপ জ্ঞান হওয়া।

—কার কথা হচ্ছে ? গোবিন্দ অকস্মাৎ প্রশ্ন করলো দাদুকে।

—এই খুকীটার কথা—বলে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলো খুকী-কোলে দূর্ব্বা।—ওর নাম দিলাম আমি সর্বানী!—ধরতো দাদু, আমি ওদের চা দিই··· খুকীকে দাদুর কোলে তুলে দিয়ে দূর্ব্বা চা তৈরী করতে চলে গেল আবার। দীর্ঘদিন পরে শিশু এল দাদুর কোলে—সুদীর্ঘ আঠারো বছর পরে ; কেমন যেন রোমাঞ্চ জাগছে, কেমন অপূর্ব্ব শিহরণ···খুকীর পানে চেয়ে বললেন,

—তুই সত্যি এলি নাকি···ব্রহ্মবাদিনী বাক্ ঋষি·· বল তাহলে,

'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম···',

খুকীর সুন্দর মুখখানার পানে চেয়ে আছেন দাদু ; দূর্ব্বা ফিরে এল, —একে কোথায় পেলি দিদি··· ?

—কুড়িয়ে পেলাম দাদু—ব্রহ্মলাভ তোমার আগেই হয়ে গেল আমার !

দূর্ব্বা হাসলো, চা তৈরী করে পরিবেশন করলো বরুণকে আর গোবিন্দকে।

—চিণ্ময়বাবু কোথায় ?—বরুণ চায়ের কাপ নিতে নিতে শুধুলো।

—গেছে একটু বাইরে—এক্ষুনি এসে যাবে—বলে দূর্ব্বা খুকীকে নিতে এল !

—থাক একটু আমার কাছে—বললেন দাদু।

—আবার মায়ায় পড়ছ দাদু—দূর্ব্বা কপট ক্রোধে বলল।

—মায়া নয় দিদি—মায়ের ক্ষুদ্র রূপ, অনন্তের শান্ত মূর্ত্তি—ক্ষুদ্রবীজে বিশাল বনস্পতি। এই সৃষ্টির আদি, এই-ই সংহরণের শেষ—উৎপত্তির নিবৃত্তির চরম শক্তি !···

গোবিন্দ এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছে—কী সাংঘাতিক বোকামী সে করেছে—"কার কথা হচ্ছে" জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু এখনো এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ওর কাছে বিষবৎ বোধ হচ্ছে ; ও এসেছে দূর্ব্বার সঙ্গে সিনেমা-কোম্পানী গড়ার জন্য পরামর্শ করতে। কথাটা আজ পাকাপাকি হবার কথা ছিল এবং লেখাপড়া ইত্যাদির জন্য দলিলের ড্রাফ্‌ট আনতে চিন্ময় গেছে উকিলবাড়ী—এ খবরও সে জানে। উকিল অবশ্য গোবিন্দর নিজেরই—চিন্ময়কে পাঠানো হয়েছে তাঁর কাছ থেকে বুঝে ড্রাফ্‌টগুলো আনবার জন্য। হয়তো উকীলবাবু নিজেও আসবেন। গোবিন্দ বলল, —চিণ্ময় বাবু ফিরলেই আমাদের কাজ নিয়ে বসতে হবে—কেমন ?

—থামুন—ষ্টুডিও থেকেই চিণুদা উকীলবাড়ী গেছে—এখনও হাতমুখ ধোয়নি—আমি ওকে বৌবাজারে ছেড়ে দিয়ে একাই বাড়ী এলাম।

সঙ্গে অবশ্য হনুমান সিং ছিল—ট্রামে যা ভিড়—ট্যাক্সি করে আসতে হোল আজ!

—হোলই বা—আমাদের কোম্পানীর জন্য 'কার' একখানা কেনা হোক্ এবার! গোবিন্দ বলল।

—এখন থেকে অত বাড়াবাড়ী করবেন না—অপব্যয় করলে ব্যবসা হয় না,

বলেই দূর্ব্বা বেরিয়ে গেল। বরুণ কথাটার কিছু জানে না, শুধুলো, —কি ব্যাপার গোবিন্দবাবু! কিসের কোম্পানী আপনাদের?

—সিনেমা কোম্পানী—'দূর্ব্বাদল কলা-মন্দির'—গোবিন্দ সগৌরবে ঘোষণা করলো।

—ফাইনেন্সার কে?—বরুণ আবার প্রশ্ন করলো!

—আমি—দূর্ব্বা এক্‌টিং পার্টনার—অর্দ্ধেক অংশ তার। আমরা চিণ্ময়-বাবুর বইটা তুলবো ঠিক করেছি—'পরম পিপাসা'। গোবিন্দ সব জ্ঞাতব্য-গুলো জানালো এক নিশ্বাসে!

—ও, ভালইতো! বলে বরুণ চুপ করলো! মনে পড়লো, এই কিছুদিন পূর্ব্বে দূর্ব্বাকে সে নিজেদের কোম্পানীর অংশ দিতে চেয়েছিল—দূর্ব্বা গ্রহণ করেনি—আজ গোবিন্দর টাকায় সে কোম্পানী খুলবে—গোবিন্দই তাহলে আত্মীয় হোল ওর! বরুণ কেউ হোল না! বরুণের মুখখানা করুণ হয়ে উঠেছে—অকস্মাৎ দূর্ব্বা ফিরে এসে খুকীকে নিল দাদুর কোল থেকে, তারপর বরুণকে বলল হেসে,

—দূর্ব্বা মাটি-মায়ের কোলে বিছিয়ে থাকে, তাকে পায়েই দলে যায় পৃথিবীর লোক—পূজার জন্য তার ব্যবহার আকস্মিক বরুণবাবু—অপ্রাকৃত!

—কথাটা ঠিক মত বুঝলাম না দূর্ব্বা—বরুণ সবিনয়ে জানালো।

—বলছি যে দূর্ব্বা কারো পূজা পেতে চায় না, পূজা করতেই তার জন্ম ; একান্ত নিরহঙ্কার থেকে সে পৃথিবীর অঙ্গে শ্যামলাভা জড়িয়ে রাখে—জীবজগৎ তৃপ্তি পাবে বলে !

—এখনো কথাটা দুর্বোধ্য রইল আমার কাছে দেবি—বরুণ মৃদু হেসে বলল।

—থাক্ ! সব কথা সব সময় বোঝানো যায় না—ব্রহ্মের মতন উপলব্ধি করতে হয়।

দূর্ব্বা আবার বের হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ অতিশয় বিরক্ত হচ্ছে। এত দিন তার ধারণা ছিল, যতটা বিদ্যা এবং বুদ্ধি তার আছে, তাই দিয়েই পৃথিবীর সব লোকের সঙ্গে কথার কারবার সে চালাতে পারে, কিন্তু এখানে, এই সিনেমা কোম্পানীর লোকগুলোর সঙ্গে, বিশেষ করে চিণ্ময়ের সঙ্গে দূর্ব্বা যেভাবে কথা বলে, গোবিন্দ তার বর্ণমাত্রও বুঝতে পারে না। একি কথা, না কাব্য ! অথচ দূর্ব্বা আজকাল এই রকম কথাই বেশি বলে। ওরা তো বুঝতে পারে, ঐ চিণ্ময় ইত্যাদি। কিন্তু বরুণ বুঝতে পারছে না, শুনে আনন্দই হোল গোবিন্দর। দূর্ব্বার কথা না বুঝবার মত লোক পৃথিবীতে আরো আছে তাহলে ! বলল,

—তোমার কথাগুলো আরেকটু সরল করলেই তো হয় দূর্ব্বা, ওভাবে কি কেউ কথা বলে ?

—বলে না বলেই তো আমরা বলি—আমরা সাধারণ কেউ নই—সিনেমা আর্টিষ্ট আমরা ; আমাদের সব অসাধারণ—চলুন ওঘরে, চিনুদা এসে গেছে !

ওরা বাইরের বসবার ঘরটায় উঠে এসে দেখলো, চিণ্ময়, মায়া এবং অন্য একজন লোক বসে আছে। নতুন কোম্পানী গড়বার ব্যবস্থা হবে। বরুণও রইল কিছুক্ষণ। খুকী খেয়ে ঘুমিয়ে গেছে দূর্ব্বার কোলে। রাত বারোটা নাগাদ বরুণ ঘুমন্ত খুকীকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।

নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিল সুবর্ণা, পাশে কাটু ; সর্পিল পথটা সুদূরের ইসারা। বর্ষাস্নাত বৃক্ষবল্লরী প্রগাঢ় পরিরম্ভে প্রীতিমগ্ন—বনকুসুমের সুগন্ধি শ্বাস মেদুর করে রেখেছে আকাশ-বাতাস—কুমারী সন্ধ্যার গণ্ডে লজ্জার শোণিমা-লেখা !

হাত দুটো ষ্টিয়ারিং-এর উপর রেখে কথা বলছিল সুবর্ণা কলকণ্ঠে,
—মুহূর্ত্তের ভুল আমার জীবনে অক্ষয় হয়ে থাকবে—ভুলকে আমি ভয় করিনে !

—তোমার যোগ্য কথাই বলেছ সুবর্ণা—কিন্তু ভুল তো হচ্ছেনা তোমার,—তোমার নারীত্বের এই অসম্মান আর কত কাল তুমি সহ্য করবে– কেন সহ্য করবে ?

—করতে চাইনে সহ্য আমি—কয়েকটা মন্ত্র আর কয়েকপাক ঘুরে মালা দেওয়ার মধ্যে এমন কিছু মাহাত্ম্য নেই, যাতে এই অপমান সহ্য করতে হবে। সতীপনার অত ভণ্ডামী অসহ্য আমার—গাড়ীটা বাঁক ফেরালো।

কাটু সিগারেট ধরালো একটা—সুবর্ণা হেসে বলল এবার,

—সব সিগারেটগুলো একাই খাচ্ছ যে বড়—আমার ভাগ নেই ?

—ও, স্যরি !—কাটু তৎক্ষণাৎ একটা সিগারেট সুবর্ণার ঠোঁটে দিয়ে নিজে হাতে লাইটার দিয়ে ধরিয়ে দিল। ধোঁয়া ছেড়ে সুবর্ণা বলল,
—মুখে আগুন দিলে তো ?

—ওকি কথা ! ষাট্—আমি অমৃত দিচ্ছি তোমার মুখে···কা[illegible] [illegible]

— থামো—সুবর্ণা অকস্মাৎ গাড়ীখানা ঘুরিয়ে নিতে আরম্ভ করলো দূরে অন্য একখানা গাড়ী আসছে—তার হেড-লাইটের তীব্র আলো পড়েছে এসে এই গাড়ীতে। সুবর্ণা নিজের গাড়ী ঘুরিয়ে ফিরতিপথে, চালাবে

এবার—অন্য গাড়ীখানা পাশ করে চলে গেল ওদের। কাটু বলল,
—এ রাস্তায় কোনো ভয় নেই!

—জানি—চোর-ছ্যাঁচড়দের ভয় করছিনে। ভিলিয়ানদের সব সময় ভয় করতে হয়।

—ভালোও বাসতে হয়—কাটু কাটা কথায় বলল।

—না—ওকে ভালবাসা বলেনা—ওটা আরশোলা আর কাচপোকার ব্যাপার।

—ঠিক বুঝলাম না স্নুবর্ণা!

—ভয়ের মধ্যে যে আত্ম সমর্পণ, তাকে ভালবাসা বলে না।

—ভয়ের হেতু কি এখানে?

—ভালোবাসারই বা কি হেতু?—হাসলো স্নুবর্ণা কথাটা বলতে বলতে।

এই ছলাকলা কাটুর বিশেষ রকম জানা আছে। দীর্ঘদিন থেকে এই সব ব্যাপারে কুশলী সে—অভিজ্ঞতা তার প্রচুর—কিন্তু স্নুবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েদের হয়তো সে এখনো চেনে না। স্নুবর্ণা শুধু উচ্চ শিক্ষিতা নয়—উচ্চশ্রেণীর অন্তর-ঐশ্বর্যে পূর্ণা। কোনো পুরুষের দুঃসাহস দেখে সে সাময়িকভাবে মুগ্ধ হতে পারে—কিন্তু সে মুগ্ধতা সাময়িক মাত্র। স্নুবর্ণা এতোক্ষণে আত্মসংবরণ করতে সচেষ্ট হোল। সে ভুল করেছে। কাটুর সঙ্গে এভাবে বেড়াতে বেরুনো তার ঠিক হয় নি—ষ্টুডিও থেকে উত্তেজিত অবস্থায় সে এতদূর চলে এসেছে, কিন্তু যার সঙ্গে এসেছে, সে স্নুবর্ণার মত বহু নারীর সর্ব্বনাশ করেছে—জানে স্নুবর্ণা; ভালবাসবার কোনো যোগ্যতা তার নেই!

গাড়ীতে স্পীড্ দেবার পূর্ব্বেই কাটু ওর গলা বেষ্টন করে ধরলো।

—থামো—কঠোর ধমক্ দিল স্নুবর্ণা তাকে—নিজকে মুক্ত করে বিদ্যুৎগতিতে চালিয়ে দিল গাড়ীখানা—কিন্তু কাটুর সবল লুব্ধতা থেকে

পরিপূর্ণরূপে আত্মরক্ষা করতে পারলো না—সুবর্ণার গণ্ডের কিছুটা অংশ ক্লেদাক্ত হয়ে গেল কাটুর ওষ্ঠের স্পর্শে।

কাটুর দেওয়া সিগারেটটা ফেলে দিয়েছে সুবর্ণা, গাড়ী চালাচ্ছে সামনের দিকে তাকিয়ে—কিন্তু মুখে হাসি, বললো,—বিস্তর রাত হয়ে গেল—খুকী হয়তো কাঁদবে !

—সে তো বরুণ আর আয়ার কাছেই থাকে—কাটু বললো জবাবে।

—হ্যাঁ—কিন্তু একা বরুণেরই নয় সে—আমার অর্দ্ধেক ভাগ আছে, বলে সুবর্ণা গাড়ীর গতিতে আরো জোর দিল। ভাবতে লাগলো, সে আজ শুধু বরুণের পত্নী নয়—খুকীর জননী। কতবার কতরকমে বরুণ তাকে বলেছে, খুকী তার কেউ নয়। সুবর্ণা এক্ষুণি গিয়ে বরুণকে বুঝিয়ে দেবে যে খুকী তারও মেয়ে—কিন্তু কাটুর সঙ্গে বেড়াতে এসে নিদারুণ ভুল করেছে সুবর্ণা। বরুণ জানতে পারলে বলবে—সুবর্ণা সত্যি কেউ নয় খুকীর। এ কি করলো সুবর্ণা ! কাটু পাছে আরো অগ্রসর হয়, এই ভয়ে সে মুখে হাসি টেনেই রেখেছে, কারণ কাটু সত্যি দুঃসাহসী—তার পক্ষে জবরদস্তি করা কিছু মাত্র বিচিত্র নয়—দুশ্চিন্তায় সুবর্ণা কালো হয়ে উঠলো, যখন কাটু বলল,

—রাত এমন কিছু বেশি হয়নি—চলো ঐ গঙ্গার দিকে একটু—বলেই কাটু নিজের হাতে ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিতে চাইছে—কিন্তু সুবর্ণা বাধা দিয়ে বলল,—না—আজ আর রাত করলে বাড়ী ঢোকা বন্ধ হয়ে যাবে আমার।

—তাতে কি তোমার বয়ে যাবে সুবর্ণা ! আমার অন্তর-দুয়ার চির দিনই খোলা আছে তোমার জন্য—তোমাকে পাবার প্রত্যাশাতেই আমি বরুণের চাকরী করি—নইলে……

—নইলে কি ? সুবর্ণা প্রশ্ন করলো তীক্ষ্ণ কণ্ঠে।

—নইলে আমার দিক থেকে ওর কোনো প্রয়োজন ছিলনা—হাসলো কাটু!

—ওঃ! শুধু আমায় ভালবাসবার জন্যই ওর চাকরী করছো?

—হ্যাঁ - বিশ্বাস হচ্ছে না সুবর্ণা?

—না—কারণ যে-প্রেম আমার জন্য এতোটা করতে পারে, সে-প্রেম কামকলুষ হবে না—সে-প্রেম আমার অকল্যাণ কামনা করবে না—আমাকে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্জন পথে এনে কলঙ্কিত করতে চাইবে না—জোর করে আমার দেহ অধিকার করতে চাইবে না—তোমার কথা বিশ্বাস করা সম্ভব নয় কাটুবাবু—

—তুমি বলছো কি সুবর্ণা—! কাটু বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধবৎ প্রশ্ন করলো!

—হ্যাঁ—সত্যিই বলছি—অবশ্য আমি স্বীকার করছি যে রূপযৌবনান্বিতা এবং স্বামী-প্রেমবঞ্চিতা নারীর চোখে তোমার এই দুঃসাহস, এই দস্যুতা এই নির্ভীকতা লোভনীয়। কিন্তু সেটা শান্ত-শুদ্ধ সংযত প্রেম নয়—সে কাম। তারও প্রয়োজন হয়ত আছে আমার জীবনে, কিন্তু যে-সংযম নারীর চোখে পুরুষকে দেবতা করে তোলে—এর মধ্যে তার অস্তিত্ব নেই; সকালের ভুলটা আমার ভাঙলো এখন—

সুবর্ণা অতি বেগে গাড়ী চালিয়ে একেবারে লেকের ধারে একটা বড় রেস্তোরাঁর সামনে এসে থামলো; এখান থেকে বাড়ী বেশি দূর নয়; কিন্তু এখানে কিছু খেয়ে নেবে সুবর্ণা। খিদে পেয়েছে ওর—মনে পড়লো, সারাদিন ও ভালকরে খায়নি। গাড়ীটা রেখে নেমে এল—কাটুও নামলো।

—কি খাবে?—কাটু প্রশ্ন করলো!

—যাহোক কিছু খেলেই হবে—পেটের খিদে তাতেই মেটে। বলে সুবর্ণা এসে বসলো একটা টেবিলের সামনে। রাত বেশি হওয়ার জন্য

রেস্তোরাঁয় লোক কম—তবে রাত্রিচর কয়েকজন নরনারী এখনো পান-ভোজন করছে। কাটু 'মেন্নুটা' ওর হাতে দিয়ে বলল,

—অর্ডার কর কি কি চাই!

—অনর্থক ইংরাজি কথা বল কেন? বলে ধমক দিল স্নবর্ণা ওকে—যেখানে বাংলা প্রতিশব্দ নেই সেখানেই ইংরাজী বলবে—বলে সে খাবার চাইল!

কথা আর বিশেষ জমলো না ওদের; কাটু অনুভব করলো, স্নবর্ণা-শ্রেণীর মেয়েদের অন্তরে আসন লাভ করবার যোগ্যতা নেই ওর। এতোকাল সে যাদের নিয়ে খেলা করেছে তারা অতি সাধারণ নারী—অর্থ, রূপ, যৌবন এবং যশের কাঙ্গালিনী—স্নবর্ণা সম্পূর্ণ অন্য বস্তু—হিরণ্যগর্ভা—রহস্যময়ী!

খাওয়া শেষ করে স্নবর্ণা শুভরাত্রি জানিয়ে গাড়ীতে উঠলো গিয়ে। কাটু রিকসায় চড়ে তার ফ্ল্যাটে ফিরলো! রাত সাড়ে বারোটা। স্নবর্ণা বাড়ী ফিরে সটান চলে এলো শোবার ঘরে। বরুণ তার কয়েক মিনিট আগে ফিরেছে—খুকীকে কোলে নিয়ে শুয়ে আছে প্রশস্ত পালঙ্কটায়—। স্নবর্ণা ঘরে ঢুকে একবার দেখলো স্বামী-সন্তানকে—হ্যাণ্ডব্যাগটা ড্রেসিং টেবিলে রেখে আয়নায় মুখ দেখছে,—বরুণ চোখ খুলে অকস্মাৎ বলল,

—তুমি তোমার ঘরে গিয়ে শোও স্নবর্ণা, এ ঘরটা আমার খুকীর!

চাবুক পড়লো যেন স্নবর্ণার পিঠে; বিদ্যুৎগতিতে ফিরে দাঁড়ালো সে। দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা একবার কামড়ে নিল, তারপর তীব্রকণ্ঠে বলল,

—বেশ, এ ঘরটা তোমার খুকীর। কিন্তু তাকে রাখবে কোন ঘরে—সেই দূর্ব্বাকে?

—দূর্ব্বা ঘরে থাকে না স্নবর্ণা—সে থাকে মাটি-মায়ের কোলে, আকাশের তলায়, আলোকের উৎসধারায় স্নান করে সে—তাকে রাখতে ঘর দরকার হয় না।

বরুণ ধীরে ধীরে উঠে বসে আবার বলল—অনর্থক রাগ করছো সুবর্ণা, আমি তোমায় কোনোদিন কিছু বলিনি—বলতে চাই না। আমার কন্যার জননী তুমি—এ সত্য ভুলতে পারলে আমি সুখী হতাম—কিন্তু তা হবার নয়। খুকীর মা হিসাবে তোমার সম্মান আমার কাছে অক্ষয় থাকবে—কিন্তু মনে রেখো, দূর্ব্বাকে হিংসা করবার মত কোনো যোগ্যতা তোমার নেই! দূর্ব্বা স্বচ্ছ, সুন্দর, সুপ্রকাশ, তার কিছুই লুকানো থাকে না—সুবর্ণ থাকে খনির তলায় আত্মগোপন করে—মণি-সংযোগে বিলাসিনীর অঙ্গশোভায় সে বিলসিত হয়—দূর্ব্বা দেবতার চরণের অর্ঘ্য; সুবর্ণা মূল্যবান হতে পারে, দূর্ব্বা অমূল্য! রাত হয়েছে—যাও, শোও গে। বরুণ বেড্ সুইচ্ টিপে আলো নিবিয়ে দিল।

অন্ধকার—নির্ম্মম নিশ্ছিদ্র অন্ধকার নামলো সুবর্ণার চোখে। কিন্তু—যে প্রচণ্ড প্রলোভন পরাভূত করে সে এই মুহূর্ত্তে নিষ্কলঙ্ক হয়ে তার স্বামীর কাছে ফিরে এল, এই কি তার পুরস্কার! উদ্যত ক্রোধ বজ্রের মত জ্বলে উঠলো সুবর্ণার বুকে। কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য—অকস্মাৎ সুবর্ণার মনে পড়লো—তার বামগণ্ডে একটা জ্বালা অনুভূত হচ্ছে—মৃদু, তীক্ষ্ণ, দাহকরী একটা যন্ত্রণা···কাটুর কলঙ্কিত স্পর্শ—উঃ!

গেটের বড় বাতিটার একটা ক্ষীণ রশ্মি ঘরে এসে পড়েছে, সেই আলোতে সুবর্ণা পাশের ঘরের দরজা দেখে ধীরে ধীরে ঢুকলো গিয়ে; তারপর বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করেই শুয়ে পড়ল—চোখের জ্বালাটা হৃদয়-বিগলিত জলে ধুয়ে যাচ্ছে!

বর্ত্তমান যুগে বড় লোকদের শয্যাগৃহ নতুন ধরণে প্রস্তুত হয়—স্বামীর এবং স্ত্রীর পৃথক করে, বরুণের বাড়ীতেও সেই ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সে কক্ষের দূরত্ব মাত্র একটা দরজার ব্যবধানেই পর্য্যবশিত! শ্বাসের শব্দও শোনা যায় এক কক্ষ থেকে, অপর কক্ষে নিদ্রিত ব্যক্তির। সুবর্ণা

শুনতে পেল, ঘুমন্ত বরুণের গভীর শ্বাস। মাঝের দরজার ভারী পর্দ্দাটা গোটানো রয়েছে—অন্ধকার সবই, তবু সবই যেন দেখতে পাচ্ছে সুবর্ণা দিবালোকের মত। বরুণের বুকের কাছে খুকী ঘুমুচ্ছে—যদি জাগে তো সুবর্ণাকে দরকার হতে পারে। না—হবে না—বরুণ নিজেই তাকে সামলাতে পারবে, কিম্বা খুকীর আয়াকে ডাকবে। সুবর্ণাকে কি আর ডাকবে বরুণ!

কী বলবার থাকতে পারে সুবর্ণার! কিছু না। খুকী সুবর্ণার কেউ নয়—সত্যি কেউ নয়, আজ সেটা ভাল ভাবেই প্রমাণ হয়ে গেল। সুবর্ণা গালে হাত দিল—উঃ! না, তাকে স্নান করতে হবে।

ঢং ঢং করে দুটো বাজলো। উঠে পড়লো সুবর্ণা—বাথ্‌রুমে ঢুকলো গিয়ে। সর্ব্বাবরণ এবং সর্ব্বাভরণমুক্ত হয়ে স্নান করলো সুবর্ণা, শুধু বাঁ হাতের নোয়াটা খুললো না। ঐ লৌহবলয় বরুণের সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বন্দীত্বের সাক্ষি, শৃঙ্খল—কিন্তু এ শৃঙ্খল হিন্দু নারীর মনশ্চেতনায় যে পবিত্রতার প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়, সুবর্ণ আজ যেন সেই মন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে!—কিন্তু—সুবর্ণার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি কাটু, পারবে না। জীবনের এই ক্ষণিক মোহকে নির্দ্দয় আঘাতে বিতাড়িত করে সুবর্ণা স্থির-শান্ত-সংযত হয়ে উঠবে—কিন্তু……

সুবর্ণা বারম্বার সাবান-জল দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করলো এবং বহুবার সাবান দিয়ে নোয়াগাছটা ধুলো—পরিষ্কার হয়ে গেল নোয়াটা! মনে পড়েলো বিয়ের সময় তার হাতে ওটা পরিয়ে দিয়েছিল বরুণ! পাশ্চাত্য সভ্যতার উপঢৌকন সুবর্ণাঙ্গুরীয় নয়—বাংলার সুপ্রাচীন রীতির নিষ্ঠা! সীঁথির সিন্দুর আর হাতের নোয়ার অক্ষয়তার আশীর্ব্বাদ এসেছিল শাশুড়ী এবং অন্যান্য গুরুজনদের মুখ থেকে—আধুনিকা, প্রগতিবাদিনী সুবর্ণার কাছে তার মূল্য সেদিন কাণাকড়িও ছিল না—কিন্তু আজ?……

শোবার ঘরে এসে স্বর্ণা উঁকি দিয়ে দেখল একবার—অন্ধকার! গেটের আলোটাও নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিছুই দেখা যায় না! ধীরে ধীরে এঘরে এসে আন্দাজে খুকীর গায়ে হাত দিয়ে বলল,

—তোর বাবা আমাকে যাই ভাবুক—তুই যেন ভুল বুঝিসনে খুকু, আমি তোর মা, অকলঙ্কিতা, অপাপবিদ্ধা—খুকুর গা থেকে হাত তুলে স্বর্ণা নিজের ঠোঁটে ঠেকালো—তারপর ধীরে ধীরে আবার ওঘরে গিয়ে শুলো!

মাটির মেয়ে দূর্ব্বা—মূল্যবান স্বর্ণের সঙ্গে তার তুলনা হয় না, সে অমূল্য। কেমন সেই দূর্ব্বা, দেখতে হবে স্বর্ণাকে। নগণ্য একটা অভিনেত্রী, এমন কি সম্পদের সে অধিকারিণী, যাতে বরুণ ও-ভাষায় প্রশংসা করে? সকালেই যাবে স্বর্ণা সাত নম্বর সমুদ্র লেনে—রাত বেশী না হলে আজই যেতো। কিন্তু কেন যাবে? ঈর্ষা? না,—স্বর্ণার আর ঈর্ষা আসছে না কারো প্রতি! সে তার খুকীর মা—সন্তান-গৌরবে গরবিনী। পৃথিবীর প্রলোভনকে জয় করে সে খুকীর মা হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে—তার আবার ঈর্ষাভাজন কে থাকতে পারে?

তবু দূর্ব্বাকে দেখতে হবে—যে অহঙ্কার সে দেখিয়েছে ষ্টুডিওতে, তার জবাব তাকে দিয়ে আসবে স্বর্ণা—বলে আসবে,—স্বর্ণা স্বামীর পত্নী, সন্তানের জননী; তার সঙ্গে আলাপ করা সৌভাগ্য বলে মনে করা উচিৎ ছিল দূর্ব্বার পক্ষে।

কিন্তু দূর্ব্বা নিশ্চয় অসাধারণীয়া নারী। কাউকেই সে খাতির করে না, এ সত্য ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বুঝেছে স্বর্ণা। কাটুকে তো নয়ই, বরুণকেও গ্রাহ্য মাত্র না করে চলে গেল যথাসময়ে। ওর সঙ্গে নাকি এই সর্ত্ত আছে! আশ্চর্য্য! এমন সর্ত্ত করে কেউ আবার অভিনেত্রী সংগ্রহ করে নাকি? জানতো না স্বর্ণা—কিন্তু কাটু বলেছে, দুর্ব্বল বরুণ এই সর্ত্ত মেনে নিয়েছে। কেন? কি এমন মহিমা দূর্ব্বার! সুন্দরী,

হয়তো শিক্ষিতাও, কিন্তু সুবর্ণা কম কি তার থেকে? আরো কি বেশী আছে দূর্ব্বার—জানতে হবে।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে সুবর্ণা ঘুমুচ্ছে! বেলা হয়ে গেছে অনেকখানা! দু একবার চোখ খুলে দেখেও নিল, কিন্তু শরীর-মনের জড়তা ওকে শয্যা ত্যাগ করতে দিচ্ছে না। অকস্মাৎ শুনতে পেল,

—কাটুবাবু নীচের ঘরে অপেক্ষা করছেন—তাকেই বললো ঝি এসে।

—দেখা হবে না এখন; বলেদে, আমার শরীর খারাপ—সুবর্ণা ভাল হয়ে শুলো।

রঙ্গাবতী ফিল্ম কোম্পানীর ছবি তোলা শেষ হোল, এডিটিং চলছে; ওদিকে "দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরের" কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। দূর্ব্বার নামের যতকিছু পাবলিসিটি 'রঙ্গাবতীরা' করলো তার পূর্ণ ফল ভোগ করবে 'দূর্ব্বাদল কলা-মন্দির'—এই জন্য কাটু অতিশয় অসন্তুষ্ট, কিন্তু বরুণ সব বিষয়ে সাহায্য করছে দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরকে—কাজেই কাটু আর কি করতে পারে?

সংবাদপত্রে এবং প্রাচীরপত্রে দূর্ব্বার নাম বিঘোষিত হয়েছে এবং হচ্ছে—বহু অর্থ এর জন্য ব্যয় করলো রঙ্গাবতী ফিল্ম—মায়া সেনের নামেও কম টাকা খরচ করা হয়নি—কিন্তু অকৃতজ্ঞ মায়া সেনও সস্বামীক দূর্ব্বাদল কলা-মন্দিরে যোগ দিল—কাটু তার কোন ক্ষতি করতে পারলো না—কারণ, দূর্ব্বা সব সময় তার প্রতি লক্ষ্য রেখেছে—রাত্রে সুটিং থাকলে চিণ্ময়কে পাঠিয়ে দিয়েছে মায়াকে আগলাবার জন্য।

মায়ার স্বামী ভাল হয়ে এসেই দূর্ব্বাকে অযুত নমস্কার নিবেদন করলো এবং 'পরম-পিপাসা' ছবিতে অভিনয়ে যোগ দিল।

—সব অকৃতজ্ঞ! কাটু মত প্রকাশ করলো এবং এডিটিংরুমে কাঁচি

চালাতে বসলো। সুবর্ণার সঙ্গে এই পক্ষকাল আর দেখা হয়নি তাব। কে জানে কেমন আছে সুবর্ণা, কি ভাবছে, কেনইবা দেখা করলো না! কাটু অতিশয় বিরক্ত হয়ে 'রঞ্জাবতী' ছবিখানা অবিলম্বে মুক্তি দেবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

বরুণ আর বড় একটা আসে না 'রঞ্জাবতীতে'—দূর্ব্বাদল-কলা-মন্দিরের অফিস দূর্ব্বার নিজের ঘরে, সেখানেই সে যায়—কাটু খবর নিচ্ছে। কিন্তু সুবর্ণা কোথায়? সুবর্ণা সেদিন দেখা করে নি, অসুস্থ আছে বলেছিল, তারপর এই পনরদিন প্রায় হোল, সুবর্ণার কোন সন্ধান জানা যায়নি—অথচ খুকী বরুণের বাড়ীতেই আছে—তাহলে সুবর্ণা কি অন্তঃপুরে বন্দিনী হোল নাকি? সুবর্ণার মত মেয়ের পক্ষে সে তো সম্ভব নয়!

'পরম-পিপাসা' নাটকখানা চিণ্ময়ের লেখা – কিন্তু কী সে লিখেছে, কাটু জানে না। চিণ্ময় যখন ওটা পড়ে শুনিয়েছিল, তখন কাটু নিজের রঞ্জাবতীর গৌরবে এতই গর্ব্বিত ছিল যে কিছুই প্রায় শোনে নি—তবে এটা তার জানা যে এদেশের দর্শকগণ অত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাচন এবং অত সূক্ষ্ম রস পছন্দ করবে না। দূর্ব্বাদল-কলা ফেল মারবে—এ বিষয়ে কাটু নিঃসন্দেহ! কাটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগল।

কিন্তু ছবিখানা ডাইরেক্ট করবে কে? সত্যি কি দূর্ব্বা স্বয়ং ঐ ছবির ডিরেক্টর হবে? অসম্ভব কিছু নয় দূর্ব্বার পক্ষে—কারণ, কাজটা সে পরম যত্নে শিখবার চেষ্টা করেছে। ভাল অভিনয়-জ্ঞান আছে তার—টেকনিকটাও আয়ত্ত করা কঠিন নয় অত বুদ্ধিমতী আর লেখাপড়া জানা মেয়ের পক্ষে, তবে অভিজ্ঞতা কিছু নেই! পাবলিক কি চায়, কিছুই জানে না দূর্ব্বা, তাই ওরকম সূক্ষ্ম রসের নাটক সিনেমা করতে যাচ্ছে! দেখা যাক, কি হয়!

মনের মধ্যে কিন্তু দারুণ অস্বস্তি জাগছে কাটুর। কেমন যেন ভাঙন

ধরেছে তার জীবনে। এডিটিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ডাকলো, এবং সটান চলে এল বরুণের বাড়ীতে। সুবর্ণা ঘরেই আছে, কিন্তু দেখা করলো না—বলে পাঠালো, সে অতিশয় ব্যস্ত আছে বাড়ীর কাজে! কাটু পুনর্ব্বার স্লিপ পাঠালো—এক মিনিটের জন্য দেখা করতে চায়, জরুরী প্রয়োজন। এই নাছোড়বান্দা ভাব নারীর প্রিয়। সুবর্ণা নেমে এল। মৃদু হাসির সঙ্গে নমস্কার জানিয়ে সুবর্ণা বলল,

—এমন কি জরুরী কাজ—শরীর ভালো তো?

—হ্যাঁ—ব্যাপার কি সুবর্ণা?—পনর দিন তোমার দেখা পাইনি! করছো কি?

—আমাদের ক্লাব নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি—নাম বদলে 'শক্তিমণ্ডল' করা হোল—সেখানে নতুন ধরণে সব কাজ করবার প্রোগ্রাম হচ্ছে—তা ছাড়া ভাল একখানা নাটক অভিনয় করবো—এই সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।

—ও! তাহলে এ গরীবের ঝামেলাটা এড়িয়ে যাচ্ছ?

—না—সুবর্ণা হাসলো সুন্দর ভঙ্গীতে—সেদিন একটি মেয়ে দেখলাম তোমার জন্য, বছর সতেরো বয়স—দেখতেও ভাল—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতে চাইছি!

—অবশেষে আমার বিয়ের ঘটকালি করবে তুমি! ধন্যবাদ সুবর্ণা—কিন্তু তার কোনো দরকার নেই—নারীজাতিকে আমি চিনি······

—নারীকে চেন—নারায়ণীকে চেন না—হাসলো সুবর্ণা আবার—অলক্ষ্মীকে ভালই চিনেছ—লক্ষ্মীকে চোখে দেখনি—কামনাকেই বোঝ কামজয়ীকে বুঝতে চাওনা—

—তোমার 'শক্তিমণ্ডলকে' নিয়ে তুমি স্বর্গে যাও সুবর্ণা, আমার জন্য মাথা ঘামাবার দরকার নেই—একটা অন্য প্রশ্ন আছে।

—কি?—সুবর্ণা হেসেই প্রশ্ন করলো!

—বরুণের ভয়ে কি তুমি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে ?

বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল সুবর্ণা মুহূর্তের জন্য। কাটুর সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক তার ঘটেছিল, যা ছিন্ন করার জন্য কাটু আজ অভিযোগ করতে এসেছে ! স্বামীর বন্ধু এবং তারও পরিচিত, এই মাত্রই তো সম্পর্ক !—না, সুবর্ণা ভেবে দেখলো—শুধু এইটুকু সম্বল করেই সে সেদিন ডায়মণ্ডহারবার রোডে বেড়াতে যায়নি কাটুর সঙ্গে—সম্পর্ক আরো এগিয়েছিল কিছুটা। ভুল করেছিল সে, কিন্তু ভুলটা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ধীরে বলল,

—কারো ভয়ে আমি কিছু করিনে কাটুবাবু—আপনার সঙ্গে সেদিন বেড়াতে যাওয়াটাকে যদি আপনি নিবিড় কোনো সম্বন্ধ স্থাপন মনে করে থাকেন, তাহলে অতিশয় ভুল করেছেন—আপনার সঙ্গে সম্পর্ক যেমন ছিল, তেমনই আছে ; স্বামীর বন্ধু এবং আমারও বন্ধু আপনি—এর বেশি কিছু নয় !

—তাই কি সত্যি সুবর্ণা ? কাটুর প্রশ্ন তীব্র ব্যঙ্গমিশ্রিত !

—হ্যাঁ—বলেই সুবর্ণা জানালার কাছে গিয়ে জোর গলায় ডাক দিল,

—আয়া, খুকীকে এখানে আনো তো একবার, শিগগির—।

—খুকীকে আনতে হবে না, খুকীর মাকে জানিয়ে যাচ্ছি, রক্তলোভী বাঘ রক্তই খোঁজে।

কথাটা বলে কাটু চলে যাচ্ছে, সুবর্ণা দেখতে পেল ওর চোখের লেলিহান শিখা। কাটু দরজার কাছে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে আবার বলল,

—ভেবেছিলাম, বরুণের এই অপমানকর অমর্য্যাদা থেকে তোমায় আমি বাঁচাবো, কিন্তু না—তোমায় আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়াই উচিৎ—অকস্মাৎ কাটু ছুটে এগিয়ে এসে সুবর্ণার তন্বী দেহখানাকে তুলে নিস্পিষ্ট করে দিল—তারপর একটা সোফায় ওকে ফেলে দিয়ে চলে গেল বেরিয়ে !

মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড বিস্রস্তবাসা সুবর্ণা চেয়ে দেখলো, খুকীকে

কোলে নিয়ে আয়া এসে দাঁড়ালো – খুকী একটা বেলুন নিয়ে খেলা করছে। —ওকে নিয়ে যাও—বলে সুবর্ণা নিশ্চুপ পড়ে রইল সোফাতে। কী দারুণ দুঃসাহসী এই কাটু! বাড়ী বয়ে এসে সুবর্ণাকে অপমান করতেও ওর ভয় করে না! না জানি, আরো কি সে করবে সুবর্ণার জীবনের ক্ষতি! না বুঝে আগুনে হাত দিয়েছে সুবর্ণা – এখন উপায়?

বহুক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে রইল সুবর্ণা শোফাটায়। বাইরের বসবার ঘর এটা—সুবর্ণার এখানে এভাবে শুয়ে থাকা অনুচিৎ, কিন্তু মনের কেন্দ্র যেন অবশ হয়ে গেছে ওর। একটা আতঙ্কের সঙ্গে অদ্ভুত একটা সুখানুভূতি, এক রকম বিষাদের সঙ্গে বিষপানের উগ্র আনন্দ– মৃত্যুশীতল একরকম অনুভাবের সঙ্গে মারাত্মক একটা উত্তেজনা– ভাষায় যা প্রকাশ করা সম্ভব নয়—সুবর্ণা দীর্ঘক্ষণ ধরে শুয়ে শুয়ে ভাবলো—তারপর উঠে গেল নিজের ঘরে।

উত্তর, মধ্য এবং দক্ষিণ কলিকাতার অনেকগুলি হাউসে, 'রঞ্জাবতী' চিত্রের আজ মুক্তি-দিবস। সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে হাউসগুলো— বিস্তর প্রাচীর-পত্র লাগানো হয়েছে সহরের দেওয়ালে– এবং বহু বিচিত্র ভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে সংবাদপত্রে। লোভ দেখিয়ে লোক-আকর্ষণ করবার চির প্রচলিত রীতি স্বরূপ কয়েকটা ছবিতে কিঞ্চিৎ আদিরসাত্মক ভাবব্যঞ্জনাও প্রকাশ করা হয়েছে এবং লিখে দেওয়া হয়েছে—

—"প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য"—নৃত্যগীত বহুল এই নাটকখানি নাকি মানব-মনের চিরন্তন প্রেমক্ষুধা মিটাতে পারবে—বিজ্ঞাপন রচয়িতা স্বয়ং কাটুবাবু; কিন্তু বরুণ এ ব্যাপারে একেবারে হাত দেয়নি। সে ফোন করে

জানিয়েছে, যথাকালে যে-কোনো একটা হাউসে গিয়ে সে দেখবে—ছবিটা জনসমাদর পেয়েছে কিনা।

মুক্তির পূর্ব্বেই দূর্ব্বা, চিণ্ময়, মায়া ইত্যাদি দেখেছে, ছবিখানা কেমন হোল—কিন্তু জনসাধারণ সেটা কিভাবে নেবে, না দেখলে বোঝা যায় না, তাই দূর্ব্বা বলল চিণ্ময়কে,

—কাছাকাছি কোনো হাউসের দুখানা টিকিট কিনে আন—তৃতীয় শ্রেণীর!

—তৃতীয় শ্রেণীর কেন? বসতে অসুবিধা হবে দূর্ব্বা--

—তুমি দেখছি এর মধ্যে বড়লোক হয়ে উঠলে চিনুদা—কয়েক মাস আগে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনবার ক্ষমতাও ছিল না তোমার।

—হ্যাঁ—কিন্তু আজ যখন রয়েছে ক্ষমতা…চিণ্ময় বলতে চাইল!

—না, আজও ক্ষমতা নেই। গোবিন্দর টাকা এখনো গোবিন্দরই আছে—আমাদের পারিশ্রমিকের টাকা অন্য কাজে খরচ হবার জন্য জমা আছে—অতএব আমরা এখনো গরীব—যাও, তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে আন।

চিণ্ময় নিঃশব্দে বেরিয়ে কাছের একটা হাউসে গিয়ে দুখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনে আনলো এবং কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দেই দূর্ব্বার সঙ্গে বেরুলো সিনেমা দেখবার জন্যে। শুধু বিস্মিত হোল সে দূর্ব্বার বেশ দেখে। দূর্ব্বা যেন নব বিবাহিতা গ্রাম্য তরুণী—চওড়া সিঁথি করে উঁচুতে খোঁপা বেঁধেছে—ঠিক গ্রামের মেয়েদের মত শাড়ী পরেছে এবং খালি পায়ে চলেছে চিণ্ময়ের সঙ্গে। ওকে দেখে কেউ সন্দেহই করতে পারবে না যে সিনেমা-জগতের সঙ্গে কোনও যোগ ওর আছে! ও যেন বিবাহিতা বধূ—স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছে দেবমন্দিরে। চিণ্ময় চুপচাপই চলছে, কিন্তু বলল,

—এটা কি খেলা দূর্ব্বা ?

—খেলা নয়—লীলা—বলে হাসলো দূর্ব্বা !

—আমার মনে হচ্ছে ক্রীড়া—চিণ্ময় বলল—শিকার আর শিকারীর ক্রীড়া, যাতে একজনের আনন্দের জন্য অপরকে মৃত্যু বরণ করতে হয় !

—বেশ, একটা প্রশ্ন করছি, মনে কর, আমি আলেকজাণ্ডার, তুমি পুরুরাজ। আমার কাছে তুমি কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর ?—প্রশ্নের সঙ্গে হাসছে দূর্ব্বা !

—আমি পুরুষ, তুমি নারী—তোমার কাছে ঠিক পুরুষের প্রাপ্য ব্যবহার প্রত্যাশা করি !

—তোমার মনটা সাধারণ মানুষের স্তর থেকে আর উর্দ্ধে উঠলো না চিনুদা—অনর্থক খেটে মরছি আমি—তুমি নিতান্তই জৈব পদার্থ... দূর্ব্বা গম্ভীর হোল !

—অজৈব হবার এতোটুকু আকাঙ্ক্ষা নেই আমার। লোভে কামে, পাপে-পুণ্যে আমি মানুষ—মহামানব হবার ইচ্ছে করিনে—চিণ্ময়ও গম্ভীর গলায় বলছে,—নিরন্তর এই দুস্তর লোভের পারাবারে আমি সাঁতরাবো; আর এক ঢোক জল খাব না—এতবড় কামজয়ী শিব হবার সাধ আমার নেই—এই লীলার তুমি শেষ কর দূর্ব্বা—আমি অসহায় হয়ে পড়েছি।

—আমি স্বয়ং সহায় আছি—অসহায় হবে কেন—এস।

সিনেমায় ঢুকে গেল ওরা তৃতীয় শ্রেণীর দরজা দিয়ে। বিস্তর লোক বসেছে। অধিকাংশই পুরুষ এখানে, কারণ নারী নিয়ে যারা এখানে আসে, তারা প্রায়ই প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে বসে। কিন্তু দূর্ব্বাদের পিছনের চেয়ার-গুলোতেই দ্বিতীয় শ্রেণী—কাজেই ওর পেছনেই দু-তিনটি তরুণী ছিলেন। দূর্ব্বা বসলো, তারপর আঁচল থেকে এক প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বের করে চিণ্ময়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—নগদ পাঁচ আনা দিয়ে কিনলাম—

—কি দরকার ছিল কিনবার! বিড়িতেই বেশ চলে যাচ্ছে—চিণ্ময় শুষ্ক জবাব দিল।

—কথাই তো আছে যে আমার হাতে পাঁচভরির কঙ্কণ না ওঠা পর্য্যন্ত তোমায় বিড়ি খেতে হবে, ছেঁড়া চটি 'পরতে হবে, ষ্টিলের কলমে লিখতে হবে—আর···

—আর?—চিণ্ময় প্রশ্ন করলো। দূর্ব্বা হাসছে। হেসেই বলল,

—আর আলাদা বিছানায় শুতে হবে।

পিছনের মেয়েগুলি এই দুঃসাহসী বধূটির কথাগুলো শুনছিল, কারণ ছবি প্রদর্শন তখনো আরম্ভ হয়নি। এরা হাস্‌ছে। একজন বলল দূর্ব্বাকে,

—এই রকম সর্ত্ত করেই বিয়ে করেছেন নাকি?

—হ্যাঁ ভাই—দূর্ব্বা জবাব দিল—এতো গরীব হয়ে?—জগতে বাস করা চলে না। মানুষকে মানুষের মত বাঁচতে হবে—

—পাঁচ ভরির কঙ্কণ হলেই বুঝি মানুষের মত বাঁচা হয় কথাটা বলে চিণ্ময় বিড়ি ধরাবে এবার।

—না—পাঁচ ভরির কঙ্কণের সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর সিনেমার টিকিট কিনতে হবে।

—তাহলে কোনো বড় লোকের ছেলেকে বিয়ে করলেন না কেন আপনি?—বলল একটা মেয়ে।

—ওকেই তো ভালবাসি—বড়লোককে বিয়ে কেমন করে করবো, বলুন—আমি চাইছি যে আমার জন্য ও বড়লোক হোক্‌···ওকে হতে হবে—

—পাঁচ ভরি কঙ্কণের দাম এমন কিছু বেশি নয় দূ···র্‌···বা···

—এই চুপ—দূর্ব্বা ধমক দিল—নামটা উচ্চারিত হলে এরা তাকে চিনে ফেলতে পারে, বলল—আমার নাম দুর্গা—আমাকে পেতে হলে শিব হওয়া

দরকার—

—শিব তো মোটেই বড় লোক নয় ভাই—একজন তরুণী হেসে বলল।

—বলেন কি! শিবের মত ধনী কেউ আছে নাকি সৃষ্টিতে! অনন্ত ঐশ্বর্য্যময়ী অন্নপূর্ণা তাঁর পদপ্রান্তে পড়ে থাকেন—গ্রাহ্যই করেন না শিব। ঐশ্বর্য্যের মহত্তম কল্পনাও ওর বেশি পৌঁছাতে পারে না—দূর্ব্বা কথাটা বন্ধ করলো, কারণ ওরা এসব কথা বোঝে না!

—শিব শবরূপী—তাই লক্ষ্য করে না—নেশাতেই আছে—আমি শব নই, নেশাও করি নি—বলে চিণ্ময় রাগ সামলাবার চেষ্টা করছে। দূর্ব্বা সিগারেটের প্যাকেটটা আবার এগিয়ে ধরে বলল—নেশাই তো করতে বলছি তোমায়—নাও—পিছনের মেয়েগুলো এবার হেসে উঠলো। কিন্তু চিণ্ময় বলল—'ধূমপান নিষেধ' এখানে; শ্মশানে গিয়ে ওটা দিও—ভূত হয়ে টানা যাবে।…

—ষাট্ ষাট্—! দূর্ব্বা অত্যন্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল—কি যে সব খারাপ কথা বল!

শো আরম্ভ হোল—কথা আর হোল না ওদের। চিণ্ময় কথাও বলতে চায় না। আর, ও সত্যি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। দূর্ব্বা তাকে নিয়ে কি যে করবে, কে জানে! প্রতি মুহূর্ত্তে সে আশা করে—দূর্ব্বা এবার আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু কৈ! অথচ চিণ্ময় অনুভব করে, দূর্ব্বা তাকে প্রাণভরে ভালবাসে।

নিশ্চুপ দেখলো ওরা ছবিখানা—ভালই হয়েছে, বোঝা গেল দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে দূর্ব্বা একটা ট্যাক্সি ডেকে চিণ্ময়কে নিয়ে উঠে বসল।

গড়ের মাঠ, গঙ্গার ধার—নিস্তব্ধ রাত্রির শান্ত সৌন্দর্য্য! চিণ্ময় চুপচাপ পাশে বসে। হঠাৎ দূর্ব্বা বলল,

—কথা বলছো না কেন চিণ্ময়দা—উৎস ফুরিয়ে গেছে নাকি?

—কথার তো প্রয়োজন নেই—জীবনের পথে আমরা পরস্পরকে সাহায্য করছি !

—হ্যাঁ—কিন্তু আমি এখানে একা, তুমি পুরুষ, আমি নারী - হাসলো !

—আমার পৌরুষ নারীর দেহ লুণ্ঠন করে না দূর্ব্বা—নারীকে সে সম্মান করতে জানে।

—তোমার এই মহত্বকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি চিণুদা—বলে হঠাৎ দূর্ব্বা সত্যই প্রণাম করল চিণ্ময়কে।

গোবিন্দ কয়েকদিন বেশ আনন্দেই ছিল সিনেমাকোম্পানী খুলে। ভেবেছিল, দূর্ব্বাকে লাভ করা আর কঠিন হবে না তার পক্ষে! কিন্তু দিনকয়েকের মধ্যেই বুঝলো—দূর্ব্বা সেই দূর-দূরতমা হয়েই রইল! কিন্তু অন্য একটা পরিবর্ত্তন এসেছে গোবিন্দের মধ্যে। সে নিজেই যথেষ্ট বিস্মিত হচ্ছে এই স্বরূপ উপলব্ধি করে। চিণ্ময়ের 'পরম পিপাসা' নাটকখানা ভাল ভাবে সে শুনেছে এবং বুঝবার চেষ্টা করেছে! দাদু বরাবর সাহায্য করেছেন ওদের—গোবিন্দ বুঝেছে ওর কিছুটা।

অপরূপ একটা অনুভাব জাগছে ওর অন্তরে! ওর যৌবনধর্ম্মী সৃজন-প্রবণ মন মহাসৃষ্টির বৈচিত্র্যের অনুধ্যান করে; ধরণীর শ্যামল দূর্ব্বাদল থেকে আকাশের বিচিত্র গ্রহ-উপগ্রহ, মেঘ-বিদ্যুৎ বৃষ্টি-বজ্রের প্রকাশ ব্যঞ্জনা ওকে যেন একটা অননুভূত আনন্দের আস্বাদ দিচ্ছে! "পরম পিপাসার" নায়ক চন্দন সৃষ্টির সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করে মহাজননীর অপার করুণা—রাজার দুলাল সর্ব্বরিক্ত, সন্ন্যাসী হয়ে জীব আর জগৎ কল্যাণে জীবনের সব কিছু সমর্পণ করলেন—তবু মানুষ তাঁকে রূঢ় আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করলো—শেষে নিশ্চিহ্ন করে দিল—তবু তিনি শেষ কথায় বললেন—'মানুষকে তিনি মার্জ্জনা করলেন, মানুষের অধস্তন পুরুষ যেন তার পিতৃগণের এই পৈশাচিক ব্যবহার

মার্জ্জনা করে।' নিজকে নিঃশেষে ক্ষয় করে চলে গেলেন চন্দন ; শুধু বলে গেলেন—মানুষের মনুষ্যত্বকে তিনি পূজা করতে এসেছিলেন, মানুষের পূজা নিতে তিনি আসেন নি—শুধু এই জন্যই তাঁর দেহের ভস্মাবশেষও রেখে গেলেন না—শতাব্দি পরের মানুষ যা নিয়ে ওঁর স্মৃতিপূজা করতে পারে—এই অত্যদ্ভুত ত্যাগ আর আশ্চর্য্য মানবপ্রেম গোবিন্দকে কেমন আত্মবিস্মৃত করে তুলেছে। 'পরমপিপাসার'নায়ক চন্দন—নায়িকা কজ্জলীর সঙ্গে বহু জন্ম থেকে বিচ্ছিন্ন ; কাহিনীর সে-অংশ অপ্রাকৃত হলেও জননীর মুখে শোনা নিজ জীবনের এই গল্প চন্দনের কাছে ইতিহাস। চন্দনের এই জীবনেও এক বাল্য সখীর অনুসন্ধান চললো, কিন্তু মানুষ তাকে ভুল বুঝলো—বুঝলো যে চন্দন চরিত্রহীন ; তাই জন্মযোগী, চিরব্রহ্মচারী,মানব-জগতের অকৃত্রিম বন্ধু চন্দনকে তারা মানুষের সঙ্গে সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। নিরুপায় চন্দন নিঃশব্দে চলে গেলেন পৃথিবী থেকে—এই গল্পকে যে প্রেমপূতঃ পবিত্রতা এবং নিষ্ঠার অত্যদ্ভুত পরিবেশে চিত্রায়িত করা হয়েছে—গোবিন্দর মনকে তা শুধু রসাপ্লুত করছে না—লোকাতীত এক প্রেমানুভূতিতে জাগ্রত করছে।

চন্দনের ভূমিকায় বরুণের অভিনয় দেখে গোবিন্দ যে অনুপ্রেরণা পায় তাতে সে যেন বুঝতে পারে, দূর্ব্বার দিকে তার কামজ মোহ কতখানি অকিঞ্চিৎকর—দেহজ ক্ষুধা আর অন্তরতমের জন্য আকুতির তফাতটা সে যেন অনুভব করতে পারছে এখন।

মানুষের মনে কোথায় কখন কি পরিবর্ত্তন ঘটে, কারো জানা নেই—অকস্মাৎ সেদিন সন্ধ্যায় বেরোবার মুখে গোবিন্দ শুনতে পেল, তার ষোড়শী কন্যা সেই ক্যামেরাম্যানকে বলছে,—

—তুমি আমায় লোভ দেখিও না, বুঝলে! আমায় সত্যি ভালবাসলে অমন করে পালিয়ে বংশের মুখে চুণকালি দেবার কথা বলতে না তুমি।

—এ ছাড়া কোনো উপায় নাই রাণী, তোমার বাবা আবার শিগ্গি

বিয়ে করবেন—তাঁর বুড়ো বয়সের বৌ এসে তোমায় অপমান করবে—এটা সইবে না আমার !

—বাবা কি করবে, তা নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না—মেয়েটা বললো—বাবার থেকে তুমি আমায় বেশি ভালবাস নাকি ? বাবার ভালবাসায় স্বার্থ নেই।

—কেন এ কথা বলছো রাণী ?

—বলছি যে আমাকে সত্যি ভালবাসলে অতখানা নীচে আমায় তুমি নামাতে চাইতে না—তোমার সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার কেলেঙ্কারী করতে পারবো না আমি—আর বাবা বিয়ে করলে ধনসম্পত্তি তো আমি পাব না—তখন তোমার ভালবাসা কোথায় থাকবে, আমার জানা আছে ; যাও…

মেয়েটাই চলে এল ঘরের মধ্যে। গোবিন্দ তার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা করতে চায় না, কিন্তু দেখা হয়ে গেল। যেন কিছু শোনে নি, এমনিভাবে বললো—কোথায় গিয়েছিলি মা ?

—দূর্ব্বাদির বাড়ী গিয়েছিলাম বাবা—

দূর্ব্বাকে 'দিদি' বলে মেয়েটা ; এ পাড়ার অনেকেই বলে তাকে দিদি ! কিন্তু গোবিন্দ কন্যার মুখে এই শব্দটা শুনে আজ যেন কেমন ভাবিত হয়ে উঠলো। দূর্ব্বা তার কন্যার দিদি—আর গোবিন্দ সেই দূর্ব্বার প্রতি কি ভাব পোষণ করে অন্তরে ! নাঃ—গোবিন্দর মোহ মুদ্গরে প্রহৃত হচ্ছে যেন—নিজকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হচ্ছে ওর ! দূর্ব্বা তো সত্যি কন্যাস্থানীয়া, সত্যিই কন্যা !

অকস্মাৎ রাণীর কথাটা মনে পড়ল—"বাবার থেকে তুমি আমায় বেশী ভালবাস নাকি ? বাবার ভালবাসায় কোন স্বার্থ নেই, জানো"

সত্যি স্বার্থ নাই। সন্তানকে ভালবাসার উৎসটা স্বতঃস্ফুরিত জীবের

মনে—কামজ নয়, রূপজ নয়, মোহজ নয়—এ ভালবাসা আত্মজ! আত্মা থেকে জন্মায়—উরস থেকে জন্মায়—তাই সন্তান ঔরসজ! কেমন যেন অদ্ভুত ভাব জাগতে লাগলো গোবিন্দর অন্তরে—এতোটা বয়স সে করেছে কি? কি ভেবেছে আর কি করেছে সে! জীবনের হিসাব পরীক্ষা করলে দেখা যায়—অর্থ আর যৌবন অপরিমিত ব্যয় করেছে, সে—অর্জ্জন করেছে শুধু আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা। আধ্যাত্মিকতার ঘরে কাণাকড়িটাও জমা নেই, অথচ দিন প্রায় ফুরিয়ে এল!

গোবিন্দ চঞ্চল পদে বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে দাদুর কাছে! উঠলো গিয়ে সটান দাদুর ঘরে। পঞ্চতীর্থ একবার তাকিয়ে বললেন,

—বসো গোবিন্দ, মনে হচ্ছে, তুমি বড্ড মানসিক অশান্তিতে রয়েছ, কি ব্যাপার?

—উদ্ধার করুন আমায়—বলে গোবিন্দ অকস্মাৎ তাঁর পদপ্রান্তে পড়ে চেপে ধরলো পাদুখানা। বিস্মিত, ব্যাকুল চৌধুরী মশাই এই উচ্ছ্বাসের কোন অর্থ খুজে পেলেন না। ধীরে ধীরে গোবিন্দকে তুলে বসিয়ে বললেন,

—উদ্ধার তোমায় আমি কি করবো গোবিন্দ, তুমিই আমার উত্তমর্ণ—ঋণের দায় থেকে কবে উদ্ধার পাব, জানিনে—বৃদ্ধ চাইলেন-গুরুদেবের ফটোর পানে!

—ঋণের দায়!—না, দাদু, ভাড়ার টাকা আমার আর পাওনা নেই—আর···গোবিন্দ অকস্মাৎ আবার দাদুর চরণ ধরে বললো,—আমায় দীক্ষা দিন—এই বাড়ীখানা আমি গুরুদক্ষিণা দেব···আমায় কৃপা করুন প্রভু'!

—আমি তো দীক্ষা দিই না গোবিন্দ—ও কাজ কখনো করিনি আমি—

—আমার জন্য করতে হবে—বলে গোবিন্দ আরো জোরে চেপে ধরলো

দাদুর পা দুখানা। মানুষের এই সব দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের সুযোগ নেবার লোক দাদু নন—তিনি বুঝলেন—গোবিন্দের এই উচ্ছ্বাস সাময়িক—। এ বৈরাগ্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ওকে সান্ত্বনার বাণী কিছু বলা দরকার!

—মানুষ জন্ম থেকেই মৃত্যুর পথে এগুচ্ছে গোবিন্দ, এমনি অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে জীব চলেছে—সেই মৃত্যুকে বরণ করবার সাধনাই জীবনের সাধনা; নির্ভয়ে নিঃশঙ্কে তাকে গ্রহণ করতে পারলেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়—

—সেটা কি ভাবে হতে পারে প্রভু? গোবিন্দ প্রশ্ন করলো।

—সব কামনা-বাসনার ঊর্দ্ধে নিজেকে বিস্তৃত করতে পারলেই হয়—ধন জন, যৌবন—আয়ু, আরোগ্য, বিজয়—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক কিছুরই আর যে প্রত্যাশী নয়—সেই সে মহামৃত্যুকে বরণ করতে পারে—সেই পরম মৃত্যুই নির্ব্বাণ, মহা পরিনির্ব্বাণ······

চোখ দুটি জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠলো ওঁর অকস্মাৎ—গুরুদেবের ছবির পানে তাকীচ্ছেন। গোবিন্দ দেখলো সেই মূর্ত্তি। বেশী কথা উনি বললেন না—কিন্তু যতটুকু বললেন, গোবিন্দর যেন তাতেই অপরিসীম তৃপ্তি জাগছে। নিঃশব্দে বসে রইল গোবিন্দ অনেকক্ষণ, তারপর প্রণাম করে উঠে গেল—কোথায় গেল কে জানে!

দূর্ব্বা এসে দাঁড়ালো দাদুর কাছে—ধ্যানস্তিমিত মূর্ত্তিটি কিছুক্ষণ দেখে বলল,

—আজ আমাদের 'পরম-পিপাসা' ছবিখানির মুক্তি দিবস দাদু—যাবে তুমি দেখতে? গেলে আমরা সবাই খুসী হই—ওরা কেউ তোমায় বলতে সাহস করছে না—চলো না দাদু······

দাদু দেখলেন, দূর্ব্বার পেছনে চিণ্ময়, বরুণ এবং মায়া দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু গোবিন্দ কৈ! এতো টাকা খরচ করে যে ছবি তোলা হোল, সেটা

দেখাবার জন্য গোবিন্দরই তো অধিক উৎসাহ হওয়া উচিৎ। তিনি প্রশ্নই করলেন,

—গোবিন্দকে দেখছি না যে—কোথায় সে ?

—কৈ, তিনি তো আসেন নি—বরুণ জবাব দিল।

—হ্যাঁ, এসেছিল আমার কাছে—বলে দাদু যেন কি ভাবতে লাগলেন।

—আপনাকে যেতে হবে দাদু—মায়া, বরুণ এবং চিন্ময় অনুরোধ জানাল!

—যাব—বলে একটু হাসলেন তিনি—মানুষের জীবন নিত্য নতুনের অভ্যর্থনা করে; যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ আমার জীবনেই বা সেটা বাদ যাবে কেন? ওপারে যদি কেউ প্রশ্ন করে তো বলতে পারবো, পৃথিবীর সর্ব্বাধুনিক আলোক-চিত্র-বিজ্ঞানও আমি চোখে দেখে এসেছি!

—এরোপ্লেনেও আপনাকে চড়িয়ে দেব দাদু—বরুণ হাসতে হাসতে বললো—ওপারে গিয়ে বলতে পারবেন যে পুষ্পকরথে চড়েছেন!

—দেহরথ জীর্ণ হয়ে গেছে ভাই, ওটায় চড়ে আর অপমৃত্যু ঘটাতে চাইনে—বলে হাসলেন দাদু—আর এটা খুব আধুনিকও নয়—পদার্থ বিজ্ঞানের চরম পরিণতি হবে সেই দিন, যে দিন জড়কে তারা চৈতন্যে আনতে পারবে—কিন্তু এসব কথা থাক এখন—কোথায় শো তোমাদের?

—কাছেই—হেদোর ধারে কলালক্ষ্মীতে—আমরা গাড়ী নিয়ে আসছি! বলে ওরা সব চলে গেল! শুধু দূর্ব্বা রইল দাদুর কাছে!

—তুই যাবিনে দিদি?

—তোমার সঙ্গে যাব দাদু—বলে দাদুর পায়ে হাত বুলোতে লাগলো।

—দুর্ব্বল হয়ে পড়ছিস দিদি তুই? দাদু সস্নেহে প্রশ্ন করলেন।

—না দাদু—না—বলে দূর্ব্বা যেন নিজকে সম্বৃত করতে চাইল প্রবল শক্তিতে! দাদু সস্নেহে ওর মাথায় হাত দিলেন।

দূর্ব্বা নিশ্চল চোখে চেয়ে রইল দাদুর শুভ্র-সুন্দর পা'দুটির পানে কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে বলল,

—বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না দাদু—আর ব্যভিচার আমার অসহ্য—এ দুটোর উর্দ্ধে কি মানুষের জীবনে আর কিছু নেই ?—

—আছে দিদি—তার নাম প্রেম—অনাবিল, আনন্দময় চিরবিরহ. যে প্রেমরস তোদের নায়িকা কজ্জলীর মুখে উদ্গীত হয়েছে—

'শূন্য নহে মোর শূন্য অন্তর, পূর্ণ বিরহের আর্ত্ততায়—
হে প্রিয় প্রিয়তম, বিদেহী দেহ মম
তোমার দেহতেই মুক্তি পায় !'

—ওতেই হবে দাদু—ঐ কথাগুলিই আমি আশ্রয় করবো—দূর্ব্বা বাড়িতে উঠে চলে গেল। দাদুর চোখের জল সে দেখতে চায় না।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনী চলেছে 'পরম পিপাসার'। বরুণ ছাড়া রঞ্জাবতী ফিল্মের আর কেউ যুক্ত নেই এদের কোম্পানীতে, কিন্তু আজ সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। কাটু, নৃপেন, মিহির তো এসেছেই—সুবর্ণাও এসেছে ছবি দেখতে। 'কলালক্ষ্মী' নামক চিত্রভবনে শো দেখানো হোচ্ছে। ক্ষৌমবাস পরিহিত দাদুকে ঘিরে ওরা সকলেই—শুধু সুবর্ণা আর কাটু একটু দূরে বসে। ছবির পর্দ্দায় তপশ্চারিণী কজ্জলী প্রিয়তম চন্দনের উদ্দেশে অর্ঘ্যাঞ্জলি দিচ্ছে,—

'অনন্তকালের বিরহের বাতি জ্বালিয়ে আমার অভিসার-পথ আলোকিত রাখ প্রিয়তম, দৈহিক মিলনের কজ্জলকালিতে তাকে মলিন হতে দিও না……'

দূর্ব্বা নিঃশব্দে শুনে উঠে গেল একটু তফাতে। এগুলো তার নিজেরই

অভিনয় করা, শোনবার কিছু নেই, কারা কজ্জলীর ভূমিকায় সেই অভিনয় করেছে। কিন্তু সেকি সত্যি দূর্ব্বা? ঐ অপরূপ বিরহের আনন্দঘন ব্যথা কি সইবার শক্তি সত্যি আছে তার? না-- দূর্ব্বা দূরে-বসা চিন্ময়ের পানে চাইল। আধো অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছে না সে-মুখ—কিন্তু এই রহস্যময়তা যেন আরো ভাল—আরো সুন্দর—আরো মোহময়। ওর কাছে গিয়ে একটু বসবে দূর্ব্বা—"যেখানে বাড়ালে হাতে তোমার আঙুলে ছোঁয়া লাগে"? কিন্তু না—দূর্ব্বা দেখতে পেল— নায়িকা কজ্জলী বলছে—

'আমার জীবনে থাক তুমি প্রিয় বিরহের চির অন্তরালে,—'

না, দূর্ব্বা গিয়ে বসবে না চিন্ময়ের কাছে আর। কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছে দূর্ব্বার—কেন এমন হচ্ছে? কেন?

কারণটা অনুসন্ধান করতে চাইল দূর্ব্বা। বুকের ব্লাউজ থেকে বের করলো একখানা খামের চিঠি---প্রেমপত্র নয়, চিণ্ময়ের মার লেখা চিঠি, চিণ্ময়ের নামেই—কিন্তু দূর্ব্বার খোলার অধিকার আছে। মা লিখেছেন, দীর্ঘদিন চিণ্ময় বাড়ী আসেনি—এবার বাড়ী এসে বিয়ে করুক—সুন্দরী পাত্রীও ঠিক করে রেখেছেন তিনি কাছেরই এক গাঁয়ে।

চিণ্ময়কে এখনো চিঠিখানা দেয়নি দূর্ব্বা—দিতে হবে, এবং তাকে মার কাছে পাঠিয়েও দিতে হবে বিয়ে করবার জন্য—কিন্তু দূর্ব্বার কি আর রইলো তারপর?

অকস্মাৎ দূর্ব্বার চোখে অন্ধকার জাগছে—জল এসে গেছে নাকি চোখে ওর!

* * * *

পরিতৃপ্ত দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাধ্বনির সঙ্গে দূর্ব্বা বাইরে এল দাদুকে নিয়ে। চিণ্ময় তখনো ভেতরে। তার দেরী হবে, কারণ কিঞ্চিৎ

জলযোগের ব্যবস্থা আছে ওখানে। দূর্ব্বা কিন্তু অপেক্ষা করতে পারলো না, দাহুর কষ্ট হবে, এই অজুহাত দেখিয়ে দাদুকে নিয়ে বাড়ী চলে এল—আর সবাই রইল ওখানে।

সুবর্ণা নিঃশব্দেই দেখলো দূর্ব্বার অপূর্ব্ব সুন্দর অভিনয়—উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাদ এবং অনস্বীকার্য্য রূপবৈভব; কিন্তু অভিনন্দন গ্রহণ করবার জন্য দূর্ব্বা তো মুহূর্ত্তের জন্যও অপেক্ষা করলো না। সহস্র দর্শক বাইরে দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনির সঙ্গে চীৎকার করছে, দূর্ব্বা দেবীকে তারা দেখতে চায়—শরীরিণী দূর্ব্বাকে - এই সুন্দর নাটকের নায়িকা দূর্ব্বাকে।

চিন্ময় দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাতযোড় করে তাদের সবিনয়ে জানালো, দূর্ব্বা তার বৃদ্ধ দাদুকে নিয়ে বাড়ী চলে গেছে। অপর সব অভিনেত্রী এবং অভিনেতাগণ উপস্থিত আছেন এবং সে স্বয়ং নাট্যকার। দর্শকবৃন্দ যে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি তাদের দিচ্ছেন, নতমস্তকে এঁরা তা গ্রহণ করছেন। বরুণ, মায়া, চিন্ময় ইত্যাদি সকলে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো ওঁদের। মুগ্ধ দর্শকগণ দূর্ব্বাকে না দেখতে পেলেও খুসী মনে চলে গেলেন অভিনন্দন জানিয়ে!

সমস্ত ব্যাপারটা একধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল সুবর্ণা। অনেকদিন পূর্ব্বে অভিনীত 'সতীশ্রী' নাটকের অভিনয়-রজনীর কথা তার মনে পড়লো—মনে পড়লো বরুণের সঙ্গে তার সেদিনের ব্যবহার এবং মনে পড়লো, কি ভাবে দর্শকদের প্রীতি-অভিনন্দন সে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু দূর্ব্বা তো কিছুই গ্রহণ করলো না; কেন? মানুষের মুক্ত-কণ্ঠের এই আশীর্ব্বাণী—অন্তরের এই প্রীতিধারা না গ্রহণ করবার কী কারণ আছে? হয়তো সত্যিই দাদুর অসুবিধা হবে, তাই দূর্ব্বা চলে গেল; কিন্তু এতক্ষণ দাদু তো দিব্যি বসেছিলেন, আর পনর মিনিট বসলে কি এমন অসুবিধা হোত তাঁর? দূর্ব্বার অত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়ার

মূলে অন্য কোন কারণ আছে ; কি সে কারণ ?—সুবর্ণা ভাবলো—মানুষের অন্তরের এই প্রীতির উৎস প্রেম নয়, কাম। এই কামনা মানুষকে ধরে রেখেছে মর্ত্ত্যলোকে—কল্পনায়, কলায়, কৃষ্টিতে, কিন্তু এর গতি সলীলধর্ম্মী—নিম্নাভিমুখী। দূর্ব্বার অগ্নিধর্মী মন মৃত্তিকা ছাড়িয়ে উর্দ্ধগতিতে আকাশ পানে যেতে চায়—ক্ষুদ্র দূর্ব্বা, কিন্তু তাতে প্রতিফলিত হয় আকাশের উদার নীলিমা—সাগরের অসীম ব্যাপ্তি !

—সুবর্ণা !—কাটু অকস্মাৎ আঘাত করলো ওর চিন্তাধারায়। চকিত সুবর্ণা বলল,

—কি ? কিছু বলছেন নাকি ? বিরক্তিটা চেপে বলল সুবর্ণা।

—এ ছবি বাংলা দেশ নেবে না। বিশেষ কয়েকজন বুদ্ধিমান দর্শক এর প্রশংসা করে গেলেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে এ ছবি অচল,—লোকে বুঝবে না !

—সাধারণ মানুষের মাথাগুলো আপনার মাথার মতন গোবর-ভরা নয়—বুঝলেন ?

সুবর্ণা সরে এল অন্য দিকে খানিকটা। চা পানের আয়োজন হয়েছে ওখানেই দোতালার খোলা বারান্দায়। নিজেদেরই কয়েকজন লোক মাত্র খাবে। গোবিন্দ একধারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে যোড়হাতে—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি যেন সে আজ। সুবর্ণা ওখানেই এসে বসলো। ওদিকে কাটু তার বলা কথাগুলোর পরিণতি দেখে কিছু যেন হতাশ হয়েছে। কিন্তু হতাশা তার জীবনে কম। সেও এসে বসল সুবর্ণার পাশের চেয়ারে। সুবর্ণা বিরক্ত হচ্ছে। হঠাৎ মায়াকে দেখতে পেয়ে ডাক দিল—

—মায়াদি—মায়াদি ! তোমার স্বামী বেশ ভাল আছেন তো ?

—হ্যাঁ—এই তো—মায়া তার স্বামীকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল সুবর্ণার সঙ্গে ! বলল,

—তোমার জীবনের জন্য ওঁদের কাছে ঋণী আমি—ইনি আর দূর্ব্বা না থাকলে তোমায় আমি বাঁচাতে পারতাম না।

সবিনয় নমস্কার জানিয়ে সুন্দর লোকটি এগিয়ে এল সুবর্ণার দিকে—মুখে পরিতৃপ্তির হাসি, যেন পত্নীর গর্ব্বে বুকখানা ভরে রয়েছে। ইনি স্বয়ং নর্ত্তক, তাই সুঠাম সুন্দর ভঙ্গী শিবের নটরাজ মূর্ত্তি মনে করিয়ে দেয়।

—মায়া যে কী আশ্চর্য্য ভালোবাসে আপনাকে—ওঃ! পৃথিবীতে এ প্রেম দুর্লভ!

—ও আমার অনাদিকালের স্বপ্নের ধন সুবর্ণা দেবি,—বহু তপস্যায় ওকে পেয়েছিলাম

—কোথায় তপস্যা করেছিলেন?—হাসছে সুবর্ণা কথাটা বলতে বলতে!

—যিনি সবকিছু দিতে পারেন তাঁর কাছে; তুষ্ট হয়ে তিনি বর দিতে এলেন, বললেন, কী তোমার প্রার্থনা বৎস? আমি বললাম—"ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি মনোবৃত্তানুসারিণীম্"—হাসতে লাগলো বিলোচন অপূর্ব্ব সুন্দর হাসি!

প্রেমে পরিপূর্ণ এই হাসি সুবর্ণাকে কেমন যেন মোহগ্রস্ত করে তুললো। একটু দূরেই বরুণ, কিন্তু কথাগুলো সে শুনতে পাচ্ছে ওদের। বরুণের কাছে অন্য একটি মেয়ে, নাম রঞ্জিতা; এই ছবিতে কজ্জলীর সখী সেজেছে সে। কিন্তু রঞ্জিতা কোনো কথা বলছে না বরুণের সঙ্গে—চা খাচ্ছে। ওর সীমন্তে সিঁদুর নেই—হয়তো কুমারী, কিম্বা—যাক্‌গে, কিছুই দরকার নেই ভাববার! বিলোচন পূর্ব্ব কথার রেশ ধরে বলছে তখনো—ও তো শুধু বিয়ে করা বৌ নয়, 'বিবাহের চেয়ে বড়'—কি মায়া, তোমাদের দূর্ব্বা দেবী কি যেন বলেন? মায়াকেই শেষের প্রশ্নটা করলো বিলোচন। মায়া হেসে জবাব দিল,

—দূর্ব্বা বলে না, বলেন রবীন্দ্রনাথ—

বিকশিত বিশ্ব বাসনার
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছ তোমার =

—ওটা তো "উর্ব্বশী" কবিতার লাইন! কাটু অকস্মাৎ ধাক্কা দিল কথাটা বলে। এই অরসিকতা এবং অননুভবশক্তি পীড়িত করছে সুবর্ণার সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে। কাব্য যেখানে বাক্য এবং ব্যঞ্জনাকেও ছাড়িয়ে আত্মারূপী ধ্বনিতে বিলসিত হয়—সেখানে নামগত কোন কিছু আর থাকে না; সে তখন পিপাসুর রসানুভূতির সুবর্ণময় প্রকোষ্ঠে রসরাজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কয়েকটা কথার ছটায় কাটু সেদিন সুবর্ণাকে মুগ্ধ করেছিল—হয়তো তার যৌন জীবনের দুর্ব্বলতার দুয়ারে আঘাত করেছিল সজোরে। কিন্তু তাকে অতিক্রম করে মানুষ যেখানে প্রেমের পবিত্রতম মন্দিরে পূজারী, কাটুর সেখানে প্রবেশ নাই! সুবর্ণা করুণ চোখে চাইল স্বামী বরুণের দিকে—বরুণ চোখ নামিয়ে চা খাচ্ছে! সুবর্ণা বলল,

—জীবনকে কাব্যের মত করে পাওয়া মানুষের অতি বড় ভাগ্য বিলোচনবাবু, ঈশ্বর-কৃপায় আপনারা পরস্পরকে পেয়েছেন—সবার জীবনে তো ওটা ঘটে না!

—দূর্ব্বা বলে,—মায়া বললো—আধুনিক মানুষের জীবনে এতো বেশী জটিলতা জেগেছে যে সহজ সুন্দর প্রেমকে আমরা ধরতে পারিনে। উর্ব্বশীর অতি লঘুভার পাদপদ্মতে আমরা ঘোড়ার নাল লাগিয়ে অত্যন্ত ভারী করে তুলেছি। আমাকে যে ভালবাসবে, আমার জটিল মনোবৃত্তি তাকে বিড়ম্বিতই করতে চায়—এ বিষয়েও আমাদের কবি বলেছেন,

'আমারে যে ডাক দেবে, এ জীবনে তারে বারম্বার ফিরেছি ডাকিয়া,
সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার থাকিয়া থাকিয়া...'

এই থাকিয়া থাকিয়া দ্বার খোলা যেন আমাদের স্বভাব হয়ে গেছে!

—এর কারণ কি?—সুবর্ণা প্রশ্ন করলো মায়াকে।

—দূর্ব্বা বলে, আধ্যাত্মিকতার ক্ষয়, মানুষের যৌনানুভূতির তীব্রতা, আর—উত্তেজক মনোবৃত্তির অনুশীলন। আবর্জনা বা আগাছা থেকে আরম্ভ করে বহুমূল্য অর্কিড পর্য্যন্ত আজ মানুষের বিলাসের প্রয়োজনে লাগছে, আর তাতে অভাববোধ জাগছে তীব্রতর হয়ে, কিন্তু মনের যে বিপুল প্রসার বিশ্বকে আপনার করে নিতে পারে প্রেমের মধ্যে, তা ক্রমে কমে যাচ্ছে! মানুষের জটিল জীবনের এই দারুণ দুর্দ্দিনে একটি মাত্র বস্তু তাকে রক্ষা করতে পারে—তা হচ্ছে প্রেম, নিষ্কাম এবং নিষ্কলুষ!

—ওসব আধ্যাত্মিক কথায় কোনো লাভ নেই! কাটু বলল—আপনি কি বলতে চান যে এই এ্যাটোম বোমের অতিমানবীয় যুগে মানুষ সব-কিছু ছেড়ে দিয়ে বুদ্ধের মত, যিশুখৃষ্টের মত, গৌরাঙ্গের মত শুধু প্রেম বিলোবে?

—দূর্ব্বা থাকলে আপনার কথার জবাব আরো ভাল ভাবে দিত, তবু আমিই বলছি,—লাভ কি হয়েছে না জানলেও এটা স্বীকার্য্য যে প্রেম বস্তুটা পৃথিবী থেকে চলে যাচ্ছে! ব্যক্তিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে কোথাও আজ আর প্রেম নেই—ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, পতির সঙ্গে পত্নীর—পুত্রের সঙ্গে পিতার প্রেমও আজ নষ্ট হতে বসেছে। জীবনকে জৈব করবার সাধনায় মেতেছে জগত; এ জীবন জল নয়, জ্বলন্ত মদ্য; জ্বালা করে, তবু লোকে খায়, খেয়ে নর্দ্দমায় গড়াগড়ি যায়, তবু খায়, সর্ব্বস্ব খুইয়ে দেউলে হয়, তবু খায়—কারণ এর জ্বালার আকর্ষণ জৈব, যৌনধর্ম্মী।

—আচ্ছা, আমি দূর্ব্বা দেবীর সঙ্গেই এ বিষয়ে আলোচনা করবো—বলে কাটু উঠে যাচ্ছে, কারণ সে বুঝেছে, এখানে সুবর্ণার সঙ্গে কিছু কথা জমবে না।

—আলোচনা করতে যাবেন না, দূর্ব্বা আপনাকে এককথায় জবাব দিয়ে

দেবে, বলবে, আপনি অব্যাপারী এবং অনধিকারী—অর্থাৎ এ নিয়ে কোনোদিন মাথা ঘামান নি।

—তিনি বুঝি এই নিয়েই মাথা ঘামান ?

—হ্যাঁ—এই তো তার জীবন! 'পরম পিপাসার' লেখক চিণ্ময়, কিন্তু ওর সবকিছু দূর্ব্বার—দূর্ব্বা না থাকলে চিণ্ময়ের দ্বারা এই বই লেখা সম্ভব হোত না!

—হবে—কাটু চলে গেল। কিন্তু বরুণ এল এগিয়ে। মায়াকেই বলল,

—প্রেম সত্যি চলে যায় নি মায়া, হয়তো যাবে না; তোদের দুটিকে দেখে অন্ততঃ ভরসা হয়—আরো কিছু দিন প্রেম থাকবে এই পৃথীবিতে—চল, তোদের বাড়ী পৌছে দিই—গাড়ীটা খামোকা খালি যাবে কেন!

—খালি যাবে কেন? সুবর্ণা তো রয়েছে!—মায়া স্নেহাস্পদা ভগ্নীর মত ঠাট্টা করলো!

—ওর আলাদা গাড়ী আছে—আয়

—আলাদা কেন ?

—ওর সব আলাদা—বরুণ বিলোচনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল।

—সব আলাদা নয়, শোনো—সুবর্ণা হুঙ্কার ছাড়লো যেন—

কিন্তু বিলোচনকে নিয়ে বরুণ ততক্ষণে নেমে গেছে। কথাটা শুনতে পেলনা না। মায়া বললো,

—অমন সুন্দর স্বামীকে ও ভাবে কেন আঘাত করো সুবর্ণা! ছিঃ! দূর্ব্বা সেদিন বলছিল—

—কি—কি বলছিল দূর্ব্বা ?—সুবর্ণা ত্বরিৎ প্রশ্ন করলো।

—বলছিল যে সুবর্ণা বড় অভাগী। তার অমন রুচিমার্জ্জিত হৃদয় থাকা সত্ত্বেও সেটাকে সে উগ্র মদের বাষ্প দিয়ে আবিল করে রেখেছে—অথচ

অমন সুন্দর একটি লীলাকমল তার রয়েছে, যা দিয়ে সে হৃদয়মুকুর মুছে ঝরঝরে করে নিতে পারে—সেটি ওর খুকী !

—হুঁ ! আর কি বললো ?

—ও বলে, 'প্রেমহীন যে যৌন-বিলাস, তার মত দুঃখের আর কিছু নেই। বারবধূ কেন এত অভাগী জানিস মায়াদি—সে প্রেম পায় না—পায় একটু দৈহিক আনন্দ আর অনন্ত অবসাদ—যারা তাদের কাছে যায়, তারা আরো অভাগা, কারণ তারা গৃহের উদ্বেলিত প্রেমকে অস্বীকার করে, অপমানিত করেই যায়—গিয়ে নিজেকে একটা তুচ্ছ নারীর লোভের, আর ঘৃণার আর উপহাসের পাত্র করে তোলে—সোনার হরিণ দেখানোর মত এই প্রতারণা, কিন্তু ওদিকে রাজকুলবধূ সীতা হয় অপহৃতা !'—তুমি সামলে যাও সুবর্ণা !

মায়া ধীরে ধীরে চলে গেল, কিন্তু সুবর্ণা চুপচাপ বসে ভাবছে। কতক্ষণ যে ভেবেছে ও, কে জানে, অকস্মাৎ সম্বিত পেয়ে দেখলো, সবাই চলে গেছে ; রয়েছে শুধু গোবিন্দ এবং হাউসের জনকয়েক লোক। সুবর্ণা উঠলো।

—যাচ্ছেন ?—গোবিন্দ বলল।

—হ্যাঁ—দূর্ব্বার সঙ্গে কি এখন দেখা হতে পারবে, জানেন ?

—হ্যাঁ—হবে না কেন ? রাত তো মাত্র সাড়ে দশ ; যান, দেখা হবে।

সুবর্ণা আর কিছু না বলে নিজের গাড়ীতে উঠলো এসে। কিন্তু গাড়ী সে দূর্ব্বার বাড়ীর পানে চালালো না, গড়ের মাঠের দিকে চালালো। কাটু সঙ্গে নেই—বরুণও নেই—একা সুবর্ণা তার দামী ক্যাডিল্যাকে !

বিরাট, বিস্তৃত মাঠ—শান্ত জ্যোৎস্নায় পরিস্নাত ; আকাশের সঙ্গে মাটির মিলন-মহিমা দূর দিকচক্রবালে দেখা যায়। উপরের আলোকলেখা এসে

পড়েছে শ্যামল দূর্ব্বাদলে—ছায়াময়, মায়াময়, মোহময় নবজাগ্রত তৃণাঙ্কুরে শিশিরবিন্দু ঝলমল করছে—যেন সুবর্ণার খুকী !

না—খুকু বরুণের—না-না। দূর্ব্বা বলেছে, খুকু সুবর্ণার হাতের লীলা-কমল, ঐ দিয়ে সে তার হৃদয়-মুকুর পরিষ্কার করে নিতে পারে—সুবর্ণা গাড়ীর গতি হ্রাস করলো !

চার বছর হোল সুবর্ণার বিয়ে হয়েছে বরুণের সঙ্গে ! ওঃ ! কতদিন যেন মনে হচ্ছে। কিন্তু কটাইবা দিন ! চার বছর তো এমন কিছুই বেশী নয়—তার বন্দিনী জীবনের জটিল অনুভূতিই চার বছরকে চল্লিশবছর করে দেখাচ্ছে।

কেন সে নিজেকে বন্দিনী মনে করে ? বরুণ তাকে ভালবাসে,না ! কিন্তু সেই কি বরুণকে ভালবাসে ? না ! সুবর্ণা নিজেই নিজের কথার জবাব দিল—রূপজ মোহ বা কামজ দুর্ব্বলতাকে ভালবাসা বলা যায় না—, যে রসানুভূতি জীবনের সব দুঃখকে আচ্ছন্ন করেও জেগে থাকে, তাকে বলে ভালোবাসা ; যে প্রেম দেহকে বিক্রয় করেও প্রিয়তমের জন্য কল্যাণভিক্ষু, তাকে বলে ভালবাসা ; যে অনুভূতি হাসির ঝলকে দেহমনকে জ্বালাময় করে তোলেনা—অন্তরকে ক্রন্দনাতুর করে তোলে দুঃখের নিবিড় আনন্দরসে, তাকেই বলে ভালোবাসা—যা সে মায়ার জীবনে দেখেছে !

সুবর্ণার হৃদয়ে কোথায় সেই প্রেম—কোথায় তার রুচিমার্জ্জিত অন্তরে প্রেমসুন্দরের অমর্ত্ত্য মূর্ত্তি ?

গাড়িতে আবার জোর গতি দিল সুবর্ণা—বাড়ী যাবে ; বরুণের বাড়ী—না—খুকীর বাড়ী—না—বাড়ীটা এখনো শাশুড়ীর !

চৌরঙ্গীর চওড়া রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, সোজা দেখা যাচ্ছে ! একটা তিনতলা বাড়ীর ঝোলাবারান্দায় এক দম্পতী পরস্পরকে জড়িয়ে ; ওরা কি যেন কথা বলছে— !

— উঃ! এখুনি এ্যাকসিডেণ্ট বাধাতো সুবর্ণা—একখানা ডবল-ডেকার বাস বিপরীত দিকে চলে গেল—সুবর্ণা তখন ঐ দম্পতীকে দেখছিল! ঐ বাসখানা তার গাড়ীতে পড়লে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো সব—সুবর্ণাও। বেশ হোত, পুলিশ আসতো, অসংখ্য লোক আসতো, বরুণও আসতো হয়তো, দেখতো, সুবর্ণার সোনার দেহ ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ-বর্ণা সুবর্ণা মেঘবর্ণা হয়ে গেছে—কালো—স্নিগ্ধ, শান্ত—মৃত্যু-শীতল।

গভীর রাত; চিণ্ময় সিনেমা-হাউস থেকে এই মাত্র ফিরলো। খবরের কাগজের জন্য রিপোর্ট ইত্যাদি লিখতে দেরী হয়ে গেছে; এবার জামাকাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে শোবে—অকস্মাৎ ঝটিকাগতিতে ঘরে এসে দাঁড়ালো দূর্ব্বা।

উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে স্থির সৌদামিনীবৎ তার দেহকান্তি—মায়াময়ী মোহময়ী, মদিরময়ী! চিণ্ময় এ বেশে, এভাবে, এমন সময় কোনদিন দেখেনি দূর্ব্বাকে। একি রূপ! অতুলনীয়, অবর্ণনীয়,—কিন্তু দূর্ব্বার রূপ যেন আজ সংযমের শতবন্ধনে অনুগ্র নয়—সহস্র আহুতিতে অগ্নিময়!

চিণ্ময় দেখলো মুহূর্ত্তের জন্য—তার পুরুষ অন্তর এই অত্যাশ্চর্য্য রূপশিখায় পতঙ্গবৎ আত্মাহুতি দিতে চায়—কিন্তু···ঠনঠনে কালীতলার চতুর্ভুজা মূর্ত্তির চরণে স্তূপীকৃত প্রতিজ্ঞা মনে পড়ছে, চিণ্ময় একটু পিছিয়ে দাঁড়ালো—খোলা পাঞ্জাবীটা রাখতে গেল র‍্যাকে ঝুলিয়ে—ঐ অবসরেই বলল,

—শোও নি কেন এখনো? আমি তো ওখানেই খেয়েছি। এক গ্লাস জল ছাড়া আর কিছু খাব না!

—শোন—দূর্ব্বা ওর হাত থেকে নিয়ে বললো,—কথা আছে, খুব জরুরী কথা—পাঞ্জাবীটা র‍্যাকে রাখলো দূর্ব্বাই।

প্রদীপ্ত যৌবনের প্রখর দীপ্তি চিণ্ময়ের চোখ ধাঁদিয়ে দিচ্ছে। কামনার অগ্নিতে পুড়ে যাচ্ছে ওর দেহস্তূপ, মনের মধ্যে চলেছে শত বজ্রের ঝঞ্চনা কিন্তু চিণ্ময় তখনো ভাবছে, একি অবস্থা দূর্ব্বার! কেন সে এল এমন করে? কী সে করতে চায় চিণ্ময়কে নিয়ে?

—কি কথা দূর্ব্বা! কি এমন কথা যে এই রাত্রেই বলতে হবে?

—রাত্রেই তো গোপন কথা বলতে হয়!—হাসলো দূর্ব্বা—অমোঘ আকর্ষণের হাসি—সৌরমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ যেন সে হাসিতে, যার প্রচণ্ড শক্তি অনন্ত গ্রহ উপগ্রহকে ঘুরিয়ে চলেছে অবিশ্রাম অপরিমেয় গতিতে! চিণ্ময়ের বিছানার চাদরখানা ঝেড়ে পেতে দিল—বালিশ ঠিক করতে করতে বলল,

—তোমার ফুলশয্যা রচনা করে দিই—আবার সেই হাসি!

দূর্ব্বা কি অসুস্থ হয়ে পড়েছে? অথবা—? চিণ্ময় দেখতে পেল, ওর সমস্ত দেহলতা কেমন একটা অনির্ব্বচনীয় আবেগে থরকম্পিত! বক্ষবাসের রক্ষণশীলতা বিদীর্ণ করে স্তনাগ্র-চুড়ার কমনীয় মাধুর্য্য স্বমহিমায় বিলসিত হচ্ছে—যৌবনের জৈব আহ্বান—সৃজনের আদিতভূত ইঙ্গিত। মুগ্ধ চিণ্ময় আত্মবিস্মৃত হতে হতে আত্মসম্বরণ করছে—অতি কষ্টে বলল,

—জীবনের চলার পথেই আমরা পরস্পরকে সাহায্য করছি দূর্ব্বা, ফুলবাসরে তো নয়—সেখানে তো বিশ্রামের স্থান—চলবার দরকার হয় না সেখানে—যাও, শোও গে।

—প্রতিজ্ঞাটা মনে আছে তাহলে!—দূর্ব্বা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো চিণ্ময়ের বুকের কাছে—ওর দেহ-সৌরভের সঙ্গে দেহের উষ্ণ উত্তাপটাও, যেন লাগছে চিণ্ময়ের অঙ্গে!

নিবিড় নিস্তব্ধ রাত্রির নর্ম্মসঙ্গিনী—নরের চির কাম্য নারী—চিণ্ময় ব্যাকুল হয়ে সরে এল হাতখানেক—অতি কষ্টে উচ্চারণ করলো,

—দূর্ব্বা !

—অ্যাঁ ? কি ?···বলো ! অপরিম্লান হাসি স্তবকে স্তবকে ঝরছে, যেন শিশিরাঘাত-তাড়িত বৃন্তচ্যুত শেফালীকুসুম !

—তুমি প্রকৃতিস্থ নেই দূর্ব্বা !—নিজেকে অসীম বলে সম্বরণ করে চিণ্ময় বলল কথাটুকু ! তার সৃজন-বাসনা পূর্ণ মন একথা বলতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু অন্তরের অন্তরতম যে প্রকোষ্ঠ, সেখানে দূর্ব্বা তো কামনাময়ী নারী নয়, প্রেমময়ী দেবী—প্রাণময়ী মানসী—'চণ্ময়ী' শক্তিমূর্ত্তি !

—আমি সত্যি তোমাকে অতি গোপন একটা কথা বলবো চিণুদা—দূর্ব্বা বলল।

—না—আজ থাক, এখন থাক—যাও, শোওগে—চিণ্ময়ের মুখ শুকিয়ে গেছে আবেগে—অধিরতায়—তবু সে বলল এই কথা।

—চিণুদা— ! দূর্ব্বার কণ্ঠে যেন চক্রবাকীর চঞ্চল আহ্বান—চটুলা, চপল, চিত্তহারী—হাসিটা আরো মধুর হয়ে উঠেছে ওর।

—ক্ষমা কর দূর্ব্বা, এ পরীক্ষার খেলা তোমার বন্ধ কর ! আমি মানুষ, আমায় তুমি রিপুজয়ী শিব করবার কল্পনা ত্যাগ কর· দূর্ব্বা—দোহাই তোমার !

চিণ্ময় অকস্মাৎ দূর্ব্বার পদপ্রান্তে নতজানু হয়ে পড়লো।

—ছিঃ চিণুদা, তুমি এতো কাপুরুষ ! দূর্ব্বা যেন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে !

—তোমার কাছে পৌরুষের অহঙ্কার আমার নেই দূর্ব্বা—আমি নিতান্তই মানুষ—এ প্রলোভন আমি সামলাতে পারবো না।—তুমি ভেতরে যাও !

—যাচ্ছি—যাও, শোও গে—দূর্ব্বা হাত দুই সরে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালো। এবার চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা, কিন্তু চিণ্ময় দেখতে পেল,

জোয়ার-জাগা সমুদ্রের মত দূর্ব্বার বুকখানা দুলে দুলে উঠছে—ঠোঁট দুটো কাঁপছে তখনো! ক্ষীণ কণ্ঠে চিণ্ময় বলল,

—তোমার দেহ থেকে তোমার আত্মাকে আমি অধিক ভালোবাসি দূর্ব্বা!

—জানি—হাসলো দূর্ব্বা এবার স্বচ্ছ, সুন্দর অপরিম্লান হাসি!

—তুমি আর মানুষ নেই চিণুদা, মদন-বিজয়ী শিব হয়েছ—যাও, বাড়ী গিয়ে বিয়ে করে এসো—মা ডেকেছেন!

দূর্ব্বা বুকের ব্লাউস থেকে চিঠিখানা বের করে ফেলে দিল চিন্ময়ের কোলে—তারপর চলে যাচ্ছে!

—বিয়ে!—চিণ্ময়ের কণ্ঠে আতুতা!

—হ্যাঁ—বিয়ে। কেনো?—হাসলো দূর্ব্বা আবার!—আঁৎকে উঠলে যে?

—দেহগত কামনার ঊর্দ্ধে আমার জীবনে তোমার আসন দূর্ব্বা—কিন্তু আমি দেহজীবনের বাইরে নই—আমি দেহী। কিন্তু তোমার বর্ত্তমান মুহূর্তের আত্মসমর্পণকে আমি অস্বীকার করতে বাধ্য হলাম, কারণ ওভাবে তোমাকে গ্রহণ করা আর নিজকে তোমার অন্তর থেকে চিরনির্ব্বাসিত করা একই কথা—সে বেদনা আমি সইতে পারবো না, দূর্ব্বা!

—সইতে হবে না। আমার অন্তরে তোমার আসন চিরপ্রতিষ্ঠিত রইল, চিণুদা—শোও গে—চলে যাচ্ছে দূর্ব্বা!

—অন্যত্র বিয়ের আদেশ প্রত্যাহার কর দূর্ব্বা!—চিণ্ময় সামনে এসে বলল।

—আদেশটা আমার নয় মা'র—সেটা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার বাইরের জীবনের মত মনের জীবনেও তুমি সঙ্গী রইলে—তোমারও মনে রইলাম আমি—এবার থেকে মনের জীবনের পথেও আমাদের পরস্পরকে সাহায্য করে চলতে হবে!

—দূর্ব্বা !

—আর কথা নয়—জল খেয়ে শোও গে, যাও—মনে রেখো, শিব ঐভাবেই পার্ব্বতীকে চেয়েছিলেন ! আত্মায় আত্মায় সে মিলন অপার্থিব, লোকোত্তর !

দূর্ব্বা চলে গেল। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোকে একা দাঁড়িয়ে চিণ্ময় ! মৃত্যুপাণ্ডুর মুখে ওর এতোটুকু রক্ত নেই, নেই কোন ভাবব্যঞ্জনা ; ও যেন পাথর হয়ে গেছে। ভাবতে পারছে না, কি কথা হোল তার দূর্ব্বার সঙ্গে—জটিল কি যেন জীবন-পথের কথা !

কোনো রকমে আলোর সুইচটা ঠেলে দিয়ে চিণ্ময় বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়ল—মার চিঠিটা মেঝেতেই গড়াচ্ছে বাতাসে !

আর দূর্ব্বা ! নিজের ঘরটায় এসে নিশ্চুপে শুয়ে পড়লো ! নিরন্ধ্র অন্ধকার ওকে আবৃত করে আছে—অতলস্পর্শ অন্ধকার, মার স্নিগ্ধ সুগন্ধী কোলের মত অতলগর্ভ—কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ ওর ফুলে ফুলে উঠছে বেদনার ঘনীভূত আবর্ত্তে—অভাগী নারীহৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা ! আর্ত্তকণ্ঠে শুধু বললো—জাগো, প্রেমের দেবতা, আমার দেহ-মনকে অতিক্রম করে অন্তর-দেউলে প্রেম-সুন্দররূপে জেগে ওঠো……

*　　*　　*　　*

গোবিন্দ তার উকীল বাড়ী থেকেই উইল লিখিয়ে এনেছে। সিনেমা কোম্পানীর আয়রণ-সেফে রেখে দিয়েছে, আর দূর্ব্বার হাতে দিয়েছে তার চাবি। বলেছে,

—"বিশেষ মূল্যবান দলিল একখানা ওখানে রইল—দূর্ব্বা যেন সকালে দেখে !" ঐ দলিলে সে তার যাবতীয় সম্পত্তি সন্তানদেরই দিয়েছে, শুধু দূর্ব্বাদের বাড়ীখানা আর সিনেমা-কোম্পানীর শেয়ারের সমস্তটাই দাদুর নামে দান করেছে—গুরুদক্ষিণা।

ছোট একখানা চিঠিতে লিখে রেখেছে, রাত্রি শেষ হবার পূর্ব্বেই সে বহুদূরে চলে যাবে—দূর্ব্বা যেন মেয়েটার বিয়ে দিয়ে তাকে সুখী করে—গোবিন্দ এবার বৃন্দাবনবিহার। গোবিন্দর সন্ধানে চললো !

* * * *

বাড়ীখানা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। শুধু উপরে বরুণের ঘরে আলো জ্বলছে। গাড়ীখানা নিঃশব্দে থামিয়ে সুবর্ণা শুনতে চাইল, কে যেন কথা বলছে।

এমনি জ্যোছনা রাতে, ঘুম নিয়ে দুটি হাতে
কে সে এসে বলে—'খুকু ঘুমা।'
রাতচরা পরী আসে, খুকুদের ভালবাসে
গালভরে দিয়ে যায় চুমা !'

সুবর্ণা নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উঠে গেল উপরের ঘরে। বরুণ খুকুকে ঘুম পাড়াচ্ছে ! শয্যাগৃহের স্নিগ্ধ নীলালোক মায়াময় করে রেখেছে কক্ষটাকে। কিন্তু এ ঘরের দরজা বন্ধ। সুবর্ণা তার নিজের শোবার ঘরে ঢুকে কাপড় ছাড়লো—শুনতে পাচ্ছে বরুণের কণ্ঠ,

আকাশপরী, পাতালপরী, আলোর পরী—আয়,
আমার খুকু ঘুমিয়ে যাবে ফুলের বিছানায়…

—একা তোমার নয়—ওটাতে আমারও ভাগ আছে—বলে সুবর্ণা অকস্মাৎ মাঝের পর্দাটা ঠেলে এঘরে এসে দাঁড়ালো। উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে ওর। বলল—আমার সবই আলাদা, বলে তো গেলে, কিন্তু কথাটা সত্যি নয়—ওইটাতে আমার অংশ আছে !

—না সুবর্ণা !

—চুপ করো—সুবর্ণা সম্রাজ্ঞীর মত আদেশ করলো যেন। বললো যে নিজের বিয়ে করা বৌয়ের ভালবাসা আদায় করতে পারে

না, সে পুরুষ তো নয়ই, মানুষও নয়। খুকুর বাবা হ'তে হলে খুকুর মাকে মাটির তলা থেকে তুলে আনতে হয় প্রেমের আকর্ষণে—সূর্য্যের যে-প্রেম পদ্মিনীকে তোলে জলতল থেকে!

—সুবর্ণা!...বরুণ বিস্মিত হয়ে উঠে বসলো!

— থামো! আমি আজ আমার দাবী জানাতে এসেছি! কোন্ অধিকারে একাই তুমি ওকে ভালবাসবে—আমাকে বঞ্চিত করবে কেন তুমি...?

সুবর্ণার চোখ জলছে জলভারে। নীল আলোটা প্রতিফলিত হয়েছে চোখে ওর; যেন বারুণী রূপসীর নয়নে মুক্তাফল। বরুণ আস্তে বলল,

—তুমি বড় উত্তেজিত আছ সুবর্ণা, শোও গে!

—না—শান্ত স্নিগ্ধ দূর্ব্বা নই আমি, আমি সুবর্ণময়ী বিদ্যুৎ, অবিরাম চাবুক চালাই আমি আমার প্রিয়তমের বুকে—সহ্য করবার শক্তি না থাকে তো সে জলের দেবতা বরুণ-মেঘ আমায় বিয়ে করেছিল কেন?—বলো—জবাব দাও!

সুবর্ণা ঝটিকা গতিতে এসে পড়ল বরুণের বুকের উপর রূপের বিদ্যুৎকশাঘাত! বরুণ ধীরে ধীরে ওকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলল,

—সব অপরাধের বোঝা আমি একাই নিলাম সুবর্ণা—আজ সত্যি আমার বুকে এলে। ঘুমুও, ঘুমিয়ে যাও, তোমার চাবুক এবার সইতে পারবো।

সুবর্ণা নিঃসাড় পড়ে রইল স্বামীর বুকের কাছে মুখ গুঁজে! খুকীটা বাবার গায়ে বাঁ পা আর মার গায়ে ডান পা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

চিরপুরাতন প্রেমের চিরনূতন সেতু!